সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী

এ.কে.এম. নাজির আহমদ

সাইয়েদ
আবুল আ'লা মওদূদী (রহ.)

এ. কে. এম. নাজির আহমদ

আহসান পাবলিকেশন
কাঁটাবন ❖ মগবাজার ❖ বাংলাবাজার

সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (রহ)

এ কে এম নাজির আহমদ

প্রকাশনায়
আহসান পাবলিকেশন
কাঁটাবন মসজিদ ক্যাম্পাস
ঢাকা-১০০০
ফোন : ৯৬৭০৬৮৬

ISBN : 984-32-2446-9

প্রথম প্রকাশ
জুন, ২০০৫
আষাঢ়, ১৪১২
জমাদিউল আউয়াল, ১৪২৬

প্রচ্ছদ
গোলাম মাওলা

কম্পোজ
আহসান কম্পিউটার
কাঁটাবন মসজিদ ক্যাম্পাস (৩য় তলা), ঢাকা-১০০০
ফোন : ৯৬৭০৬৮৬

মুদ্রণ
আলফালাহ্ প্রিন্টিং প্রেস
বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭

বিনিময় : পঁচাশি টাকা মাত্র

SAYYED ABUL A'LA MAUDUDI Written by A K M Nazir Ahmad Published by **Ahsan Publication,** Kataban Masjid Campus, Dhaka-1000 First Edition June 2005 Price Tk. 85.00 ($ 2.00 only).

A.P-2005/33

ভূমিকা

আল্লাহ্ রাব্বুল 'আলামীন সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদীকে অসাধারণ প্রতিভা দান করেছিলেন। ইসলামের সামগ্রিকতার নিরিখে সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার বিরল যোগ্যতা ছিলো তাঁর। তিনি ছিলেন স্পষ্টবাদী। আল কুরআন ও আস্ সুন্নাহ্র বক্তব্যগুলোকে কোন প্রকার বক্র ব্যাখ্যার আশ্রয় না নিয়ে তিনি স্পষ্টভাবে তুলে ধরেছেন পাঠকদের সামনে। তাঁর বক্তৃতা-ভাষণ, লেখা এবং সাংগঠনিক তৎপরতার কেন্দ্রবিন্দু ছিলো আল্লাহ্ রাব্বুল 'আলামীনের সন্তোষ অর্জন। তিনি ছিলেন সূক্ষ্ম-দৃষ্টি ও দূরদৃষ্টি সম্পন্ন চিন্তাবিদ। তাঁর চিন্তার গভীরতাও ছিলো অনন্য। তাঁর চিন্তাধারাকে সঠিকভাবে বুঝতে হলে অখণ্ড মনোযোগ সহকারে পড়তে হবে তাঁর সাহিত্য সম্ভার, বিশেষ করে তাঁর অনবদ্য তাফসীর তাফহীমুল কুরআন।

এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে আমি সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদীর (রহ.) জীবন ও কর্মের সংক্ষিপ্ত বিবরণ তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। একজন শ্রেষ্ঠ ইসলামী চিন্তাবিদ সম্পর্কে একটুখানি লিখতে পেরে আমি আল্লাহ্ রাব্বুল 'আলামীনের শুকরিয়া আদায় করছি।

এ. কে. এম. নাজির আহমদ

সূচীপত্র

بسم الله الرحمن الرحيم

সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (রহ.)

১. জন্ম ও বংশ পরিচয়

খৃস্টীয় ১৯০৩ সনে হিন্দুস্থানের হায়দারাবাদ রাজ্যের (বর্তমান অন্ধ্র প্রদেশ) আওরঙ্গাবাদ শহরে সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর আব্বার নাম সাইয়েদ আহমাদ হাসান। আম্মার নাম রুকাইয়া বেগম। সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (রহ) আল হুসাইন ইবনু আলী (রা) বংশের বিয়াল্লিশতম পুরুষ।

২. শিক্ষা জীবন

সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী তিন বছর বয়সেই বর্ণমালা শিখে ফেলেন। তাঁর আব্বাই ছিলেন তাঁর প্রধান শিক্ষক। বয়স বাড়ার সাথে সাথে তাঁকে বিভিন্ন বিষয় শেখানোর জন্য গৃহ শিক্ষকও রাখা হয়।

এগার বছর বয়সে তিনি আওরঙ্গাবাদের মাদ্রাসা ফাওকানিয়াতে অষ্টম শ্রেণীতে ভর্তি হন। ঐ মাদ্রাসাতে ভাষার সাথে সাথে গণিত, পদার্থ বিদ্যা, রসায়ন বিদ্যা ও ইতিহাস শেখানো হতো। এই শিক্ষালয়ে পড়াশুনা কালে সাইয়েদ আবুল আ'লা প্রবন্ধ লেখা ও বক্তৃতা দানে পারদর্শিতা অর্জন করেন।

১৯১৬ সনে তিনি মাদ্রাসা ফাওকানিয়া থেকে ম্যাট্রিকুলেশান মানের পরীক্ষায় পাশ করেন ও হায়দারাবাদ কলেজে ভর্তি হন। তাঁর আব্বা সাইয়েদ আহমাদ হাসান পক্ষাঘাতে আক্রান্ত হয়ে ভূপালে অবস্থান করছিলেন। সাইয়েদ আবুল আ'লা তাঁর আব্বার সেবাযত্নের জন্য তাঁর আম্মাকে নিয়ে ভূপালে আসেন। তখন তাঁর কলেজ জীবনের মাত্র ছয়টি মাস অতিবাহিত হয়েছে। এই অল্প বয়সেই তাঁর ছাত্র জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটে।

এই সময় প্রখ্যাত লেখক নিয়ায ফতেহপুরীর সাথে সাইয়েদ আবুল আ'লার সাক্ষাত ও পরিচয় ঘটে। তরুণ সাইয়েদ আবুল আ'লা লেখক হওয়ার সংকল্প গ্রহণ করেন।

৩. কর্মজীবন শুরু

১৯১৮ সন। সাইয়েদ আবুল আ'লার বয়স তখন পনর বছর। তাঁর বড় ভাই সাইয়েদ আবুল খায়ের মওদূদী বিজনৌর থেকে প্রকাশিত মাদীনা পত্রিকার সম্পাদক নিযুক্ত হন। তরুণ আবুল আ'লাও সম্পাদকীয় স্টাফের একজন সদস্য হিসেবে মাদীনা পত্রিকায় যোগদান করেন। কিন্তু দুই মাসের বেশী তাঁরা সেখানে থাকতে পারেননি। তাঁরা দিল্লী চলে আসেন।

১৯১৮ সনেই জব্বলপুরের জনৈক তাজউদ্দীন সাপ্তাহিক তাজ নামে একটি পত্রিকা বের করেন। সাইয়েদ আবুল খায়ের ও সাইয়েদ আবুল আ'লার ওপর এর সম্পাদনার দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। কিন্তু আর্থিক সমস্যার কারণে কয়েক মাস পরই পত্রিকাটি বন্ধ করে দিতে হয়। এই সময় তাঁরা কিছুকাল ভূপালে অবস্থান করে আবার দিল্লী আসেন। দিল্লীতে অবস্থান কালে সাইয়েদ আবুল আ'লা ইংরেজী ভাষা শেখেন। তিনি গভীর মনোযোগের সাথে ইংরেজী ভাষায় লিখিত দর্শন, ইতিহাস, রাজনীতি, অর্থনীতি ও সমাজ-বিজ্ঞানের বই-পুস্তক পড়তে থাকেন।

৪. খিলাফাত আন্দোলনের তরুণ কর্মী

১৯১৪ সন থেকে ১৯১৮ সন পর্যন্ত চলে প্রথম মহাযুদ্ধ। এই যুদ্ধে জার্মেনীর পক্ষে যুদ্ধে নেমেছিলো তুর্কী তথা উসমানী খিলাফাত। যুদ্ধে জার্মেনী ও তুর্কী পরাজিত হয়। যুদ্ধের পর বৃটেন ও ফ্রান্স তুর্কী তথা উসমানী খিলাফাতের বিভিন্ন অঞ্চল নিজেদের মধ্যে ভাগ-বাটোয়ারা করে নিতে থাকে। ১৯১৯ সনে বৃটিশ শাসিত উপ-মহাদেশের মুসলিমরা উসমানী খিলাফাতের অখন্ডতা অক্ষুণ্ন রাখার দাবিতে তুমুল আন্দোলন গড়ে তোলে। এই আন্দোলনেরই নাম খিলাফাত আন্দোলন।

এই আন্দোলনের প্রধান ব্যক্তিত্ব ছিলেন মাওলানা মুহাম্মাদ আলী ও তাঁর ভাই মাওলানা শাওকাত আলী। সাধারণ সম্পাদক ছিলেন তরুণ ব্যারিষ্টার হুসাইন শহীদ সোহরাওয়ার্দী। ১৯১৮ সনে গঠিত জমিয়তে উলামায়ে হিন্দ খিলাফাত আন্দোলনের প্রতি সমর্থন জানায়। আরো সমর্থন জানায় অল ইন্ডিয়া ন্যাশনাল কংগ্রেস।

প্রবল বেগে এগুচ্ছিলো খিলাফাত আন্দোলনের জোয়ার। এই প্রেক্ষাপটে তাজউদ্দীন সাহেব ১৯২০ সনে জব্বলপুর থেকে আবার সাপ্তাহিক তাজ পত্রিকার প্রকাশনা শুরু করেন। সম্পাদক নিযুক্ত হন তরুণ সাংবাদিক সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী। তখন তাঁর বয়স মাত্র সতর বছর।

সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী সাপ্তাহিক তাজ পত্রিকার সম্পাদক হিসেবে চলমান রাজনীতির দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখছিলেন। খিলাফাত আন্দোলনের জোয়ার তখন জব্বলপুরেও পৌছে। তিনি আন্দোলনের বিভিন্ন তৎপরতার সাথে জড়িত হন।

জব্বলপুরে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন জনসভায় তরুণ সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদীকে বক্তৃতা দিতে হয়।

৫. 'তাজ' ও 'মুসলিম' পত্রিকার সম্পাদক

সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদীর নিরলস প্রচেষ্টায় সাপ্তাহিক তাজ পত্রিকাটি দৈনিক তাজে উন্নীত হয়।

কিন্তু দৈনিক তাজ বেশিদিন টিকে থাকতে পারেনি। বৃটিশ বিরোধী একটি নিবন্ধ প্রকাশ করার কারণে পত্রিকাটির প্রকাশনা বন্ধ করে দেয়া হয়।

ঐ বছর সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদীর আব্বা সাইয়েদ আহমাদ হাসান ইন্তিকাল করেন।

১৯২০ সনের শেষভাগে সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী দিল্লীতে চলে আসেন। ১৯২১ সনে তিনি পরিচিত হন জমিয়তে উলামায়ে হিন্দের মুফতী কিফায়েতুল্লাহ ও মাওলানা আহমাদ সাঈদের সাথে। জমিয়তে উলামায়ে হিন্দ তখন 'মুসলিম' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশনার উদ্যোগ নেয়। সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী এই পত্রিকার সম্পাদক নিযুক্ত হন।

দিল্লীতে অবস্থান কালে পত্রিকা সম্পাদনার ফাঁকে ফাঁকে সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী প্রখ্যাত আরবী ভাষাবিদ মাওলানা আবদুস সালাম নিয়াযীর কাছে আরবী ভাষা শিখতে থাকেন। তিনি ছিলেন দারুণ পরিশ্রমী। তিনি আল কুরআনের তাফসীর, আল হাদীস, আল ফিক্‌হ ও অন্যান্য বিষয় ব্যাপকভাবে অধ্যয়ন করেন। তরুণ বয়সেই তিনি ইসলামী জীবন দর্শন ও জীবন বিধানের একজন সুপণ্ডিত রূপে গড়ে উঠেন।

১৯২৩ সনে 'মুসলিম' পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যায়। সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী ভূপাল চলে যান। কিছুকাল পর তিনি আবার দিল্লী ফিরে আসেন।

৬. উপ-মহাদেশের মুসলিমদের দুর্দিন

মোহন দাস করমচাঁদ গান্ধীর অভিপ্রায়ে ১৯২০ সন থেকে চলে আসা অল ইন্ডিয়া ন্যাশনাল কংগ্রেস বৃটিশ বিরোধী অসহযোগ আন্দোলন বন্ধ করে দেয় ১৯২২ সনে। তবুও এগিয়ে চলছিলো খিলাফাত আন্দোলন।

কিন্তু ১৯২৪ সনে তুর্কীর সমরনায়ক মুসতাফা কামাল পাশা উসমানী খিলাফাতের বিলুপ্তি ঘোষণা করেন। ফলে উপ-মহাদেশে বিপুল উদ্দীপনায় পরিচালিত খিলাফাত আন্দোলন মুখ থুবড়ে পড়ে। দারুণভাবে হতাশ হন মুসলিম জনগণ।

খিলাফাতে রাশেদা, বানু উমাইয়া খিলাফাত ও বানুল আব্বাস খিলাফাতের পর উসমানী খিলাফাতই ছিলো দুনিয়ার মুসলিমদের শক্তির কেন্দ্র। ইউরোপের বস্তুবাদী চিন্তাধারার অনুসারী মুসতাফা কামাল পাশা খিলাফাত ব্যবস্থা বিলুপ্ত করেই ক্ষান্ত হননি, তুর্কীর ভূ-খণ্ডে ইসলামের কবর রচনা করার জন্য যা কিছু করা প্রয়োজন, সবই তিনি করেন। তুর্কীকে একটি সেক্যুলার রাষ্ট্র ঘোষণা করেন। ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ ও সমাজবাদের প্রচার প্রসারের পথ উন্মুক্ত করে দেন। ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা তুলে দেন। মাদ্রাসাগুলো বন্ধ করে দেন। পর্দা প্রথার বিলোপ সাধন করেন। ইসলামী আইনের স্থলে সুইস কোড প্রবর্তন করেন। ইসলামী সংস্কৃতির বিলোপ সাধনের জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালান।

এই সময় কেবল তুর্কীতেই নয় অন্যান্য মুসলিম দেশেও ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ ও সমাজবাদে বিশ্বাসী বহুলোক গড়ে উঠে। এমনকি এই উপ-মহাদেশের মুসলিমদের অন্যতম প্রধান শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয় থেকেও ইসলাম বিদ্বেষী লোক বের হতে থাকে। এই সময় 'নিগার' নামক একটি মাসিক পত্রিকা জোরে সোরে নাস্তিকতাবাদ প্রচার করতে থাকে।

মুসলিমদের এই দুর্দিনে ঘটে আরেক দুঃখজনক ঘটনা।

হিন্দুদের একটি সংগঠনের নাম ছিলো আর্যসমাজ। এই সংগঠনের অন্যতম নেতা ছিলেন স্বামী শ্রদ্ধানন্দ। তিনি শুদ্ধি আন্দোলন নামে একটি আন্দোলন শুরু করেন ১৯২৫ সনে। তাঁর বক্তব্য ছিলো, উপ-মহাদেশের মুসলিমদের পূর্ব-পুরুষরা হিন্দু ছিলো। মুসলিম শাসকদের চাপে পড়ে তারা হিন্দুত্ব ত্যাগ করে মুসলিম হয়। এখন মুসলিমদের উচিত হিন্দুত্বে ফিরে আসা।

এই আন্দোলন ছিলো মুসলিমদের জন্য খুবই বেদনাদায়ক। স্বামী শ্রদ্ধানন্দের প্রচারনায় উত্তেজিত হয়ে একজন মুসলিম ১৯২৬ সনে তাঁকে হত্যা করে। এতে গোটা উপ-মহাদেশে মুসলিম-বিরোধী দাংগা চরম আকার ধারণ করে। হিন্দু নেতারা মুসলিমদের বিরুদ্ধে, আল কুরআনের বিরুদ্ধে, আল কুরআনে উল্লেখিত আল জিহাদ পরিভাষার বিরুদ্ধে বিষোদগার করতে থাকেন। উদারপন্থী বলে পরিচিত মোহন দাস করমচাঁদ গান্ধীও তাঁদের সাথে সুর মিলান।

৭. 'আল জমিয়ত' পত্রিকার সম্পাদক হিসেবে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন

১৯২৫ সনে জমিয়তে উলামায়ে হিন্দ 'আলজমিয়ত' নামে একটি পত্রিকার প্রকাশনা শুরু করে। সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদীকে এই পত্রিকার সম্পাদক নিযুক্ত করা হয়।

১৯২৬ সনে যখন স্বামী শ্রদ্ধানন্দ নিহত হন তখনো তিনি এই পত্রিকার সম্পাদক।

এক জুমাবার মাওলানা মুহাম্মাদ আলী দিল্লীর জামে মাসজিদে ভাষণ দিচ্ছিলেন। 'আল জিহাদ' সম্পর্কে হিন্দু নেতারা যেই বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছেন তার জওয়াব দেয়ার প্রয়োজনীয়তার কথা তিনি উল্লেখ করলেন তাঁর ভাষণে।

শ্রোতাদের মধ্যে সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী ছিলেন। তিনি তখন ছাব্বিশ বছরের একজন যুবক। তিনি জমিয়তে উলামায়ে হিন্দের সদস্য ছিলেন না। কিন্তু সাংবাদিক হিসেবে তাঁর যোগ্যতার পরিচয় পেয়েই তাঁকে 'আলজমিয়ত' পত্রিকার সম্পাদক নিযুক্ত করা হয়।

মাওলানা মুহাম্মাদ আলীর বক্তৃতা শুনে তিনি সংকল্প গ্রহণ করেন যে, এই বিষয়ে লিখবেন। 'আলজমিয়ত' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হতে থাকে তাঁর জ্ঞানগর্ভ লেখা 'আলজিহাদু ফিল ইসলাম'। ১৯২৬ ও ১৯২৭ সনে মোট চব্বিশটি কিস্তিতে তিনি ইসলামের 'আলজিহাদ' সংক্রান্ত ধারণা অত্যন্ত পরিচ্ছন্নভাবে তুলে ধরেন জনসমক্ষে। তাঁর লেখা অনেকের মুখে ভাষা ফুটিয়েছে। হিন্দু নেতাদের বক্তৃতা-বিবৃতির মুকাবিলা করার হাতিয়ার যুগিয়েছে অনেককে।

১৯২৮ সনে জমিয়তে উলামায়ে হিন্দ এক অবাক করা কান্ড করে বসে। উপ-মহাদেশের মুসলিম জনগোষ্ঠীকে ইসলামী মূল্যবোধের ভিত্তিতে সংগঠিত করে রাজনীতিতে একটি স্বতন্ত্র ধারা সৃষ্টির প্রচেষ্টা না চালিয়ে জমিয়ত অল ইন্ডিয়া ন্যাশনাল কংগ্রেসের রাজনৈতিক স্ট্যান্ডের প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করে। সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী জমিয়তে উলামায়ে হিন্দের এই ভূমিকা সঠিক বলে মেনে নিতে পারেন নি। ফলে তিনি 'আলজমিয়ত' পত্রিকার সম্পাদক পদে ইস্তফা দেন।

এই সময় তিনি গবেষকের মন নিয়ে ইমাম ইবনু তাইমিয়া (রহ), ইমাম হাফিজ ইবনুল কাইয়্যিম (রহ) ও শাহ ওয়ালীউল্লাহর (রহ) গ্রন্থাবলী অধ্যয়ন করতে থাকেন।

৮. উপ-মহাদেশের রাজনীতিতে মুসলিম জাতীয়তাবাদী ধারা

স্যার সাইয়েদ আহমাদ খান বিশ্বাস করতেন যে ইউরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান হাছিল না করে মুসলিমরা হিন্দুদের কিংবা ইংরেজদের সমকক্ষ হতে পারবে না।

তিনি মুসলিম তরুণদেরকে যুগপৎ ইসলামী মূল্যবোধ ও ইউরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানে সমৃদ্ধ করার অভিপ্রায় নিয়ে ১৮৭৫ সনে আলীগড় মোহামেডান এ্যাংলো ওরিয়েন্টাল কলেজ স্থাপন করেন।

১৮৮৫ সনে অল ইন্ডিয়া ন্যাশনাল কংগ্রেস গঠিত হলে স্যার সাইয়েদ আহমাদ খান মুসলিমদেরকে সযত্নে কংগ্রেসের সংশ্রব এড়িয়ে চলার পরামর্শ দেন। তিনি বিশ্বাস করতেন যে কংগ্রেসের দ্বারা মুসলিমদের কোন উপকার হবে না।

স্যার সাইয়েদ আহমদ খানের এই দৃষ্টিভংগিতে অনুপ্রাণিত কিছু সংখ্যক নেতৃস্থানীয় মুসলিম ১৯০৬ সনে ঢাকাতে একত্রিত হয়ে গড়ে তোলেন অল ইন্ডিয়া মুসলিম লীগ।

আগা খানের নেতৃত্বে হাঁটি হাঁটি পা পা করে মুসলিম লীগ উপ-মহাদেশের রাজনীতিতে ভূমিকা রাখতে শুরু করে। মূলত বিভিন্ন স্বায়ত্বশাসিত সংস্থা ও চাকুরীতে জনসংখ্যা অনুপাতে মুসলিমদের সুযোগ প্রদানের দাবিতে মুসলিম লীগ সোচ্চার ছিলো। অল ইন্ডিয়া মুসলিম লীগও ইসলামী মূল্যবোধের ভিত্তিতে মুসলিম জনগোষ্ঠীকে উজ্জীবিত করার কোন উদ্যোগ গ্রহণ করেনি। মুসলিম লীগের তাত্বিক ভিত্তিকে বলা যায় মুসলিম জাতীয়তাবাদ।

সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী অল ইন্ডিয়া ন্যাশনাল কংগ্রেস, অল ইন্ডিয়া মুসলিম লীগ ও কংগ্রেস ঘেঁষা জমিয়তে উলামায়ে হিন্দের রাজনীতির সাথে কখনো জড়িত হননি।

৯. ইসলামী জাগরণের নাকীব 'তারজুমানুল কুরআন'

১৯৩২ সন। আবু মুহাম্মাদ মুসলিহ হায়দারাবাদ থেকে মাসিক তারজুমানুল কুরআন নামে একটি ইসলামী পত্রিকা প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। সম্পাদক হিসেবে তিনি বেছে নেন সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদীকে। এই সময় তাঁর বয়স ছিলো উনত্রিশ বছর।

অল্পকাল পর এই পত্রিকার মালিকানাও তাঁর হাতে তুলে দেয়া হয়।

তারজুমানুল কুরআনের প্রথম সম্পাদকীয়তে সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী লিখেন, "এই পত্রিকার উদ্দেশ্য হচ্ছে আল্লাহর বাণীকে বুলন্দ করা ও মানুষকে আল্লাহর পথে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালানোর আহ্বান জানানো। বিশেষ উদ্দেশ্য হচ্ছে আল কুরআনের নিরিখে দুনিয়ায় বিস্তারশীল চিন্তা-চেতনা, সভ্যতা-সংস্কৃতির নীতিমালার ওপর মন্তব্য করা, বর্তমান দর্শন, বিজ্ঞান, রাজনীতি, অর্থনীতি, সংস্কৃতি ও সমাজতত্বের প্রেক্ষাপটে আল কুরআন ও আস্‌সুন্নাহর নীতিগুলো

ব্যাখ্যা করা এবং যুগের প্রেক্ষাপটে আলকুরআন ও আস্সুন্নাহর বিধানগুলোর প্রয়োগ-পদ্ধতি নির্দেশ করা। এই পত্রিকা মুসলিমদেরকে এক নতুন জীবনের দিকে আহ্বান জানাচ্ছে।"

ইসলামী জাগরণের নাকীব হিসেবেই মাসিক তারজুমানুল কুরআনের আত্ম-প্রকাশ ঘটে।

১০. উপ-মহাদেশের মুসলিমদের নতুন দুর্ভোগ

১৯৩৫ সনে বৃটিশ পার্লামেন্টে গভর্ণমেন্ট অব ইন্ডিয়া এ্যাক্ট পাস হয়। এই এ্যাক্ট অনুযায়ী প্রাদেশিক স্বায়ত্ব শাসন দেবার অভিপ্রায়ে উপ-মহাদেশকে এগারোটি প্রদেশে বিভক্ত করে প্রাদেশিক পরিষদ গঠনের উদ্যোগ নেয়া হয়।

১৯৩৭ সনের ফেব্রুয়ারী মাসে অনুষ্ঠিত হয় প্রাদেশিক পরিষদগুলোর নির্বাচন। নির্বাচনের ফলাফলের ভিত্তিতে উত্তর প্রদেশ, মধ্য প্রদেশ, বিহার প্রদেশ, উড়িশা প্রদেশ, বোম্বাই প্রদেশ ও মাদ্রাজ প্রদেশ- এই সাতটি প্রদেশে কায়েম হয় কংগ্রেস সরকার। সিন্ধ প্রদেশ, পাঞ্জাব প্রদেশ, বাংলা প্রদেশ ও আসাম প্রদেশ- এই চারটি প্রদেশে মুসলিম লীগ ও অন্যরা মিলে কায়েম করে কোয়ালিশন সরকার।

কংগ্রেস শাসিত সাতটি প্রদেশে কার্যত প্রতিষ্ঠিত হয় হিন্দুরাজ। এই প্রদেশগুলোতে জাতীয় সংগীত হিসেবে গৃহীত হয় বংকিম চন্দ্র চ্যাটার্জী রচিত হিন্দু রণ-সংগীত 'বন্দে মাতরম'। সরকারী ভাষা হয় হিন্দী। উর্দূ ভাষা উপেক্ষিত হয়। বিদ্যামন্দির-স্কীম ও ওয়ার্ধা স্কীম অব এডুকেশান অনুযায়ী নতুন শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করা হয়। পাঠ্যপুস্তকে স্থান পায় হিন্দু বীরদের জীবনী। মুসলিম বীরদের নামধারী স্থানগুলোর নাম পরিবর্তন করা হয়। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে বাধ্যতামূলকভাবে অনুষ্ঠিত হতে থাকে স্বরস্বতী পূজা। সরকারী চাকুরীতে মুসলিমদের রিক্রুটমেন্ট প্রায় বন্ধ হয়ে যায়। মুসলিমদের ওপর হামলা চলতে থাকে নানা অজুহাতে।

১৯৩৭ সনের জুলাই মাসে সাতটি প্রদেশে কংগ্রেসের শাসন কায়েম হওয়ার পর আড়াই বছর ধরে এই দুর্ভোগ সইতে হয় মুসলিমদেরকে। ১৯৩৯ সনে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শুরু হলে ইংরেজ শাসকগণ যুদ্ধে উপ-মহাদেশের লোকদের সহযোগিতা চায়। মোহন দাস করম চাঁদ গান্ধী ইংরেজদের কাছে জানতে চান যে এই সহযোগিতা দেয়া হলে যুদ্ধের পর উপ-মহাদেশকে স্বাধীনতা দেয়া হবে কিনা। এর কোন সন্তোষজনক জওয়াব দেয়নি বৃটিশ সরকার। ফলে মিঃ গান্ধীর নির্দেশে পদত্যাগ করে সাতটি প্রদেশের কংগ্রেস সরকার। হাঁফ ছেড়ে বাঁচে সাতটি প্রদেশের কোণঠাসা মুসলিম জনগোষ্ঠী।

১৯৩৭ সনে সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী দিল্লীতে আসেন ও এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে বিয়ে করেন। এই সময় তাঁর বয়স হয়েছিলো ৩৪ বছর। দিল্লীতে অবস্থানকালে তিনি লক্ষ্য করেন যে দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি দ্রুত পরিবর্তিত হচ্ছে। কংগ্রেস শাসিত সাতটি প্রদেশের মুসলিমদের করুণ দশা সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা লাভ করে তিনি দারুণভাবে ব্যথিত হন। হায়দারাবাদ ফিরে এসে তিনি মুসলিমদের নাজুক রাজনৈতিক অবস্থা বিশ্লেষণ করে তারজুমানুল কুরআন পত্রিকায় নিবন্ধ ছাপতে থাকেন।

১১. জামালপুরের পথে

সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী তারজুমানুল কুরআনের সৌজন্য কপি পাঠাতেন লাহোরে ডঃ মুহাম্মাদ ইকবালের কাছে। ডঃ ইকবাল তখন বেশ বুড়ো হয়ে গিয়েছিলেন। অন্যকে দিয়ে পড়িয়ে তিনি তারজুমানুল কুরআন শুনতেন।

১৯৩৬ সনে ডঃ ইকবাল সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদীকে পরামর্শ দিয়েছিলেন তাঁর কর্মস্থল হিসেবে পাঞ্জাবকে বেছে নিতে। সাইয়েদ আবুল আ'লা অপরাগতা প্রকাশ করেন।

জনৈক চৌধুরী নিয়ায আলীর বিশাল ভূ-সম্পত্তি ছিলো পূর্ব পাঞ্জাবের গুরুদাসপুর জিলার পাঠানকোট তহসিলের জামালপুর গ্রামে। তিনি সেই সম্পত্তি দীনী কাজের জন্য ওয়াক্ফ করে দিতে চান। তিনি তারজুমানুল কুরআনের মাধ্যমে সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদীর চিন্তাধারার সাথে পরিচিত ছিলেন। তিনি সাইয়েদ আবুল আ'লাকে তাঁর অভিপ্রায় জানিয়ে একটি চিঠি লিখেন।

আবুল আ'লা একটি ইসলামী পল্লী গড়ে তোলার পরিকল্পনা তৈরি করে পাঠান। পরিকল্পনার কপি নিয়ে চৌধুরী নিয়ায আলী ডঃ মুহাম্মাদ ইকবালের সাথে সাক্ষাত করেন। ডঃ ইকবাল এই পরিকল্পনা অনুমোদন করেন এবং এই কাজের জন্য সাইয়েদ আবুল আ'লাকে নিয়ে আসার জন্য চৌধুরী নিয়ায আলীকে পরামর্শ দেন।

চৌধুরী নিয়ায আলী সাইয়েদ আবুল আ'লাকে চিঠি লেখেন। ঐ চিঠি পেয়ে সাইয়েদ আবুল আ'লা লাহোরে এসে ডঃ মুহাম্মাদ ইকবালের সাথে সাক্ষাত করেন। ডঃ ইকবাল তাঁকে চৌধুরী সাহেবের আহ্বানে সাড়ে দিতে বলেন। এবার সাইয়েদ আবুল আ'লা রাজি হন।

১২. একটি লোভনীয় প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান

সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী হায়দারাবাদ ছেড়ে যাবেন শুনে উসমানীয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামীয়াত বিভাগের প্রধান মানাযির আহ্সান তাঁকে মাসিক

আটশত পঞ্চাশ রুপি বেতনে ইসলামীয়াতের অধ্যাপক পদে নিযুক্তির প্রস্তাব দেন। সন্দেহ নেই, এটি ছিলো খুবই লোভনীয় প্রস্তাব। তাঁর বড়ো ভাই সাইয়েদ আবুল খায়েরও তাঁকে এই প্রস্তাবে সম্মত হতে বলেন। কিন্তু আল্লাহর দীনের আওয়াজ বুলন্দ করার মহান প্রেরণা তাঁকে এই লোভনীয় প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করার হিম্মত যোগায়। তিনি তাঁর বড়ো ভাইকে বলেন,

"আমি (দেশের রাজনৈতিক) দিগন্তে দুর্যোগের ঘনঘটা দেখতে পাচ্ছি। সারা দেশের ওপর দিয়ে এক ভয়ানক ঝড় বয়ে যাবে। এর পরিণাম ১৮৫৭ সনের স্বাধীনতা যুদ্ধের পরিণামের চেয়েও গুরুতর হবে। হায়দারাবাদে অবস্থান করে আমি এই সম্পর্কে সতর্ক সংকেত দিতে পারবো না। এখানে তা বিবেচিত হবে রাষ্ট্রদ্রোহিতা বলে। আমাকে এমন এক জায়গায় যেতে হবে যেখান থেকে আমি স্বাধীনভাবে আমার মত প্রকাশ করতে পারবো।

কাউমের খিদমতে আমি নিজকে নিয়োজিত করতে চাই। আমি বিত্তহীন। কিন্তু আমার বিত্তহীনতা আমার সংকল্পের পথে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে না। আমাকে তাড়াতাড়ি করতে হচ্ছে। আমি বিলম্ব করতে পারছি না। প্রথমে অর্থ বানানোর জন্য আমি যদি দেরি করি, এই অর্থ বানানো যাত্রার বিড়ম্বনা সইতে আমাকে বাধা দেবে। ভাই, আমাকে আমার তাকদীরের পথে অগ্রসর হবার অনুমতি দিন। আমাকে আপনার দু'আ দিন। পথ বন্ধুর। কিন্তু যদি ইচ্ছা থাকে, আল্লাহর অনুগ্রহ যদি লাভ করি, আমি আমার মিশনে সফল হবোই। আমার কাছে বৈষয়িক সুবিধা অর্জনের চেয়ে আমার মিশনের সফলতা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ।"

১৩. ইসলামী পল্লী গঠন

১৯৩৮ সনের মার্চ মাস। সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী তাঁর নব পরিনীতা স্ত্রী মাহমুদাহকে নিয়ে পৌঁছলেন জামালপুর।

কয়েকটি বাড়ি নিয়ে একটি গ্রাম। ঐ কয়টি বাড়ি ছাড়া আর কিছুই ছিলোনা সেখানে। শহুরে জীবনের চাকচিক্য ও সুযোগ সুবিধা এখানে অনুপস্থিত। এক মহান স্বপ্নে বিভোর সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী এলেন গাঁয়ে। তাঁর সাথে এলেন উচুঁ ঘরের মেয়ে মাহমুদাহ। শহর ছেড়ে অজ পাড়াগাঁয়ে এসেছেন বলে তাঁর মনে কোন দুঃখ নেই। স্বামীর মিশনে নিষ্ঠাবান সহযোগী হতে পারাতেই তাঁর আনন্দ। জামালপুরের মুক্ত পরিবেশ ও নির্মল আবহাওয়া তাঁদের বেশ ভালো লাগছিলো।

গঠিত হলো দারুল ইসলাম ট্রাস্ট। একদল গবেষক যোগাড়ের চেষ্টা করেন সাইয়েদ আবুল আ'লা। প্রথমে তাঁর ডাকে সাড়া দেন ঝিলাম জিলার খানপুর

গ্রামের প্রতিভাবান যুবক ফজলুর রহমান। ইনিই পরে নায়ীম সিদ্দিকী নামে পরিচিত হন। ছয়জন সাথী নিয়ে কাজ শুরু করেন সাইয়েদ আবুল আ'লা।

মাসজিদে নিয়মিতভাবে জামায়াতে ছালাত আদায় শুরু হয়। ইমামত করতেন সাইয়েদ আবুল আ'লা। প্রতিদিন সকালে অনুষ্ঠিত হতো দারসুল কুরআন।

সেখানে একটি সমৃদ্ধ লাইব্রেরী গড়ে তোলা হয়। গবেষণাধর্মী পড়াশুনা হতো সেখানে। বিকেলে তাঁরা নিকটবর্তী খালের তীরে বেড়াতে যেতেন।

জুমাবার নিকটবর্তী গ্রামের লোকেরাও আসতো ঐ মাসজিদে। সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী প্রাঞ্জল ভাষায় ইসলামের বিভিন্ন বিষয় বিশ্লেষণ করে খুতবাহ দিতেন। ছালাতুল জুমুআর ইমামতও তিনি করতেন। খুতবাহর মাধ্যমে তিনি ঈমান, ইসলাম, ছালাত, ছাওম, যাকাত, হাজ, জিহাদ ইত্যাদি সম্পর্কে শ্রোতাদেরকে জ্ঞান-সমৃদ্ধ করে তোলেন।

১৪. রাজনৈতিক দিক-নির্দেশনা

হায়দারাবাদে অবস্থানকালে তিনি পত্রিকাতে প্রধানত ইসলামের মৌলিক বিষয়ে আলোচনা করতেন। জামালপুরে এসে মৌলিক বিষয়গুলোর সাথে সাথে ক্রমাগতভাবে রাজনৈতিক দিকনির্দেশনামূলক প্রবন্ধও লিখতে থাকেন।

তিনি অল ইন্ডিয়া ন্যাশনাল কংগ্রেসের আদর্শ জাতীয়তাবাদ, ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ ও সেক্যুলার গণতন্ত্রের সমালোচনা করেন। জমিয়তে উলামায়ে হিন্দ কংগ্রেসের রাজনীতির সমর্থকে পরিণত হওয়ায় তিনি এই সংস্থারও সমালোচনা করেন। তদুপরি মুসলিম লীগের ভ্রান্তিও তিনি চোখে আংগুল দিয়ে দেখিয়ে দিতে থাকেন।

অল ইন্ডিয়া ন্যাশনাল কংগ্রেসের প্রধান চালিকা শক্তি ছিলেন জাওহার লাল নেহরু। তিনি মুসলিমদেরকে স্বতন্ত্র জাতি হিসেবে মেনে নিতে ছিলেন নারাজ। তাঁর মতে মুসলিমদেরকে আলাদা জাতি গণ্য করার অর্থ দাঁড়াবে একজাতির ভেতর আরেক জাতির অস্তিত্ব মেনে নেয়া। তদুপরি তিনি ছিলেন সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী। তিনি ধর্ম-কর্মকে কুসংস্কার গণ্য করতেন। তিনি ব্যঙ্গ করে বলতেন যে ইসলামী জীবন পদ্ধতি মানে হচ্ছে বিশেষ ধরনের পাজামা পরা, দাড়ি রাখা ও বিশেষ ধরনের লোটা (বদনা) বহন করা।

জাওহার লাল নেহরু জানতেন যে মুসলিমরা তেমন সংগঠিত নয়। 'মুসলিম গণ সংযোগ' কার্যক্রম পরিচালনা করে তাদেরকে কংগ্রেসের ভেতরে ঢুকিয়ে নেয়া সম্ভব। সেই জন্য কংগ্রেসের অন্তর্ভুক্ত মুসলিম নামধারী ব্যক্তিদের দ্বারাই এই কার্যক্রম শুরু হয়।

বিহার প্রদেশের ডঃ সাঈদ মাহমুদ নামকাওয়াস্তে মুসলিম ছিলেন। কার্যত তিনি ছিলেন ইসলামের কট্টর দুশমন। তিনি বলতেন যে ধর্মীয় পরিচয়ে হিন্দু ও মুসলিমরা পরিচিত হওয়া উচিত নয়। দেশের নাম 'হিন্দুস্থান' আর দেশের সবাই 'হিন্দী' বলে আখ্যায়িত হওয়া উচিত। মুসলিমদেরও উচিত হিন্দী নাম গ্রহণ করা। এতে হিন্দু-মুসলিমের পার্থক্য ঘুচে যাবে।

অল ইন্ডিয়া ন্যাশনাল কংগ্রেস মুসলিমদেরকে বোকা বানিয়ে দলে ভেড়াবার জন্য "ইসলামীয়াত সেল" গঠন করে। এর প্রধান কর্মকর্তা হন ডঃ মুহাম্মাদ আশরাফ। তিনি প্রচার করতেন যে রাজনীতিতে ধর্মকে টেনে আনা পশ্চাদপদতার লক্ষণ। একটি প্রগতিশীল ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য রাজনৈতিক বিষয়ে একজন হিন্দু হিন্দু থাকবে না, একজন মুসলিম মুসলিম থাকবে না। ব্যক্তিগত জীবনে তারা যেই কোন ধর্মে বিশ্বাস রাখতে পারে, কিন্তু প্রকাশ্য জীবনে ধর্মমত নির্বিশেষে একজাতির সদস্য হিসেবে আচরণ করবে। ডঃ মুহাম্মাদ আশরাফ সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি মুসলিমদেরকে বলতে থাকেন যে দুনিয়ার পরবর্তী দ্বন্দ্ব হবে বিত্তবানদের সাথে সর্বহারাদের। আর মুসলিমরা যেহেতু অর্থনৈতিক দিক দিয়ে পিছিয়ে রয়েছে, একটি সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের মাঝেই নিহিত রয়েছে তাদের মুক্তি।

এই সব বক্তব্যে বিভ্রান্ত হচ্ছিলো মুসলিম জনগোষ্ঠী। তখন সামগ্রিকভাবে উপ-মহাদেশের মুসলিমদের আদর্শিক অবস্থা ছিলো খুবই নাজুক। ইসলাম ও জাহিলিয়াতের পার্থক্য বুঝার যোগ্যতা ছিলো না তাদের অনেকের। ইসলামী জীবন দর্শন ও জীবন বিধান সম্পর্কে জ্ঞানের স্বল্পতা তাদেরকে সহজেই বিপথগামী করে তুলছিলো।

এই অমানিশায় ইসলামের বিভিন্ন দিক উপস্থাপন করে লিখে চলছিলেন সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী। আদর্শিক জ্ঞান বিতরণের সাথে সাথে রাজনৈতিক দিক-নির্দেশনামূলক লেখাও তিনি লিখছিলেন।

সামগ্রিকভাবে মুসলিমরা কংগ্রেসে যোগদানের ব্যাপারে ছিলো দ্বিধান্বিত। সেই জন্য কংগ্রেস মুসলিমদেরকে স্বাধীনতার বিপক্ষ শক্তি বলে আখ্যায়িত করতে থাকে। এই সময় সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী লিখেন যে মুসলিমরা স্বাধীনতার বিরোধী নয়। কিন্তু তারা এমন স্বাধীনতা চায় যেখানে তারা মুসলিম হিসেবে জীবন যাপন করার ও ইসলামী নীতির ভিত্তিতে সংগঠিত রাষ্ট্র হিসেবে তাদের সমাজ পরিচালনার নিশ্চয়তা লাভ করবে।

১৫. 'এক জাতি' তত্ত্বের পক্ষে মাওলানা হুসাইন আহমাদ মাদানীর ওকালতি

১৯৩৮ সনের প্রথম ভাগেই জমিয়তে উলামায়ে হিন্দের অন্যতম শীর্ষ নেতা মাওলানা হুসাইন আহমাদ মাদানী 'মুত্তাহিদা কাওমিয়াত' শীর্ষক বই লিখে মুসলমানদেরকে বুঝাতে চান যে হিন্দু-মুসলিম মিলে এক জাতি হওয়াতে ও একত্রে কাজ করাতে কোন দোষ নেই।

মাওলানা হুসাইন আহমাদ মাদানী তাঁর বইতে লিখেন,

"আমরা প্রতিদিন সম্মিলিত স্বার্থের জন্য সংঘ বা সমিতি গঠন করে থাকি এবং তাতে শুধু অংশ গ্রহণ করি না বরং সদস্যপদ লাভ করার জন্য প্রাণপণ চেষ্টাও করে থাকি। শহর এলাকা, বিশেষ এলাকা, মিউনিসিপ্যাল বোর্ড, জিলাবোর্ড, ব্যবস্থা পরিষদ, শিক্ষা সমিতি এবং এই ধরনের শত শত সমিতি রয়েছে যা বিশেষ উদ্দেশ্যে নির্দিষ্ট নিয়মনীতি অনুযায়ী গঠিত। এইসব সমিতিতে অংশগ্রহণ করা এবং সেই জন্য পূর্ণভাবে কিংবা আংশিকভাবে চেষ্টা করাকে কেউ নিষিদ্ধ বলে না। কিন্তু বিস্ময়ের বিষয়, এই ধরনের কোন সমিতি যদি দেশের স্বাধীনতা অর্জন ও বৃটিশ প্রভুত্বের বিরুদ্ধে কাজ করার জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন তাতে অংশ গ্রহণ করা হারাম, ন্যায়পরায়ণতার খেলাফ, ইসলামী শিক্ষার পরিপন্থি ও জ্ঞান-বুদ্ধির বিপরীত হয়ে যায়।" মুত্তাহিদা কাউমিয়াত, হুসাইন আহমাদ মাদানী, পৃঃ ৫২

১৬. 'এক জাতি' তত্ত্বের অসারতা প্রমাণ

জাতীয়তাবাদের প্রশ্নে মুসলিমরা যাতে চিন্তার বিভ্রান্তির শিকার না হয় সেই জন্য সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী তারজুমানুল কুরআনে এই বিষয়ে দীর্ঘ আলোচনা পেশ করেন "মাসালায়ে কাউমিয়াত" নামে। তিনি লিখেন, "ইসলামী জাতীয়তায় মানুষে মানুষে পার্থক্য করা হয় বটে, কিন্তু জড়, বৈষয়িক ও বাহ্যিক কোন কারণে নয়। এটা করা হয় আধ্যাত্মিক, নৈতিক ও মানবিকতার দিক দিয়ে। মানুষের সামনে এক স্বাভাবিক সত্য-বিধান পেশ করা হয়েছে, যার নাম ইসলাম। আল্লাহর দাসত্ব ও আনুগত্য, হৃদয়-মনের পবিত্রতা-বিশুদ্ধতা, কর্মের অনাবিলতা, সততা ও দীন অনুসরণের দিকে গোটা মানব জাতিকে আহ্বান জানানো হয়েছে। তারপর বলা হয়েছে, যারা এই আহ্বান গ্রহণ করবে তারা একজাতি হিসেবে গণ্য হবে। আর যারা তা অগ্রাহ্য করবে তারা ভিন্ন জাতির অন্তর্ভুক্ত হবে। অর্থাৎ মানুষের একটি হচ্ছে ঈমান ও ইসলামের জাতি। তার ব্যক্তি সমষ্টি মিলে একটি উম্মাহ। মানুষের অন্যটি হচ্ছে কুফর ও ভ্রষ্টতার জাতি। তারা পারস্পরিক মত-বিরোধ ও বৈষম্য সত্ত্বেও একই দল।"

"এই দুইটি জাতির মধ্যে বংশ ও গোত্রের দিক দিয়ে কোন পার্থক্য নেই। পার্থক্য বিশ্বাস ও কর্মের। কাজেই একই আব্বা-আম্মার দুই সন্তান ইসলাম ও কুফরের উল্লেখিত পার্থক্যের কারণে স্বতন্ত্র দুই জাতির মধ্যে গণ্য হতে পারে এবং দুই নিঃসম্পর্ক ও অপরিচিত ব্যক্তি ইসলামে প্রবেশ করার কারণে এক জাতির অন্তর্ভুক্ত হতে পারে।"

"জন্মভূমির পার্থক্যও এই উভয় জাতির ব্যবধানের কারণ হতে পারে না। এখানে পার্থক্য করা হয় হক ও বাতিলের ভিত্তিতে। আর হক ও বাতিলের স্বদেশ বা জন্মভূমি বলে কিছু নেই। একই শহর একই মহল্লা ও একই ঘরের দুই ব্যক্তির জাতীয়তা ইসলাম ও কুফরের পার্থক্যের কারণে বিভিন্ন হতে পারে। একজন নিগ্রো ইসলামের সূত্রে একজন মরক্কোবাসীর ভাই হতে পারে।"

"বর্ণের পার্থক্যও এখানে জাতীয় পার্থক্যের কারণ নয়। বাহ্যিক চেহারার রঙ ইসলামে নগন্য। এখানে একমাত্র আল্লাহর রঙেরই গুরুত্ব রয়েছে। আর এটাই হচ্ছে সবচে' উত্তম রঙ।"

"ভাষার বৈষম্যও ইসলাম ও কুফরের পার্থক্যের কারণ নয়। ইসলামে মুখের ভাষার মূল্য নেই, মূল্য হচ্ছে হৃদয়ের ভাষাহীন কথার।"

"ইসলামী জাতীয়তা বৃত্তের কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছে কালেমা "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ"। বন্ধুতা আর শত্রুতা এই কালেমার ভিত্তিতেই হয়ে থাকে। এই কালেমার স্বীকৃতি মানুষকে একীভূত করে, অস্বীকৃতি চূড়ান্ত বিচ্ছেদ ঘটায়। এই কালেমা যাকে বিচ্ছিন্ন করে তাকে রক্ত, মাটি, ভাষা, বর্ণ, শাসন ব্যবস্থা প্রভৃতি কোন সূত্র ও কোন আত্মীয়তাই যুক্ত করতে পারে না। অনুরূপভাবে এই কালেমা যাদেরকে যুক্ত করে তাদেরকে কোন কিছুই বিচ্ছিন্ন করতে পারে না।"

"উল্লেখ্য যে অমুসলিম জাতিগুলোর সাথে মুসলিম জাতির সম্পর্কের দুইটি দিক রয়েছে। প্রথমটি এই যে, মানুষ হিসেবে মুসলিম অ-মুসলিম সকলেই সমান। আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে এই যে, ইসলাম ও কুফরের পার্থক্যের কারণে আমাদেরকে তাদের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা করে দেয়া হয়েছে। প্রথম সম্পর্কের দিক দিয়ে মুসলিমরা তাদের সাথে সহানুভূতি, ঔদার্য ও সৌজন্যমূলক আচরণ করবে। কারণ মানবতার নিরিখে এই রূপ ব্যবহারই তারা পেতে পারে। এমন কি তারা যদি ইসলামের দুশমন না হয়, তাদের সাথে বন্ধুত্ব, সন্ধি ও মিলিত উদ্দেশ্যের (Common Cause) জন্য সহযোগিতাও করা যেতে পারে। কিন্তু কোন প্রকার বস্তুগত ও বৈষয়িক সম্পর্ক তাদেরকে ও আমাদেরকে মিলিত করে 'এক জাতি' বানিয়ে দিতে পারে না।"

১৭. লাহোরে আগমন

দূরদর্শী সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী অনুভব করেন যে সামগ্রিক প্রয়োজনের বিবেচনায় দারুল ইসলাম ট্রাস্টকে দারুল ইসলাম আন্দোলনে পরিণত করা প্রয়োজন। এই বিষয়ে চৌধুরী নিয়ায আলীর সাথে তাঁর মত পার্থক্য সৃষ্টি হয়। চৌধুরী নিয়ায আলীর মত ছিলো, দারুল ইসলাম ট্রাস্ট চিন্তা-গবেষণার কাজ চালাতে থাকুক, আর রাজনীতি সামলাক মুসলিম লীগ। এই মত পার্থক্যের কারণে সাইয়েদ আবুল আ'লা জামালপুর ত্যাগ করেন।

১৯৩৮ সনের ডিসেম্বর মাসে সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী লাহোর আসেন। ইসলামীয়া পার্কের একটি বাড়ি ভাড়া করে তিনি তাতে উঠেন। এই বাড়িটি তাঁর বাসস্থান ও তারজুমানুল কুরআনের কার্যালয় হিসেবে ব্যবহৃত হতে থাকে।

১৮. আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির ওপর তীক্ষ্ণদৃষ্টি

১৯৩৯ সনে শুরু হয় দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ। ঐ বছর পহেলা সেপ্টেম্বর বৃটেনের প্রধানমন্ত্রী নেভিল চেম্বারলেন জার্মেনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামার ঘোষণা দেন। তিনি দুনিয়াবাসীকে এই ধারণা দেবার চেষ্টা করেন যে ইংরেজ জাতি শান্তি-প্রিয় জাতি, তাদের ওপর যুদ্ধ চাপিয়ে দেয়া হয়েছে এবং শান্তি ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার খাতিরে ইংরেজরা যুদ্ধে নামতে বাধ্য হচ্ছে।

সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী তারজুমানুল কুরআনে নিবন্ধ লিখে ইংরেজ জাতির ভালো মানুষীর মুখোশ খুলে দেন। তিনি লিখেন যে দুনিয়ার সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলোর মধ্যে ইংরেজরাই সবচে' বেশি শক্তিশালী, তারা দুনিয়ার বহু দেশে সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন চালিয়ে সেইগুলোকে তাদের পদানত করেছে, উপমহাদেশেও তারা প্রতারণা ও চাতুর্যের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে, প্রথম মহাযুদ্ধের সময় তারা মুসলিমদেরকে যেই সব ওয়াদা দিয়েছিলো সেইগুলো রক্ষা করেনি, তারাই মুসলিমদের মধ্যে অনৈক্যের বীজ বুনেছে, মুসলিমদেরকে মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামিয়েছে এবং তারাই মুসলিম ফিলিস্তিনের বুকে ইসরাঈল রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা করেছে। এই সব রেকর্ড নিয়ে তারা শান্তির জন্য যুদ্ধে নেমেছে এমন দাবি করা শোভা পায় না।

১৯. লাহোর ইসলামীয়া কলেজে অধ্যাপনা

১৯৩৯ সনের ৭ই সেপ্টেম্বর সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী লাহোর ইসলামীয়া কলেজে ইসলামীয়াতের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। তবে তিনি বেতন নিতে রাজি হননি। অধ্যাপক হিসেবে তিনি ইসলামের আধ্যাত্মিক দিক বিশ্লেষণ করেই ক্ষান্ত

হতেন না। তিনি সুন্দরভাবে ইসলামের রাজনীতি, অর্থনীতি, মুসলিম উম্মাহর কর্তব্য ইত্যাদি বিষয় উপস্থাপন করতেন। এতে কলেজ কর্তৃপক্ষ বিব্রত বোধ করে ও তাঁকে রাজনীতি সম্পর্কে আলোচনা পরিহার করতে বলে। সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী কর্তৃপক্ষের বেঁধে দেয়া গন্ডির ভেতরে থেকে ইসলামকে কাটসাঁট করে আলোচনা রাখতে অস্বীকৃতি জানান।

এই মতপার্থক্যের কারণে ১৯৪০ সনের সেপ্টেম্বর মাসে তিনি ইসলামীয়া কলেজে অধ্যাপনা ত্যাগ করেন।

অখণ্ড মনোযোগ সহকারে তিনি তারজুমানুল কুরআন সম্পাদনা করতে থাকেন।

২০. পাকিস্তান আন্দোলন

মিঃ মুহাম্মাদ আলী জিন্নাহ প্রথমে অল ইন্ডিয়া ন্যাশনাল কংগ্রেসের সদস্য ছিলেন। পরে তিনি একই সময়ে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের সদস্য রূপে কাজ করেন। পরে কংগ্রেসের মুসলিম-বিদ্বেষী মনোভংগির কারণে তিনি কংগ্রেস থেকে সরে আসেন। ১৯৩৪ সনে তিনি অল ইন্ডিয়া মুসলিম লীগের সভাপতি নির্বাচিত হন। তখন থেকে মুসলিম লীগ বেগবান হয়ে উঠে।

১৯৪০ সনের ২২, ২৩ ও ২৪শে মার্চ লাহোরের মিন্টু পার্কে অনুষ্ঠিত হয় অল ইন্ডিয়া মুসলিম লীগের বার্ষিক সম্মেলন। এই সম্মেলনের উদ্বোধন করতে গিয়ে মুহাম্মাদ আলী জিন্নাহ বলেন,

"এই কথা বুঝা বড়ো কঠিন যে আমাদের হিন্দু ভাইয়েরা ইসলাম ও হিন্দু ধর্মের প্রকৃত স্বরূপ কেন বুঝতে পারেন না। আসলে এই দুইটি কোন ধর্ম নয় বরং প্রকৃত পক্ষে দুইটি পৃথক ও সুস্পষ্ট সমাজ ব্যবস্থা এবং হিন্দু ও মুসলিমকে মিলিত করে একই জাতীয়তা গঠন একটা কল্পনা বিলাস মাত্র। এক জাতীয়তাবাদের ভুল ধারণাটি সীমালংঘন করে আমাদের রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণ হয়ে পড়েছে। যথাসময়ে আমাদের দৃষ্টিভংগির পরিবর্তন করতে ব্যর্থ হলে, ভারতকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেয়া হবে। হিন্দু ও মুসলিমদের পৃথক পৃথক ধর্মীয় দর্শন, সামাজিক রীতিনীতি ও সাহিত্য-সম্ভার রয়েছে। তারা পরস্পর বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয় না, একত্রে পানাহার করে না। তারা দুইটি স্বতন্ত্র সভ্যতা ও সংস্কৃতির অধিকারী যা দুইটি বিপরীত ধারণা-বিশ্বাসের ভিত্তিতে গঠিত। তাদের জীবন সম্পর্কিত দৃষ্টিভংগিও আলাদা।

এই কথাও সত্য যে হিন্দু ও মুসলিম ইতিহাসের ভিন্ন ভিন্ন উৎস থেকে প্রেরণা লাভ করে। তাদের রয়েছে পৃথক মহাকাব্য, মহাগ্রন্থ, পৃথক জাতীয় বীর এবং প্রাসংগিক

উপাদান ও ঘটনাপঞ্জী। অধিকাংশ ক্ষেত্রে একজনের জাতীয় বীর অন্য জনের শত্রু। এই ধরনের বিপরীতমুখী দুইটি জাতিকে– যাদের একটি সংখ্যাগুরু ও অপরটি সংখ্যালঘু– একই রাষ্ট্রে যুক্ত করে দিলে অশান্তি বাড়তে থাকবে এবং এমন রাষ্ট্রে সরকার পরিচালনার জন্য যেই কাঠামোই তৈরি হবে তা শেষ পর্যন্ত ধ্বংস হয়ে যাবে। জাতির যেই কোন সংজ্ঞা অনুযায়ী মুসলিমরা একটি জাতি এবং অবশ্যই তাদের থাকতে হবে একটি আবাসভূমি, একটি ভূখন্ড বা অঞ্চল ও একটি রাষ্ট্র।"

দ্রষ্টব্য ঃ বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস, আব্বাস আলী খান, পৃষ্ঠা ৪২২ ও ৪২৩

পরদিন অর্থাৎ ২৩শে মার্চ উপ-মহাদেশের মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ উত্তর-পশ্চিম অঞ্চল ও পূর্ব অঞ্চলকে নিয়ে স্বাধীন রাষ্ট্র গঠনের প্রস্তাব পাঠ করেন শেরেবাংলা এ. কে. ফজলুল হক। সম্মেলন সর্ব সম্মতিক্রমে উক্ত প্রস্তাব অনুমোদন করে। এই প্রস্তাবই "লাহোর প্রস্তাব" ও "পাকিস্তান প্রস্তাব" নামে সুবিদিত।

তখন থেকে মুসলিম লীগের নেতৃত্বে পাকিস্তান নামে মুসলিমদের একটি স্বতন্ত্র আবাসভূমি প্রতিষ্ঠার আন্দোলন চলতে থাকে। এই আন্দোলনের অন্যতম প্রধান শ্লোগান ছিলো– "পাকিস্তান কা মাতলাব কেয়া? –লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ।" মুসলিম জনগোষ্ঠীকে এই ধারণাই দেয়া হচ্ছিলো যে পাকিস্তান হবে একটি ইসলামী রাষ্ট্র। কিন্তু ইসলামী রাষ্ট্র গঠনের অপরিহার্য উপকরণ ইসলামী ব্যক্তিত্ব গঠনের কোন উদ্যোগই নিচ্ছিলেন না মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দ।

এই বিষয়ে সাইয়েদ আবুল আ'লা তাঁদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। কিন্তু তাঁরা তাঁর কথায় কান দিলেন না।

২১. ইসলামী রাষ্ট্র গঠন পদ্ধতির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ

১৯৪০ সনের ১২ সেপ্টেম্বর "আনজুমানে ইসলামী তারীখ ওয়া তামাদ্দুন" নামক সংস্থার উদ্যোগে আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের স্ট্র্যাচি হলে একটি আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। উক্ত সভায় সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী একটি জ্ঞানগর্ভ ভাষণ দেন। বিষয়বস্তু ছিলো "ইসলামী হুকুমাত কিস তারাহ কায়েম হোতি হায়।"

(ইসলামী রাষ্ট্র কিভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়)।

সেই ভাষণের একাংশে তিনি বলেন,

"এই রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য প্রয়োজন এমন সব লোকের যাদের অন্তরে রয়েছে আল্লাহর ভয়। যারা নিজেদের দায়িত্ব পালন সম্পর্কে আল্লাহর নিকট জওয়াবদিহি

করতে হবে বলে অনুভূতি রাখে। যারা দুনিয়ার ওপর আখিরাতকে অগ্রাধিকার দেয়। যাদের দৃষ্টিতে নৈতিক লাভ-ক্ষতি পার্থিব লাভ-ক্ষতির চাইতে অধিক গুরুত্বপূর্ণ। যারা সর্বাবস্থায় সেই সব আইন-কানুন, বিধি-বিধান ও কর্মপদ্ধতি অনুসরণ করে যা তাদের জন্য বিশেষভাবে তৈরি হয়েছে। যাদের চেষ্টা-সাধনার একমাত্র লক্ষ্য হবে আল্লাহর সন্তোষ অর্জন। ব্যক্তিগত ও জাতিগত স্বার্থের দাসত্ব ও কামনা-বাসনার গোলামীর জিঞ্জির থেকে যাদের গর্দান সম্পূর্ণ মুক্ত। হিংসা-বিদ্বেষ ও দৃষ্টির সংকীর্ণতা থেকে যাদের মন-মানসিকতা সম্পূর্ণ পবিত্র। ধন-সম্পদ ও ক্ষমতার নেশায় যারা উন্মাদ হবার নয়। ধন-সম্পদের লালসা আর ক্ষমতার লিপ্সায় যারা কাতর নয়। এই রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য এমন নৈতিক বলিষ্ঠতার অধিকারী একদল লোক প্রয়োজন পৃথিবীর ধনভান্ডার হাতে এলেও যারা নিখাদ আমানতদার প্রমাণিত হবে। ক্ষমতা হস্তগত হলে জনগণের কল্যাণ চিন্তায় যারা না ঘুমিয়ে রাত কাটাবে। আর জনগণ যাদের সুতীব্র দায়িত্বানুভূতিপূর্ণ তত্ত্বাবধানে নিজেদের জান-মাল-ইযযতসহ যাবতীয় বিষয়ে থাকবে নিরাপদ ও নিরুদ্বিগ্ন। ইসলামী রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য প্রয়োজন এমন একদল লোকের যারা কোন দেশে বিজয়ী বেশে প্রবেশ করলে সেখানকার লোকেরা গণহত্যা, জনপদ ধ্বংসসাধন, যুলম-নির্যাতন, গুন্ডামী বদমায়েসী ও ব্যভিচারের ভয়ে ভীত হবে না। বরং বিজিত দেশের মানুষেরা এদের প্রতিটি সিপাহীকে পাবে তাদের জান-মাল-ইযযতের ও নারীদের সতীত্বের হিফাজাতকারী রূপে। আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে তারা এতোটা সুখ্যাতি ও মর্যাদার অধিকারী হবে যে তাদের সততা, সত্যবাদিতা, ন্যায়পরায়ণতা, নৈতিক-চারিত্রিক উৎকর্ষ ও ওয়াদা-প্রতিশ্রুতি পালনে গোটা দুনিয়া তাদের প্রতি হবে আস্থাশীল। এই ধরনের এবং কেবলমাত্র এই ধরনের লোকদের দ্বারাই প্রতিষ্ঠিত হতে পারে ইসলামী রাষ্ট্র।"

দ্রষ্টব্য ঃ ইসলামী বিপ্লবের পথ, সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী, পৃষ্ঠা-১৮

তিনি আরো বলেন,

"বর্তমানে মুসলিম নামে যেই জাতিটি এই দেশে বাস করছে তাতে ভালো-মন্দ সকল প্রকার লোকই রয়েছে। চরিত্রের দিক থেকে কাফিরদের মধ্যে যতো প্রকার লোক পাওয়া যায় ততো প্রকার লোক এই জাতির মধ্যেও বর্তমান। কোন কাফির জাতি আদালতে মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়ার জন্য যতো লোক যোগাড় করতে পারবে সম্ভবত এই জাতিও ততো লোক একত্রিত করতে পারবে। সুদ, ঘুষ, চুরি, ডাকাতি, যিনা, মিথ্যাচার ও ধোঁকাবাজিসহ যাবতীয় নৈতিক অপরাধের কাজে এই জাতিটি কাফিরদের চেয়ে মোটেই কম পারদর্শী নয়। পেট ভর্তি ও অর্থ উপার্জনের

জন্য কাফিররা যতো পথ অবলম্বন করে এই জাতির লোকেরাও ঠিক ততো পথই অবলম্বন করে। নিজ মুয়াক্কেলকে জিতানোর জন্য একজন মুসলিম আইনজীবী প্রকৃত সত্যকে চাপা দেবার সময় ঠিক ততোটাই আল্লাহর ভয়হীন হয়ে থাকে যতোটা হয়ে থাকে একজন অ-মুসলিম আইনজীবী। একজন মুসলিম ধন-সম্পদের প্রাচুর্য দ্বারা ও একজন মুসলিম শাসক ক্ষমতার দাপটে ঠিক সেই সব কাজই করে যা করে অ-মুসলিম ধনী ব্যক্তি ও শাসকেরা। যেই জাতি নৈতিক দিক দিয়ে এতোটা অধপতিত, তার সকল জগাখিচুড়ি চরিত্রের লোকদেরকে সংগঠিত করে দিলে, কিংবা রাজনৈতিক ট্রেনিংয়ের মাধ্যমে তাদেরকে শৃগালের চাতুর্য শিখিয়ে দিলে অথবা সামরিক ট্রেনিং দিয়ে তাদেরকে হিংস্র করে তুললে জংগলের কর্তৃত্ব লাভ হয়তো সহজ হবে, কিন্তু আমি বুঝি না তাদের দ্বারা আল্লাহর কালেমাকে বিজয়ী করার কাজ কিভাবে হওয়া সম্ভব।"

দ্রষ্টব্য ঃ ইসলামী বিপ্লবের পথ, সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী, পৃষ্ঠা ২৩

আরো এগিয়ে তিনি বলেন,

"এছাড়া আল্লাহর দীনকে বিজয়ী করার আন্দোলনের জন্য প্রয়োজন এমন নেতৃত্ব যারা সেই সব নীতি থেকে এক ইঞ্চিও বিচ্যুত হবে না যেইগুলোর প্রতিষ্ঠার জন্য ইসলামের আবির্ভাব। এই আদর্শিক দৃঢ়তার ফলে সকল মুসলিমকে যদি না খেয়েও মরতে হয় এমন কি তাদেরকে যদি হত্যাও করা হয়, তবুও তাদের নেতৃবৃন্দ বিন্দুমাত্র বিচ্যুতি বরদাশত করতে প্রস্তুত হবে না। যেই নেতৃত্ব কেবল জাতির স্বার্থ দেখে, আদর্শ জলাঞ্জলি দিয়ে জাতির স্বার্থে যেই কোন কর্মপদ্ধতি অবলম্বন করে এবং যাদের অন্তর আল্লাহর ভয়শূন্য, তারা যে আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠার মহান কাজের একেবারেই অযোগ্য, তা বলার অপেক্ষা রাখে না।"

দ্রষ্টব্য ঃ ইসলামী বিপ্লবের পথ, সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী, পৃষ্ঠা- ২৪

"গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে ক্ষমতা তো সেইসব লোকের হাতেই আসবে যাদেরকে ভোটাররা সমর্থন করবে। ভোটারদের মধ্যে যদি ইসলামী চিন্তা ও মানসিকতা সৃষ্টি না হয়, খাঁটি ইসলামী নৈতিক চরিত্র গঠনের আগ্রহই যদি তাদের না থাকে এবং ইসলামের সেই নিরপেক্ষ ইনসাফ ও অলংঘনীয় নীতিগুলো যদি তারা মেনে চলতে প্রস্তুত না হয় যেইগুলোর ভিত্তিতে ইসলামী রাষ্ট্র পরিচালিত হবে, তবে তাদের ভোট দ্বারা কখনো খাঁটি মুসলিম নির্বাচিত হয়ে পার্লামেন্টে আসতে পারবে না। এই অবস্থায় কেবল ঐসব লোকই নেতৃত্ব হাসিল করবে যারা আদমশুমারী অনুযায়ী তো মুসলিম, কিন্তু দৃষ্টিভংগি, কর্মনীতি ও কর্মপদ্ধতির দিক থেকে তাদের গায়ে ইসলামের বাতাসও লাগেনি। স্বাধীন মুসলিম দেশে এই ধরনের লোকদের

হাতে নেতৃত্ব আসার অর্থ হচ্ছে আমরা ঠিক সেই জায়গাতেই অবস্থান করবো, যেখানে অবস্থান করছিলো অ-মুসলিম সরকার। বরং এই ধরনের মুসলিম সরকার আমাদেরকে তার চাইতেও নিকৃষ্ট অবস্থায় নিয়ে যাবে।"

দ্রষ্টব্য ঃ ইসলামী বিপ্লবের পথ, সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী, পৃষ্ঠা, ২৬, ২৭

সেই ভাষণের একাংশে তিনি বলেন,

"অলৌকিকভাবে ইসলামী রাষ্ট্রের আবির্ভাব ঘটে না। ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য এমন একটি আন্দোলন উত্থিত হওয়া অপরিহার্য যার বুনিয়াদ নির্মিত হবে সেই জীবন দর্শন, সেই জীবনোদ্দেশ্য, সেই নৈতিক মানদন্ড ও সেই চারিত্রিক আদর্শের ওপর যা হবে ইসলামের প্রাণশক্তির সাথে সম্পূর্ণভাবে সামঞ্জস্যশীল। কেবল সেই সব লোকই এই আন্দোলনের নেতা ও কর্মী হবার যোগ্য যারা এই বিশেষ ছাঁচে ঢেলে নিজেদেরকে গড়ে তুলতে প্রস্তুত হবেন এবং সেই সাথে সমাজে অনুরূপ মন-মানসিকতা ও নৈতিক প্রাণশক্তির প্রসারের জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবেন।"

দ্রষ্টব্য ঃ ইসলামী বিপ্লবের পথ, সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী, পৃষ্ঠা-১৯

২২. জাহিলিয়াতের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন

১৯৪১ সনের ২৩শে ফেব্রুয়ারী পেশাওয়ার ইসলামীয়া কলেজের "মাজলিস-ই-ইসলামীয়াত" কর্তৃক আয়োজিত একটি আলোচনা সভায় সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী একটি গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ দেন।

এই ভাষণে তিনি জাহিলিয়াতের বিভিন্নরূপ অত্যন্ত পরিচ্ছন্নভাবে শ্রোতাদের সামনে তুলে ধরেন। জাহিলিয়াত ব্যক্তি মানুষ ও সমাজকে কিভাবে বিনষ্ট করে তা তিনি তুলে ধরেন তাঁর আলোচনায়। এরি পাশাপাশি ইসলামের জীবনদর্শন ও তার কল্যাণময়তা অত্যন্ত সুন্দরভাবে তিনি উপস্থাপন করেন। নিম্নে আমরা তাঁর ভাষণের সারকথাগুলো তুলে ধরার চেষ্টা করছি।

নাস্তিকতাবাদ

জাহিলিয়াতের একটি রূপ হচ্ছে নাস্তিকতাবাদ। এই মতবাদ এই ধারণা ব্যক্ত করে যে বিশ্বজাহান আপনা-আপনি তৈরি হয়েছে, আপনা-আনি শেষ হয়ে যাবে। এর কোন মালিক নেই। থাকলেও মানব জীবনের সাথে তাঁর কোন সম্পর্ক নেই। মানুষও এক প্রকার জন্তু। অন্যসব কিছুর মতো পৃথিবীতে ঘটনাক্রমে মানুষের আবির্ভাব ঘটেছে। মানুষ এই পৃথিবীতে বেঁচে থাকে ও বিচরণ করে। তার মাঝে নানা ধরনের কামনা, বাসনা ও লালসা রয়েছে। এইগুলো চরিতার্থ করার জন্য

তার মাঝে নিহিত শক্তিগুলো তাকে উত্তেজনা দেয়। তার রয়েছে অংগ-প্রত্যংগ, বিভিন্ন অস্ত্র ও সরঞ্জাম। এইগুলোর সাহায্যে সে তার কামনা-বাসনা-লালসা চরিতার্থ করতে পারে। পৃথিবীর বিস্তৃত অংগনে সে বহুবিধ উপকরণ-উপাদান দেখতে পায়। তার অংগ-প্রত্যংগ দ্বারা এইগুলো ব্যবহার করে সে তার আকাংখা পূরণ করতে পারে। চারদিকে ছড়িয়ে থাকা অফুরন্ত সামগ্রী সে ভোগ-ব্যবহার করবে– পৃথিবীতে এটাই তার কাজ। এমন কোন শক্তিধর ও কর্তৃত্বশীল সত্তা নেই যার কাছে মানুষ জওয়াবদিহি করতে বাধ্য। মানুষ স্বাধীন। কারো কাছে তার দায়বদ্ধতা নেই। পথ-নির্দেশ লাভের কোন উৎস কোথাও নেই। নিজের জন্য প্রয়োজনীয় আইন তৈরি করা, নিজের শক্তিগুলোর ব্যবহার ক্ষেত্র বাছাই করা, পৃথিবীর জীবকুল ও বস্তু-সম্ভারের সাথে তার সম্পর্ক ও কর্মনীতি নির্ধারণ করা তারই কাজ। এই সব বিষয়ে কোন পথ নির্দেশ পেতে হলে জন্তু-জানোয়ারের জীবনে, পাথর ও পাহাড়ের ইতিকথায় ও মানুষের দীর্ঘ অভিজ্ঞতার ওপরই নির্ভর করতে হবে। নিজেদের মধ্য থেকে উদ্ভূত ও সমাজে মানুষের ওপর প্রভাবশীল রাষ্ট্র-শক্তির কাছে তাকে জওয়াবদিহি করতে হবে, অন্য আর কারো কাছে নয়। পৃথিবীর জীবনই মানুষের একমাত্র জীবন। তার কাজের ফলাফল এই জীবনেই সীমাবদ্ধ। এই জীবনে প্রকাশিত ফলের ভিত্তিতে নির্ণয় করতে হবে কোন নীতি শুদ্ধ কিংবা অশুদ্ধ, ভুল কিংবা নির্ভুল, উপকারী কিংবা অনুপকারী, গ্রহণযোগ্য কিংবা বর্জনযোগ্য।

এই মতবাদ অনুসরণের ফলে মানুষ স্বেচ্ছাচারী ও দায়িত্বহীন কর্মপন্থা গ্রহণ করে। সে নিজকে নিজের দেহ ও দৈহিক শক্তিগুলোর মালিক মনে করে। নিজের ইচ্ছা মতোই এইগুলো ব্যবহার করে। পৃথিবীর যেই বস্তু তার করায়ত্ত হয় কিংবা যেই ব্যক্তির ওপর কর্তৃত্ব স্থাপিত হয় সে ঐ বস্তু বা ব্যক্তির প্রতি মালিকের আচরণই প্রদর্শন করে। প্রাকৃতিক আইন ও সমাজবদ্ধ জীবন ধারার দাবি ছাড়া আর কোন শক্তিই তার স্বাধীন অধিকার ও ক্ষমতাকে সীমাবদ্ধ করতে পারে না। তার মনে কোন নৈতিক অনুভূতি থাকে না যা তার বল্গাহীন জীবন ধারা নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। ফলে সে অত্যাচারী, বিশ্বাসঘাতক, দুর্নীতিপরায়ণ, দুষ্কর্মশীল ও ধ্বংসসাধনকারী হয়ে থাকে। সে স্বার্থপর ও সুবিধাবাদী হয়ে থাকে। প্রবৃত্তির কামনা-বাসনা পূর্ণ করা ছাড়া তার জীবনের আর কোন উদ্দেশ্য থাকে না। যেই সব জিনিস তার জীবনের এই উদ্দেশ্য পূরণের সহায়ক, তার দৃষ্টিতে তা-ই মূল্যবান ও গ্রহণযোগ্য।

'এই মনোভংগি সম্পন্ন লোকদের সমন্বয়ে গঠিত সমাজের রাজনীতি মানব-

প্রভুত্বের ওপর স্থাপিত হয়। তা এক ব্যক্তি, এক পরিবার, বিশেষ শ্রেণী কিংবা জনগণের প্রভুত্বও হতে পারে। সকল অবস্থাতেই আইন-প্রণেতা হয় মানুষ। সবচে' বেশি ধূর্ত, শঠ, কপট, প্রতারক, মিথ্যাবাদী, শক্তিশালী ও পাপিষ্ঠ লোকই রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব ও আধিপত্য লাভ করতে পারে। তাদের বিধান-গ্রন্থে শক্তির নামই সত্য। আর দুর্বলতা গণ্য হয় বাতিল বলে। এই সমাজে শিল্প-সাহিত্যে নগ্নতা ও পশুত্বের ভাবধারা ক্রমশ প্রবল হতে থাকে। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে কখনো সামন্তবাদ কখনো পুঁজিবাদ আবার কখনো সর্বহারাদের একনায়কত্ব কায়েম হয়। এই সমাজে সুবিচারপূর্ণ অর্থ-ব্যবস্থা গড়ে তোলা আদৌ সম্ভব নয়। এই সমাজের প্রতিটি মানুষই তো মনে করে যে, পৃথিবী একটি লুণ্ঠন ক্ষেত্র। কাজেই যে যেইভাবে পারে সম্পদ কুক্ষিগত করে। এই সমাজের শিক্ষা ব্যবস্থাও এই বস্তুবাদী দৃষ্টিভংগির ওপর ভিত্তি করেই গড়ে উঠে। জ্ঞান-বিজ্ঞানের সকল শাখাকে এমনভাবে ব্যবহার করা হয় যাতে মানুষের মন-মগজে উপরোল্লেখিত চিন্তাধারা বদ্ধমূল হয়ে যায়।

অংশীবাদ

জাহিলিয়াতের আরেকটি রূপ হচ্ছে অংশীবাদ বা শিরক। এই মতবাদ এই ধারণা ব্যক্ত করে যে বিশ্ব-জাহান বহু সংখ্যক দেব-দেবী দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে। বিশ্ব-জাহানের বিভিন্ন শক্তি বিভিন্ন দেব-দেবীর হাতে নিবদ্ধ। কোন কোন মুশরিক জাতি তাদের উপাস্যদেরকে এমনভাবে সাজিয়ে নেয় যে, একজন প্রধান দেবতা আছে, আর এই প্রধান দেবতা বহু অ-প্রধান দেবতা দ্বারা পরিবেষ্টিত। অ-প্রধান দেবতাদেরকে সন্তুষ্ট করেই প্রধান দেবতাকে সন্তুষ্ট করা সম্ভব। এই মতবাদের অনুসারীরা বিশিষ্ট জীবিত ব্যক্তি, বিশিষ্ট মৃত ব্যক্তি, পাহাড়-পর্বত, গাছপালা, নদী-নালা, সাগর-মহাসাগর, আগুন, গ্রহ, নক্ষত্র প্রভৃতিকে উপাস্য বানিয়ে নেয়। যুগে যুগে আবির্ভূত নবী-রাসূলদের শিক্ষার প্রভাবে মানুষ এক আল্লাহর স্বীকৃতি দিয়েছে। কিন্তু কালক্রমে মানুষ ঐ নেক বান্দাদের প্রতি এমন আচরণ শুরু করে যার ফলে তাঁরা মুশরিক ব্যক্তিদের অ-প্রধান দেবতার মর্যাদা পেতে থাকেন।

এই মতবাদের অনুসারী মানুষের জীবন অবাস্তব আন্দাজ-অনুমানের ভিত্তিতে পরিচালিত হয়। তারা বহু কিছুকে অলৌকিক শক্তি-সম্পন্ন মনে করে ও মানুষের ভাগ্যের ওপর ভালো কিংবা মন্দ প্রভাব ফেলতে সক্ষম মনে করে। মুশরিকী কু-সংস্কারে আচ্ছন্ন ব্যক্তিদেরকে ধূর্ত কিছু লোক প্রতারণার জালে আবদ্ধ করে অর্থ লুণ্ঠনের ব্যবস্থা করে। কেউ নিজেই রাজা-বাদশাহ হয়ে বসে, কেউ বা সূর্য, চন্দ্র বা কোন কল্পিত দেবতার সাথে বংশ-সম্পর্ক দেখিয়ে লোকদের মনে এই ধারণা

সৃষ্টি করে যে এরাও দেবতা, আর লোকেরা তাদের দাস। কেউ বা পুরোহিত সেজে বসে ও দাবি করে যে যাদের হাতে উপকার-অপকারের চাবিকাঠি তাদের সাথে এদের নিকট-সম্পর্ক বিদ্যমান। এইসব কাল্পনিক দেবতাদের কাছ থেকে মানুষ অনুসরণযোগ্য কোন জীবন ব্যবস্থা লাভ করতে পারে না। মানুষ এই কাল্পনিক দেবতাদের অনুগ্রহ ও সাহায্য লাভের আশায় তাদের পূজা-অর্চনায় নিয়োজিত থাকে। কিন্তু জীবনের বৃহৎ ও বিশাল অংগনে বাস্তব কাজকর্মের ব্যাপারে প্রয়োজনীয় আইন-কানুন তৈরি করা মানুষের নিজেদেরই হাতে থাকে। রাজনীতি, অর্থনীতি, শিল্প-সাহিত্য, শিক্ষা-নীতি ইত্যাদি ক্ষেত্রে এই মতবাদের অনুসারীদের আচরণ নাস্তিকতাবাদের অনুসারীদের আচরণের অনুরূপই হয়ে থাকে।

সর্বেশ্বরবাদ

জাহিলিয়াতের আরো একটি রূপ হচ্ছে সর্বেশ্বরবাদ। এই মতবাদ এই ধারণা ব্যক্ত করে যে মানুষ ও বিশ্ব-জাহানের সব কিছুই অ-প্রকৃত। এইগুলোর আদৌ কোন স্বতন্ত্র সত্তা নেই। একই সত্তা এই বিশ্ব-জাহানকে আত্মপ্রকাশের মাধ্যম বানিয়েছে এবং সেই সত্তাই সব কিছুতেই স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রকাশমান।

এই মতবাদের ফলে মানুষের মনে সৃষ্টি হয় সংশয়বাদ। নিজের অস্তিত্ব সম্পর্কেই সে সন্দেহের গোলক ধাঁধায় পড়ে যায়। সে নিজকে এমন পুতুল মনে করে যাকে অন্য কেউ আড়ালে বসে নাচাচ্ছে। চিন্তার এমন আবর্তে পতিত মানুষ জীবনের কোন উদ্দেশ্যই খুঁজে পায় না। সে মনে করে যে তার কিছুই করার নেই। সার্বিক সত্তা যেই দিকে যাচ্ছে সেও সেই দিকেই যাচ্ছে।

এই মতবাদের বিশ্বাসীদেরকেও প্রবৃত্তির দাসত্ব করতেই দেখা যায়। প্রবৃত্তি তাদেরকে যেই দিকে চালিত করে তারা সেই দিকেই ছুটে চলে।

বৈরাগ্যবাদ

জাহিলিয়াতের ভিন্ন একটি রূপ হচ্ছে রাহবানিয়াত বা বৈরাগ্যবাদ।

এই মতবাদ এই ধারণা ব্যক্ত করে যে মানুষের জন্য এই পৃথিবী হচ্ছে একটি শাস্তি ভোগের স্থান। এখানে মানুষের অবস্থান দণ্ড-প্রাপ্ত কয়েদীর মতো। কামনা-বাসনা, আমোদ-আহলাদ, দৈহিক আরাম ও দেহের দাবি হচ্ছে এই কারাগারের বেড়ি ও শিকল। মানুষ এই পৃথিবীর বস্তুগুলোর সাথে যতো বেশি জড়িত হবে ততো বেশি আবর্জনা দ্বারা পরিবেষ্টিত হবে। মানুষের মুক্তির পথ যাবতীয় আমোদ-আহলাদ থেকে মুক্ত হওয়া, কামনা-বাসনা দমন করা ও দেহের চাহিদাগুলোকে তপস্যা-সাধনার মাধ্যমে পীড়ন করা। এই পীড়নের ফলে আত্মা পবিত্র হয়।

বৈরাগ্যবাদে বিশ্বাসী ব্যক্তিরা দুনিয়ার ঝামেলা থেকে দূরে সরে থেকে অসৎ ব্যক্তিদের জন্য পথ উন্মুক্ত করে দেয়। বৈরাগ্যবাদী সৎ লোকেরা তপস্যা-সাধনায় আত্মনিয়োগ করে, আর অসৎ লোকেরা দুনিয়ার কর্তৃত্ব হাতে নিয়ে ফিতনা-ফাসাদের বিস্তৃতি ঘটায়। বৈরাগ্যবাদের প্রভাবে মানুষ নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে। সমাজনীতি, রাজনীতি ইত্যাদি নিয়ে তারা মাথা ঘামায় না। আর সেই জন্যই অসৎ শাসকদেরকে জোরে সোরে বৈরাগ্যবাদী জীবন দর্শনের পৃষ্ঠপোষকতা করতে দেখা যায়। প্রকৃত পক্ষে এই মতবাদ জনগণকে যালিম ব্যক্তিদের প্রতি বিনয়াবনত ও পোষমানা বানাবার জন্য যাদুর মতো কাজ করে। কখনো কখনো দেখা যায় দুনিয়া ত্যাগের আবরণে বৈরাগ্যবাদীরা দারুণ দুনিয়া পূজারী হয়ে উঠে।

ইসলাম

পরিশেষে সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী ইসলামের জীবন দর্শন ও তার অনুসৃতির সুফলের ওপর আলোকপাত করেন।

ইসলাম এই ধারণা ব্যক্ত করে যে বিশ্বজাহান এক ও অদ্বিতীয় আল্লাহর সাম্রাজ্য। তিনি এটি সৃষ্টি করেছেন। তিনিই এটি পরিচালনা করছেন। সমস্ত ক্ষমতা তাঁর হাতে কেন্দ্রিভূত। মানুষ এই সম্রাটের প্রজা। এই সাম্রাজ্যের অংশ হওয়ার কারণে সাম্রাজ্যের অন্যান্য অংশ যেইভাবে সম্রাটের আনুগত্য করে চলছে মানুষের কর্তব্য সেইভাবে তাঁর আনুগত্য করে চলা। মানুষ নিজের জন্য জীবন বিধান তৈরি করার ও নিজের কর্তব্য নিজেই স্থির করার অধিকার রাখে না। তার কাজ হচ্ছে "আল মালিকুল মুলকের" নির্দেশ পালন করা।

দুনিয়ার জীবন মানুষের পরীক্ষাগার। সম্রাট নিজে প্রচ্ছন্ন হয়ে আছেন। কারণ, আল্লাহ মানুষকে যেই জ্ঞান বুদ্ধি ও স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি দান করেছেন এবং অগণিত সৃষ্টির ওপর কর্তৃত্ব করার ইখতিয়ার দিয়েছেন, এর মাধ্যমে তিনি মানুষকে পরীক্ষা করছেন।

পৃথিবীর জীবন পরীক্ষাকাল। তাই এখানে হিসাব নেই, শাস্তি নেই, পুরস্কার নেই। হিসাব, শাস্তি কিংবা পুরস্কারের জন্য যেই সময়টি নির্দিষ্ট তার নাম আখিরাত।

যুগে যুগে নবী-রাসূলগণ মানুষের মনোমাঝে এই চিন্তা-চেতনারই বিকাশ ঘটাতে চেয়েছেন।

কোন একটি ভূখন্ডের মানুষ যখন এই মতবাদ গ্রহণ করে তখনই তার প্রতিফলন ঘটে তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক, লেনদেন, শিক্ষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি, অর্থনীতি, রাজনীতি– তথা জীবনের সকল দিক ও বিভাগে। পবিত্রতা, পোষাক-পরিচ্ছদ,

খাদ্য, জীবন যাপন পদ্ধতি, সামাজিক রীতিনীতি, ব্যক্তিগত চরিত্র, জীবিকা উপার্জন, অর্থব্যয়, অর্থ বন্টন, দাম্পত্য জীবন, পারিবারিক জীবন, বৈঠকী নিয়ম-কানুন, সরকার গঠন, বিচার, অপরাধ দমন, কর ধার্য, জনকল্যাণমূলক কাজ, শিল্প-বাণিজ্য, শিক্ষাব্যবস্থা, সেনাবাহিনী গঠন, যুদ্ধ-পরিচালনা, সন্ধি স্থাপন-সব কিছুতেই বিকশিত হয় এই বিশেষ দৃষ্টিভংগি।

এই মতবাদ মানুষের জীবনকে দায়িত্ব-জ্ঞান-সম্পন্ন ও সৃশৃংখল করে তোলে। এই মতবাদে বিশ্বাসী মানুষ মনে করে যে তার দেহ, তার সকল শক্তি সামর্থ ও চারদিকে ছড়িয়ে থাকা সম্পদ সম্ভারের মালিক সে নয়। এই সব কিছুর মালিক আল্লাহ। এইগুলো মালিকের পক্ষ থেকে তার নিকট আমানাত হিসেবে রাখা হয়েছে। এই আমানাতের হিসাব একদিন তাকে অবশ্যই আল্লাহর নিকট দিতে হবে। এই ধারণা মানুষকে বলগাহীন জীবন যাপন করতে দেয় না। তাঁকে প্রবৃত্তির দাস হতে দেয় না। সে অত্যাচারী ও বিশ্বাসঘাতক হতে পারে না। সে হয় একজন নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি।

এই মতবাদ মানুষকে সংগ্রামী ও অবিশ্রান্ত চেষ্টানুবর্তী করে তোলে। তাকে স্বার্তপরতা, আত্মপূজা ও জাতি পূজার পংকিলতা থেকে পবিত্র করে। তাকে সততা, সত্যনিষ্ঠা, উন্নত নৈতিক আদর্শের পথে সংশ্লিষ্ট রাখে। এই মতবাদ অনুযায়ী সকল মানুষ আল্লাহর প্রজা। সকলের মর্যাদা, অধিকার ও সুযোগ সুবিধা লাভের সম্ভাবনা সমান। কোন ব্যক্তি, পরিবার, শ্রেণী বা জাতির অন্যান্য মানুষের ওপর কোন আভিজাত্য নেই, শ্রেষ্ঠত্ব নেই। এইভাবে এই মতবাদ মানব-প্রভুত্বের ধারণার মূলোচ্ছেদ করে। এই মতবাদ আঞ্চলিক ও বর্ণভিত্তিক বৈষম্য বিদ্বেষেরও মূল্যোৎপাটন করে। এই মতবাদের দৃষ্টিতে "পৃথিবীর মালিক আল্লাহ। সকল মানুষ আদমের সন্তান। সকলেই একমাত্র আল্লাহর বান্দা। এই মতবাদের দৃষ্টিতে শ্রেষ্ঠত্বের মাপকাঠি আল্লাহভীতি, সততা, ন্যায়পরায়ণতা ও সত্যের জন্য সংগ্রামশীলতা। এই মতবাদের দৃষ্টিতে যারা মানব রচিত বিধান প্রত্যাখ্যান করে একমাত্র আল্লাহ-প্রদত্ত বিধানের আনুগত্য করে তারা সকলে মিলে একটি দল আর যারা তা করে না তারা ভিন্ন দল। পার্থক্যের এই একটিমাত্র ভিত্তি ছাড়া আর সব ভিত্তিই পরিত্যাজ্য।

এই মতবাদের ভিত্তিতে যেই রাষ্ট্র গড়ে উঠে সেই রাষ্ট্রের বুনিয়াদ হয় আল্লাহর সার্বভৌমত্ব। এই রাষ্ট্রে আল্লাহর শাসন কায়েম হয়, আল্লাহর আইন চালু হয়। এই রাষ্ট্রে মানুষ আল্লাহর খালীফা বা প্রতিনিধি রূপে কাজ করে। এই রাষ্ট্রের গোটা ব্যবস্থাই ইবাদাত ও তাকওয়ার পবিত্র ভাবধারায় পরিপর্ণ হয়। শাসক ও শাসিত

উভয়েই সমানভাবে অনুভব করে যে তারা আল্লাহর হুকুমাতের অধীনে জীবন যাপন করছে এবং তাদের গোপন ও প্রকাশ্য সব কিছু আল্লাহর সাথেই সম্পর্কিত। এই রাষ্ট্রের কর দাতা মনে করে যে সে আল্লাহকেই কর দিচ্ছে। করগ্রহিতা মনে করে যে সে আমানাতদার মাত্র। একজন সিপাই থেকে শুরু করে বিচারপতি কিংবা শাসক পর্যন্ত সকলেই ঠিক সেই মনোভাব নিয়ে কর্তব্য পালন করে যেই মনোভাব নিয়ে তারা ছালাত আদায় করে থাকে। এই উভয় প্রকার কাজকেই তারা ইবাদাত মনে করে। এই রাষ্ট্রে গণ-প্রতিনিধি নির্বাচনের সময় অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে তাদের তাকওয়া, আমানাতদারী, সততা, সত্যবাদিতা ও অন্যান্য মহৎগুণ সন্ধান করা হয়। ফলে উন্নত নৈতিক চরিত্র সম্পন্ন ব্যক্তিরাই নেতৃত্ব লাভ করেন ও দায়িত্বপূর্ণ পদে অভিষিক্ত হন।

(দ্রষ্টব্য ঃ ইসলাম ও জাহিলিয়াত, সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী)

২৩. জামায়াতে ইসলামী গঠন

সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী একটি সত্যনিষ্ঠ সংগঠন গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তা তীব্রভাবে অনুভব করেন। মাসিক তারজুমানুল কুরআনের মাধ্যমে তিনি এই মর্মে একটি আবেদন পেশ করেন। যাঁরা মহানবীর (সা) অনুকরণে একটি সংগঠন গড়ে তুলতে আগ্রহী তিনি তাঁদেরকে ইসলামীয়া পার্কে অবস্থিত "তারজুমানুল কুরআনের" অফিসে সমবেত হওয়ার আহ্বান জানান।

১৯৪১ সনের ছাব্বিশে অগাস্ট পঁচাত্তর জন ব্যক্তি সমন্বয়ে গঠিত হয় জামায়াতে ইসলামী। সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী নব গঠিত সংগঠনের একটি খসড়া সংবিধান পেশ করেন। সম্মেলন উক্ত সংবিধান অনুমোদন করে। অতপর সেই সংবিধান অনুযায়ী আমীর নির্বাচনের পদক্ষেপ নেয়া হয়। সর্ব সম্মতিক্রমে সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী জামায়াতে ইসলামীর আমীর নির্বাচিত হন।

এই সম্মেলনের এক পর্যায়ে তিনি যেই বক্তব্য রাখেন তা ছিলো অসাধারণ। বক্তব্যের একাংশে তিনি বলেন,

"জামায়াতে ইসলামীতে যাঁরা যোগদান করবেন তাঁদেরকে এই কথা ভালোভাবে বুঝে নিতে হবে যে জামায়াতে ইসলামীর সামনে যেই কাজ রয়েছে তা কোন সাধারণ কাজ নয়। দুনিয়ার গোটা ব্যবস্থা তাঁদেরকে পাল্টে দিতে হবে। দুনিয়ার নীতি নৈতিকতা, রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতি, সভ্যতা-সংস্কৃতি প্রতিটি কিছু পরিবর্তন করে দিতে হবে। দুনিয়ায় আল্লাহ-দ্রোহিতার ওপর যেই ব্যবস্থা কায়েম রয়েছে তা বদলিয়ে আল্লাহর আনুগত্যের ওপর কায়েম করতে হবে। সকল

শাইতানী শক্তির বিরুদ্ধে তাঁদের সংগ্রাম।... প্রতিটি পদক্ষেপের পূর্বে তাঁদেরকে ভালোভাবে বুঝে নিতে হবে তাঁরা কোন কঠিন পথে পা বাড়াচ্ছেন।"

উল্লেখ্য যে তখন গোটা উপ-মহাদেশের জনসংখ্যা প্রায় চল্লিশ কোটি। ত্রিশ কোটি ছিলো অ-মুসলিম। মুসলিমদের সংখ্যা ছিলো দশ কোটি। এদের বিরাট অংশ ছিলো নামকাওয়াস্তে মুসলিম। সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদীর আহ্বানে সাড়া দিয়ে সংগঠিত হয়েছিলেন মাত্র পঁচাত্তর জন লোক। তাঁদের সামনে দাঁড়িয়ে তিনি ঘোষণা দিলেন, "দুনিয়ার গোটা ব্যবস্থা তাঁদেরকে পাল্টে দিতে হবে।"

স্থূল দৃষ্টিসম্পন্ন লোকদের কেউ কেউ হয়তো তাঁকে বদ্ধ পাগলই মনে করেছিলেন। কিন্তু সূক্ষ্মদর্শী ও দূরদর্শী সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী ভালো করেই জানতেন যে সকল বিপ্লবের গোড়াতে প্রথমে তো থাকেন একজন মাত্র মানুষ। আর সেই মানুষটিকে কেন্দ্র করেই কালক্রমে গড়ে উঠে বিশাল কাফিলা।

২৪. তাফসীর-তাফহীমুল কুরআন লেখা শুরু

১৯৪২ সনের ফেব্রুয়ারী মাসে সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (রহ.) লাহোরে অবস্থানকালেই তাঁর অনবদ্য তাফসীর তাফহীমুল কুরআন লেখার কাজ শুরু করেন।

২৫. জামালপুরে কেন্দ্রীয় অফিস স্থানান্তর

সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী শহরের কোলাহলমুক্ত এমন একটি স্থানে জামায়াতে ইসলামীর অফিস স্থানান্তরের কথা ভাবছিলেন যেখানে শান্ত মনে গবেষণা কাজ করা যায় এবং ইসলামের আলোকে একটি জনপদও গড়ে তোলা যায় যা অন্য সব জনপদের জন্য হবে একটি মডেল। এই খবর জানতে পেরে চৌধুরী নিয়ায আলী জামালপুরের দারুল ইসলাম ট্রাস্টেই জামায়াতে ইসলামীর অফিস স্থানান্তরের প্রস্তাব দেন। বিষয়টি জামায়াতে ইসলামীর মাজলিসে শূরায় আলোচিত হয় এবং চৌধুরী সাহেবের প্রস্তাব সাদরে গৃহীত হয়।

১৯৪২ সনের জুন মাসে জামালপুরে জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় অফিস স্থানান্তরিত হয়। প্রায় চার বছর পর সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী আবার জামালপুর আসেন। এই সময় জামায়াতে ইসলামী দাওয়াত পৌছানো, শাখা বাড়ানো ও জনশক্তির মান বাড়ানোর জন্য ব্যাপক তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছিলো। বিভিন্ন স্থানে আঞ্চলিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হতে থাকে। সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী এই সব সম্মেলনে জ্ঞানগর্ভ ভাষণ দিয়ে জনশক্তিকে দিক-নির্দেশনা দিতে থাকেন।

২৬. প্রথম কেন্দ্রীয় সম্মেলন

১৯৪৫ সনের ১৯, ২০ ও ২১শে এপ্রিল জামালপুরের দারুল ইসলামে জামায়াতে ইসলামীর প্রথম কেন্দ্রীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। গোটা উপ-মহাদেশ থেকে আগত আট শতাধিক ডেলিগেট উপস্থিত ছিলেন এই সম্মেলনে।

সম্মেলনের উদ্বোধনী ভাষণে সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী "ইসলামী দাওয়াত ও কর্মনীতির" ওপর আলোকপাত করেন। ভাষণের একাংশে তিনি বলেন,

- "আমরা সাধারণত সকল মানুষকে বিশেষ করে মুসলিমদেরকে আল্লাহর দাসত্ব গ্রহণ করার আহ্বান জানাই।"
- "যাঁরা ইসলাম গ্রহণ করার কিংবা ইসলাম মেনে চলার কথা বলেন আমরা তাঁদের সকলকে বৈসাদৃশ্য দূর করে ইসলামের পূর্ণ অনুসারী হবার আহ্বান জানাই।"
- "আমরা তাঁদেরকে আল্লাহদ্রোহী নেতৃত্বের অবসান ঘটিয়ে সমাজ ও রাষ্ট্রের নেতৃত্ব-কর্তৃত্ব আল্লাহভীরু লোকদের হাতে সুপর্দ করার আহ্বান জানাই।"

দ্রষ্টব্য ঃ ইসলামী দাওয়াত ও কর্মনীতি, সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী, পৃষ্ঠা- ৬

কর্মনীতি সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে তিনি বলেন,

"যাঁরা আমাদের দাওয়াত কবুল করেন আমরা তাঁদেরকে কার্যত আল্লাহর প্রতি আনুগত্যশীল জীবন গড়ে তুলতে এবং এই কাজে নিষ্ঠা ও একাগ্রতার প্রমাণ পেশ করতে বলি।

ঈমানের বিপরীত সকল কাজ থেকে তাঁদের জীবনকে পবিত্র করতে বলি। এখান থেকেই তাঁদের চারিত্রিক বিশুদ্ধির কাজ ও এর যাচাই শুরু হয়ে যায়। যাঁরা উচ্চ লক্ষ্য সামনে রেখে উচ্চ শিক্ষা লাভ করেছেন তাঁদেরকে নিজেদের রচিত স্বপ্ন-প্রাসাদ নিজের হাতেই ধূলিসাৎ করে দিতে হয় এবং এমন এক জীবন ক্ষেত্রে নামতে হয় যাতে সম্মান, পদমর্যাদা, আর্থিক স্বাচ্ছন্দের সম্ভাবনা কেবল নিজেদের জীবনেই নয় পরবর্তী কয়েক পুরুষ পর্যন্ত পরিলক্ষিত হয় না। আর যাঁদের আর্থিক সচ্ছলতা, লুণ্ঠিত সম্পদ, অংশীদারদের অপহৃত অংশ ও উত্তরাধিকারীদের হক নষ্ট করা সম্পত্তির ওপর স্থাপিত, এই আন্দোলনে যোগদানের ফলে সেই সব ত্যাগ করে তাঁদেরকে সর্বহারা সাজতে হয়। কারণ, তাঁরা যেই আল্লাহকে নিজেদের মালিক ও মনিব হিসেবে মেনে নিয়েছেন তিনি কারো সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রহণ করা পছন্দ করেন না।... কার্যত এই আদর্শ গ্রহণ করলে প্রত্যেক ব্যক্তির আপনজন তাঁর দুশমন হয়ে পড়ে। তাঁর আব্বা-আম্মা, ভাই-বন্ধু, স্ত্রী-সন্তান ও

অন্যান্য নিকটাত্মীয়রাই সর্ব প্রথম তাঁর ঈমানের সাথে দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়। এই আদর্শ গ্রহণ করার সংগে সংগে বহু লোকের শান্তিপূর্ণ ও স্নেহময় নীড় বোলতার বাসায় পরিণত হয়। প্রকৃতপক্ষে ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের এটিই সর্ব প্রথম ট্রেনিং সেন্টার।... এই প্রাথমিক পরীক্ষায় যাঁরা ব্যর্থ হন আন্দোলন ও সংগঠন থেকে তাঁরা আপনা আপনি ঝরে পড়েন। যাঁরা এতে সাফল্য অর্জন করেন তাঁরা নিজেদের নিষ্ঠা, একাগ্রতা, ধৈর্য, সহিষ্ণুতা, দৃঢ় সংকল্প, সত্য প্রীতি ও মজবুত স্বভাব-প্রকৃতির অস্তিত্ব প্রমাণ করেন যা আল্লাহর পথে প্রাথমিক পদক্ষেপ ও পরীক্ষার প্রথম অধ্যায় অতিক্রম করার জন্য একান্ত অপরিহার্য।"

দ্রষ্টব্য ঃ ইসলামী দাওয়াত ও কর্মনীতি, সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী, পৃষ্ঠা- ২১ ও ২২।

"দ্বিতীয়ত জামায়াতে ইসলামীর সদস্যদের ওপর আদর্শ প্রচারের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। যেই সত্যের আলো তাঁরা লাভ করেছেন তা তাঁদের সন্নিকটবর্তী সকল মানুষের মধ্যে বিকীর্ণ করা তাঁদের অন্যতম প্রধান কর্তব্য।... এখানে আবার নতুন পরীক্ষা শুরু হয়। এই প্রচারমূলক কাজের চাপে প্রচারকের নিজের জীবনই সংশোধিত হতে থাকে। কারণ এই কাজ শুরু করলে অসংখ্য দূরবীণ ও সার্চ লাইট তাঁর জীবন ও চরিত্রের দিকে উত্তোলিত হয়। ফলে প্রচারকের জীবনে ঈমান বিরোধী সামান্য কিছু থাকলেও এই বিনা পয়সার সংশোধন প্রচেষ্টার মাধ্যমে তাঁর নিজের নিকট তা স্পষ্ট হয়ে উঠে ও অনবরত চাবুক লাগিয়ে তাঁর জীবনকে নির্মল করে তোলে।

প্রচারক যদি আসলেই ঐকান্তিক নিষ্ঠার সাথে ঈমান এনে থাকেন, তাহলে এই সমালোচনায় মোটেই ক্ষিপ্ত হবেন না ও গোঁজামিল দিয়ে নিজের ভুল গোপন করার চেষ্টা করবেন না। বরং লোকদের এই সমালোচনার আলোকে নিজেকে পরিশুদ্ধ করতে চেষ্টিত হবেন।"

দ্রষ্টব্য ঃ ইসলামী দাওয়াত ও কর্মনীতি, সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী, পৃষ্ঠা ২২ ও ২৩।

"আদর্শ প্রচারের ক্ষেত্রে আমরা কর্মীদেরকে আল কুরআনে উপস্থাপিত কর্মনীতিই শিক্ষা দিতে চেষ্টা করেছি। অর্থাৎ যুক্তি, জ্ঞান-বুদ্ধি ও সুন্দর উপদেশের মাধ্যমে লোকদেরকে আল্লাহর পথে আহ্বান জানানো। ক্রমধারা অনুসরণ করে অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবে লোকদেরকে দীন ইসলামের বুনিয়াদী নীতিগুলো ভিত্তি করে জীবন গড়ে তুলতে উদ্বুদ্ধ করা। কাউকে সাধ্যাতীত খোরাক দান, মৌলিক বিষয়ের পূর্বে খুঁটিনাটি বিষয় পেশ করা, মৌলিক ত্রুটি দূর করার পরিবর্তে বাহ্যিক ত্রুটি দূর করার চেষ্টা করে সময় নষ্ট করার মতো অবৈজ্ঞানিক কাজ করতে কর্মীদেরকে নিষেধ করা হয়। বিভ্রান্ত লোকদের প্রতি ঘৃণা ও অবজ্ঞা মিশ্রিত আচরণ না করে

সুদক্ষ ডাক্তারের মতো সহানুভূতি ও কল্যাণ কামনাসহ তাদের প্রকৃত রোগের চিকিৎসা করার চেষ্টা চালানোই আমাদের কাজ। ভর্ৎসনা ও পাথর নিক্ষেপের উত্তরে কল্যাণকর কাজ করতে শেখা, যুল্‌ম-নির্যাতনের মুখে ছবর অবলম্বন করা, যারা অজ্ঞতাবশতঃ কুতর্ক করে তাদের সাথে বিবাদে লিপ্ত না হওয়া, নিরর্থক কথাবার্তাকে মহান ব্যক্তির মতো উপেক্ষা করা আমাদের কর্মীদের বৈশিষ্ট। সত্য থেকে যারা দূরেই থাকতে চায় তাদের পেছনে লেগে থাকার চেয়ে সত্য-সন্ধানী ব্যক্তিদের দিকে বেশী মনোযোগ দেয়া কর্তব্য।"

দ্রষ্টব্য ঃ ইসলামী দাওয়াত ও কর্মনীতি, সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী, পৃষ্ঠা ২৪

"সকল কাজ একমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যে করা এবং প্রতিদান একমাত্র আল্লাহর কাছে পাওয়ার আশা করা আমাদের কর্মীদের কর্তব্য। তাঁদের মনে এই ধারণা জাগ্রত থাকা দরকার যে আল্লাহ তাঁদের সকল কাজ দেখছেন এবং তিনি তাঁদের কাজের মূল্য অবশ্যই দেবেন। দুনিয়ার মানুষ এর মূল্য বুঝুক আর না বুঝুক, মানুষ কোন সুফল দিক আর না দিক তাতে কিছু যায় আসে না। আর এমন কর্মনীতিতে অসাধারণ ধৈর্য সহিষ্ণুতা ও অবিশ্রান্ত চেষ্টা-সাধনার প্রয়োজন।'

দ্রষ্টব্য ঃ ইসলামী দাওয়াত ও কর্মনীতি, সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী, পৃষ্ঠা ২৫

"অনেক লোকের মধ্যে একটি তীব্র গতিশীল কর্মনীতি গ্রহণ করে অবিলম্বে বিরাট কিছু করে দেখাবার আকাঙ্খা দেখা যায়। প্রকৃত পক্ষে এটি চিন্তাহীন কর্মের প্রাচীন রোগ ছাড়া আর কিছুই নয়।"

দ্রষ্টব্য ঃ ইসলামী দাওয়াত ও কর্মনীতি, সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী, পৃষ্ঠা ৩৬

"আমাদের কর্মনীতি যে অত্যন্ত ধৈর্য সাপেক্ষ, মন্থর এবং অচিরেই তাতে কোন অনুভবযোগ্য ফল লাভের আশা করা যায় না- বরং তাতে দীর্ঘকাল পর্যন্ত অবিশ্রান্তভাবে সাধনা করে যেতে হয়- এতে একটুও সন্দেহ নেই।"

দ্রষ্টব্য ঃ ইসলামী দাওয়াত ও কর্মনীতি, সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী, পৃষ্ঠা ৩৭

২১ এপ্রিল সমাপ্ত হয় জামায়াতে ইসলামীর এই কেন্দ্রীয় সম্মেলন। সমাপ্তি ভাষণে সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী নেতৃত্বের গুরুত্ব, মৌলিক মানবীয় গুণ ও ইসলামী নৈতিকতা সম্পর্কে বিশদভাবে আলোচনা করেন। ভাষণের একাংশে তিনি বলেন, "একটি গাড়ি সেই দিকেই ছুটে চলে যেই দিকে ড্রাইভার এটিকে চালিয়ে নেয়। গাড়ির আরোহীরা ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক সেই দিকেই ভ্রমণ করতে বাধ্য হয়। অনুরূপভাবে মানব সমাজের গাড়িও সেই দিকেই চলতে থাকে যেই দিকে সমাজের নেতারা ও কর্তৃত্বশীল লোকেরা তাকে নিয়ে যায়।"

"পৃথিবীর যাবতীয় উপায় উপকরণ যাদের নিয়ন্ত্রণে থাকে, ক্ষমতা-ইখতিয়ারের চাবি-কাঠি যাদের হাতে থাকে, জনগণের জীবনধারা যাদের নিয়ন্ত্রণে থাকে, চিন্তাধারা, মতবাদ ও আদর্শ বাস্তবায়নের জন্য অপরিহার্য উপায়-উপাদান যাদের হাতে থাকে, ব্যক্তিগত স্বভাব-চরিত্র পুনর্গঠন এবং সমষ্টিগত নীতি-ব্যবস্থার বাস্তবায়ন ও নৈতিক মূল্যবোধ নির্ধারণের ক্ষমতা যাদের থাকে, তাদের অধীনে জীবন যাপনকারী মানুষেরা সমষ্টিগতভাবে তাদের বিপরীত দিকে কিছুতেই চলতে পারে না। এই নেতৃবৃন্দ ও কর্তৃত্বশীল লোকেরা যদি আল্লাহর প্রতি আনুগত্যশীল, সৎ ও সত্যাশ্রয়ী হয় তাহলে সেই সমাজের লোকদের জীবনের সব কিছুই আল্লাহ ভীতি ও সার্বিক কল্যাণের উপর গড়ে উঠে। অসৎ ও পাপী লোকেরাও সেই সমাজে সৎ ও পুণ্যবান হতে বাধ্য হয়। সৎ ব্যবস্থা ও কল্যাণকর রীতিনীতি ও আচার অনুষ্ঠান বিকশিত হয়। পাপ ও অন্যায় নিঃশেষ হয়ে না গেলেও অন্তত বিকশিত হতে পারে না। পক্ষান্তরে নেতৃত্ব-কর্তৃত্ব এবং সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা যদি আল্লাহদ্রোহী, ফাসিক ও পাপী লোকদের হাতে থাকে, তাহলে গোটা ব্যবস্থা আল্লাহদ্রোহিতা, যুল্‌ম-নির্যাতন, অন্যায়-অনাচার ও অসচ্চরিত্রতার পথে চলতে থাকে। চিন্তাধারা, জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্প-সাহিত্য, রাজনীতি, অর্থনীতি, সভ্যতা-সংস্কৃতি, সামাজিক রীতিনীতি, আচার-অনুষ্ঠান, পারস্পরিক সম্পর্ক, আইন-বিচার-তথা সব কিছুই বিপর্যস্ত হয়। পাপ ও অন্যায় ফুলে-ফলে সুশোভিত হয়। সত্য, ন্যায় ও কল্যাণ বিদায় নেয়। আল্লাহর এই যমীন যুল্‌ম-নির্যাতন ও শোষণের সয়লাব স্রোতে কানায় কানায় ভরে উঠে। এমন পরিবেশে অন্যায়ের পথে চলা হয় সহজ, সত্য ও ন্যায়ের পথে শুধু চলা নয় দাঁড়িয়ে থাকাও হয় অত্যন্ত কঠিন।"

এই ভাষণের আরেক অংশে সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী মৌলিক মানবীয় গুণ সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন,

"ঈমানদার, কাফির, নেক্কার, বদকার, কুসংস্কারাচ্ছন্ন কিংবা বিপর্যয় সৃষ্টিকারী যে যাই হোক না কেন তার মধ্যে যদি ইচ্ছাশক্তি, সিদ্ধান্ত গ্রহণ শক্তি, প্রবল বাসনা, উচ্চ আশা, নির্ভীকতা, বীরত্ব, দৃঢ়তা, ত্যাগ-তিতিক্ষা, সহিষ্ণুতা, সহনশীলতা, পরিশ্রম প্রিয়তা, লক্ষ্য অর্জনের জন্য সব কিছু কুরবানী করার মনোভংগি, সতর্কতা, দূরদৃষ্টি, অন্তর্দৃষ্টি, বিচার ক্ষমতা, পরিস্থিতি বিশ্লেষণ ও তদনুযায়ী কর্মনীতি নির্ধারণের যোগ্যতা, আবেগ-বাসনা-উত্তেজনার সংযমশক্তি এবং অপরাপর মানুষকে প্রভাবিত, আকৃষ্ট ও কাজে নিয়োজিত করার বিচক্ষণতা পুরোমাত্রায় থাকে, তবে এই দুনিয়ায় তার সফলতা সুনিশ্চিত।

"সেই সংগে এমন কিছু গুণও তার থাকা চাই যেইগুলো মানব-সমাজে তার সম্মান

ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত করে। আত্মসম্মান বোধ, বদান্যতা, দয়া-অনুগ্রহ, সহানুভূতি, ঔদার্য, প্রশস্ত চিত্ততা, নিরপেক্ষতা, দৃষ্টির উদারতা, সত্যবাদিতা, বিশ্বাস-পরায়ণতা, ন্যায় নিষ্ঠা, ওয়াদাপূরণ, সভ্যতা-ভব্যতা প্রভৃতি এইগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য।"

"কোন মানবগোষ্ঠীর অধিকাংশের মধ্যে যদি উল্লেখিত গুণগুলোর সমাবেশ ঘটে, তাহলে বলতে হবে যে মানবতার আসল মূলধনই তাদের অর্জিত হয়েছে এবং এর ভিত্তিতে একটি শক্তিশালী সমাজ সংস্থা গড়ে তোলা সহজ সাধ্য হবে। তবে এই মূলধনের সামাজিক রূপ লাভের জন্য আরো কিছু নৈতিক গুণের সম্মিলন প্রয়োজন। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, সমাজের সকল লোক কিংবা অধিকাংশ লোক একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্যকে চূড়ান্ত লক্ষ্যরূপে গ্রহণ করবে। সেই লক্ষ্যকে তারা তাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততির চেয়েও বেশি ভালোবাসবে, তাদের মাঝে পারস্পরিক সৌহার্দ থাকবে ও মিলেমিশে কাজ করার মনোভংগি থাকবে, উদ্দেশ্য হাছিলের জন্য সংঘবদ্ধভাবে প্রচেষ্টা চালাতে যতোখানি আত্মত্যাগ অপরিহার্য তা করতে তারা প্রস্তুত থাকবে, ভালো ও মন্দ নেতার মধ্যে পার্থক্য করার মতো বুদ্ধিমত্তা থাকবে... নেতার নির্দেশ পালনে অভ্যস্ত হতে হবে... গোটা জাতির চেতনা এতোখানি তীব্র থাকতে হবে যে কল্যাণকর বিষয়ের বিপরীতে ক্ষতিকর কোন কিছুকে বরদাশত করবে না।"

আরো সামনে এগিয়ে সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী ইসলামী নৈতিকতার ওপর আলোকপাত করেন। তিনি বলেন, "ইসলাম মৌলিক মানবীয় গুণকে নির্ভুল কেন্দ্রের সাথে যুক্ত করে দেয়।... মৌলিক মানবীয় গুণ প্রথম অবস্থায় নিরপেক্ষ একটি শক্তি রূপেই থাকে। এই অবস্থায় তা ভালোও হতে পারে, মন্দও হতে পারে, কল্যাণের হাতিয়ার হতে পারে, অকল্যাণের হাতিয়ারও হতে পারে। যেমন একটি শাণিত তলোয়ার। ডাকাতের হাতে পড়লে তা যুল্‌ম-পীড়নের হাতিয়ারে পরিণত হয়। আল্লাহর পথের মুজাহিদদের হাতে পড়লে তা কল্যাণের হাতিয়ারে পরিণত হয়।"

"ইসলাম মানুষের গোটা জীবন ও তার অন্তর্নিহিত শক্তিগুলোকে এইভাবেই নিয়ন্ত্রিত ও সংশোধিত করে। এই সংশোধনের ফলে মৌলিক মানবীয় গুণগুলো সঠিক পথে পরিচালিত হয় ও ব্যক্তি স্বার্থ, বংশ, পরিবার কিংবা জাতির শ্রেষ্ঠত্ব বিধানের জন্য ব্যয়িত না হয়ে সত্যের বিজয় নিশ্চিত করার জন্য সংগতভাবে ব্যয় হতে থাকে।"

"পৃথিবীর বুকে ইসলামী নৈতিকতা ও মৌলিক মানবীয় গুণ সমৃদ্ধ এবং জাগতিক

উপায় উপকরণ সঠিকভাবে ব্যবহারকারী একটি সুসংগঠিত দল বর্তমান না থাকলে আল্লাহ দুনিয়ার নেতৃত্ব ও কর্তৃত্বের চাবিকাঠি এমন একটি দলের হাতে ন্যস্ত করেন যেই দলটি অন্তত মৌলিক মানবীয় গুণে ভূষিত ও জাগতিক উপায়-উপকরণ ব্যবহার করার দিক দিয়ে অন্য দলগুলোর তুলনায় অধিক অগ্রসর।... কিন্তু দুনিয়ায় যদি এমন একটি সুসংগঠিত দল সত্যিই বর্তমান থাকে যেটি ইসলামী নৈতিকতা ও মৌলিক মানবীয় গুণে অন্যান্য সকলের চেয়ে শ্রেষ্ঠতর এবং জাগতিক উপায়-উপকরণ ব্যবহারের ক্ষেত্রেও অন্যদের চেয়ে পশ্চাৎপদ নয়, তাহলে দুনিয়ার নেতৃত্ব-কর্তৃত্বের চাবিকাঠি অন্য দলের হাতে অর্পিত হওয়া একেবারেই অসম্ভব ব্যাপার।"

"এই কথাও স্মরণ রাখতে হবে যে ঐরূপ একটি দলের উপস্থিতিই নেতৃত্ব ব্যবস্থায় পরিবর্তন ঘটার জন্য যথেষ্ট নয়। ব্যাপার এমন নয় যে এই দিকে এই রূপ একটি দল অস্তিত্ব লাভ করবে, আর ঐদিকে আসমান থেকে একদল ফিরিশতা নেমে কাফির ও ফাসিকদেরকে নেতৃত্বের আসন থেকে হটিয়ে এদেরকে সেই আসনে বসিয়ে দেবে। এইরূপ অস্বাভাবিক নিয়মে মানব সমাজে কখনোই কোন পরিবর্তন ঘটে না। নেতৃত্ব ব্যবস্থায় পরিবর্তন আনতে হলে জীবনের সকল ক্ষেত্রে, প্রত্যেক কদমে কাফির ও ফাসিক শক্তির সাথে মুকাবিলা করতে হবে এবং সত্য প্রতিষ্ঠার বন্ধুর পথে সকল প্রকার কুরবানী দিয়ে সত্য প্রীতির ঐকান্তিকতা ও অপ্রতিভ যোগ্যতারও প্রমাণ পেশ করতে হবে।"

অতপর সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী ইসলামী নৈতিকতার চারটি পর্যায় ব্যাখ্যা করেন। তিনি বলেন,

"আর কুরআন ও আল হাদিসের শিক্ষা অনুযায়ী এর চারটি পর্যায় রয়েছে। প্রথম ঈমান, দ্বিতীয় ইসলাম, তৃতীয় তাকওয়া ও চতুর্থ ইহসান। এই চারটি পর্যায়ের পরবর্তীটি পূর্ববর্তীটির থেকে উদ্ভূত ও এরই ওপর প্রতিষ্ঠিত।"

ঈমান

"এটি ইসলামী জিন্দিগীর বুনিয়াদ।... পরিপূর্ণ ইসলামী জিন্দিগী গঠনের জন্য সুবিস্তারিত, সম্প্রসারিত, সুগভীর ও সুদৃঢ় ঈমান অত্যাবশ্যক। ঈমানের ব্যাপ্তি থেকে জীবনের কোন একটি দিক বা বিভাগও যদি বাইরে থাকে, তাহলে জীবনের সেই দিক বা বিভাগ পুনর্গঠিত হবার সুযোগ থেকে বঞ্চিত থাকে। ঈমানের গভীরতায় যতোটুকু অভাব থাকে ইসলামী জিন্দিগীর প্রাসাদও সেই অনুযায়ী দুর্বল থাকে।"

"বস্তুত ইসলামী জিন্দিগীর বিশাল প্রাসাদ একমাত্র সেই তাওহীদ স্বীকৃতির ওপরই স্থাপিত হতে পারে যা মানুষের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত জীবনের ওপর সম্প্রসারিত, যার ফলে প্রত্যেক ব্যক্তি নিজকে ও অন্য সব কিছুকে 'আল্লাহর মালিকানা বলে মনে করে, মানুষ সেই আল্লাহকেই মালিক, মা'বুদ, প্রভু ও আদেশ-নিষেধের নিরংকুশ অধিকারী বলে মেনে নেয়, জীবন-বিধানের উৎস একমাত্র তাঁকেই মনে করে, আল্লাহর আনুগত্য বিমুখতাকে কিংবা আল্লাহর সত্তা (যাত), গুণ (সিফাত), অধিকার (হক) ও ইখতিয়ারে (ক্ষমতা) অন্যের অংশীদারিত্ব স্বীকার করাকে মারাত্মক ভ্রান্তি ও গুমরাহী বলে মেনে নেয়।"

"এই প্রাসাদ তখনই মজবুত হওয়া সম্ভব যখন মানুষ স্বেচ্ছায় সজ্ঞানে তার নিজ সত্তা ও ধন-সম্পদ আল্লাহর জন্য কুরবান করার সিদ্ধান্ত নেয়, নিজের মনগড়া ভালমন্দের মানদন্ড চূর্ণ করে সর্বক্ষেত্রে আল্লাহর সন্তোষ ও অসন্তোষকেই মানদন্ড হিসেবে গ্রহণ করে, নিজের ধ্যান-ধারণা, বাসনা ও চিন্তাধারাকে একমাত্র আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞানের ভিত্তিতে ঢেলে গঠন করে, যেই সব কাজের দ্বারা আল্লাহর নাফরমানী হয় সেইগুলো পরিত্যাগ করে, আল্লাহর ভালোবাসাকে সর্বোচ্চ স্থান দেয়, বন্ধুতা ও শত্রুতা, পছন্দ-অপছন্দ, যুদ্ধ-সন্ধি সব কিছুকেই আল্লাহর মর্জির অধীন করে দেয়। আল্লাহর প্রতি ঈমানের নিগূঢ় অর্থ এটাই।"

"এই নিরিখে ঈমানের অন্য দিকগুলোও পরখ করা যেতে পারে। মানুষ যেই পর্যন্ত না জীবনের সকলক্ষেত্রে নবীকে একমাত্র নেতা ও পথপ্রদর্শক হিসেবে মেনে নেয়, তাঁর নেতৃত্ব বিরোধী যতো নেতৃত্ব প্রচলিত আছে তা প্রত্যাখ্যান না করে ততক্ষণ পর্যন্ত রাসূলের প্রতি ঈমান পূর্ণ হতে পারে না। আল্লাহর কিতাবে উপস্থাপিত জীবন-বিধান ছাড়া অন্য কোন বিধানকে প্রতিষ্ঠিত দেখে মনে সামান্যতম সন্তুষ্টি ভাব এবং আল্লাহর বিধানকে দুনিয়ায় প্রতিষ্ঠিত দেখার ব্যাপারে ব্যাকুলতার অভাব আল্লাহর কিতাবের প্রতি ঈমান আনার প্রমাণ বহন করে না। অনুরূপভাবে আখিরাতের প্রতি ঈমানও পূর্ণতা লাভ করতে পারেনা যেই পর্যন্ত না মানুষ দুনিয়ার ওপর আখিরাতকে প্রাধান্য দেয়। আখিরাতে আল্লাহর সামনে জওয়াবদিহি করার বিশ্বাসই মানুষকে তার প্রতিটি পদক্ষেপে ভাবতে ও সংযত হতে বাধ্য করে।"

ইসলাম

"ইসলাম হচ্ছে ঈমানের বাস্তব অভিব্যক্তি, ঈমানের কর্ম-রূপ। ঈমান ও ইসলামের সম্পর্ক বীজ ও গাছের সম্পর্কের মতো। বীজের মধ্যে যা কিছু থাকে তা-ই গাছ রূপে আত্মপ্রকাশ করে।"

"সত্যি যদি ঈমান থাকে, তাহলে ব্যক্তির বাস্তব জীবনে, কর্মজীবনে, নৈতিকতায়, গতি বিধিতে, রুচি ও মানসিক ঝোঁক প্রবণতায়,... প্রতিটি খুঁটিনাটি বিষয়েও এর বহিঃপ্রকাশ ঘটে। কোন একটি ক্ষেত্রে যদি ইসলাম বিরোধী ভাবধারা প্রকাশ পায় তাহলে বুঝতে হবে যে ঐ ক্ষেত্রটি ঈমান শূন্য অথবা ঈমান থাকলেও তা একেবারেই নিস্তেজ। আর কারো বাস্তব জীবন যদি অমুসলিমদের জীবনধারা অনুযায়ী যাপিত হয় তাহলে বুঝতে হবে তার অন্তরে ঈমানের অস্তিত্ব নেই।"

তাকওয়া

"তাকওয়া মনের সেই অবস্থারই নাম যা আল্লাহভীতি ও প্রবল দায়িত্বানুভূতির কারণে সৃষ্টি হয় এবং জীবনের প্রত্যেকটি দিকে স্বতঃস্ফুর্তভাবে আত্মপ্রকাশ করে। মানুষ আল্লাহকে ভয় করবে, সে আল্লাহর দাস এই চেতনা তার মনে জাগ্রত থাকবে, তার মনে আল্লাহর সামনে জওয়াবদিহি করার কথা স্মরণ থাকবে, এবং আল্লাহ তাকে পৃথিবীর এই পরীক্ষাগারে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য পাঠিয়েছেন এই কথা তার মনে সদা জাগ্রত থাকবে। আখিরাতের ফায়সালা এই নিরিখে হবে যে সে তার শক্তি-সামর্থ-যোগ্যতা কিভাবে প্রয়োগ করেছে, যেই সব নিয়ামাত সে পেয়েছে তার ভোগ-ব্যবহার কিভাবে করেছে, অপরাপর মানুষের সাথে তার সম্পর্ক-কাজকর্ম লেন দেন কেমন ছিলো এই ধারণা তার মনে জাগ্রত থাকবে।"

"এই অনুভূতি ও চেতনা যার মাঝে তীব্রভাবে বর্তমান থাকে তার হৃদয়-মন জাগ্রত হয়। তার ইসলামী চেতনা তেজস্বী হয়। আল্লাহর মর্জির বিপরীত প্রত্যেকটি বিষয়ই তার মনে খটকা সৃষ্টি করে,... তার অন্তর্নিহিত কর্তব্য জ্ঞান তাকে আল্লাহর সকল নির্দেশ পূর্ণ আন্তরিকতার সাথে পালন করতে বাধ্য করে। কোথাও আল্লাহর নির্ধারিত সীমা লংঘিত হওয়ার আশংকা দেখা দিলে আল্লাহর ভয়ে তার পা দুইটি কেঁপে উঠে। আল্লাহর হক ও মানুষের হক রক্ষা করা তার স্বতস্ফূর্ত স্বভাবে পরিণত হয়।"

ইহসান

"এটি ইসলামী জিন্দিগীর সর্বোচ্চ পর্যায়। ইহসান বলা হয় আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও ইসলামের প্রতি গভীর ভালোবাসা ও প্রেম-পাগল ভাবধারাকে যা একজন মুসলিমকে "ফানা ফিল ইসলাম" করে তোলে।... তাকওয়ার মূল কথা হচ্ছে আল্লাহর ভয়। আর ইহসানের মূল কথা হচ্ছে আল্লাহর ভালোবাসা। ইহসান মানুষকে আল্লাহর সন্তোষ অর্জনের জন্য সক্রিয় করে তোলে।"

তাকওয়া ও ইহসানের পার্থক্য বুঝাতে গিয়ে সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী একটি চমৎকার উদাহরণ পেশ করেছেন। তিনি বলেন,

"সরকারী কর্মচারীদের মধ্যে এমন কিছু সংখ্যক লোক থাকে যারা নিজেদের কর্তব্য দায়িত্বানুভূতি ও আগ্রহ-উৎসাহের সাথে আঞ্জাম দিয়ে থাকে। তারা নিয়মকানুন মেনে চলে। শৃংখলা ভংগ করে না। সরকারের দৃষ্টিতে আপত্তিকর কোন কাজই তারা করে না। আবার, সরকারী কর্মচারীদের মধ্যে এমন কিছু সংখ্যক লোকও থাকে যারা ঐকান্তিক নিষ্ঠা, আন্তরিক ব্যগ্রতা ও আত্মোৎসর্গের ভাবধারা নিয়ে সরকারের কল্যাণ কামনা করে। তাদের ওপর যেই সব কাজ অর্পিত হয় তারা কেবল সেইগুলোই সম্পন্ন করে না, আরো যেই সব কাজের দ্বারা রাষ্ট্রের কল্যাণ ও উন্নতি হতে পারে, সেই সব কাজও আঞ্জাম দেয়ার জন্য তারা যত্নবান হয়। নির্দিষ্ট কর্তব্যের চেয়ে তারা অনেক বেশি কাজ করে।... কোথাও আইন-শৃংখলা লংঘিত হতে দেখলে তাদের মনে প্রচন্ড আঘাত লাগে। কোথাও রাষ্ট্রদ্রোহিতামূলক কোন কিছু দৃষ্টিগোচর হলে তারা অস্থির হয়ে উঠে ও তা দমনের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করে।... পৃথিবীর সর্বত্র একমাত্র তাদের রাষ্ট্রের জয়জয়কার হোক, সর্বত্র এরই বিজয় পতাকা উড্ডীন হোক- এটাই হয় তাদের মনের বাসনা।"

"এই দুইয়ের মধ্যে প্রথমোক্ত কর্মচারীরা হয় রাষ্ট্রের মুত্তাকী আর শেষোক্ত কর্মচারীরা হয় মুহসিন।

"ইসলামে মুত্তাকীদেরও যথেষ্ট সম্মান আছে। তারাও শ্রদ্ধাভাজন, সন্দেহ নেই। কিন্তু ইসলামের আসল শক্তি হচ্ছে মুহসিনগণ। আর পৃথিবীতে ইসলামের আসল উদ্দেশ্য একমাত্র মুহসিনদের দ্বারাই সুসম্পন্ন হতে পারে।"

(দ্রষ্টব্য ঃ ইসলামী আন্দোলনের নৈতিক ভিত্তি, সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী)

২৭. আযাদী অর্জনের পথে উপ-মহাদেশ

১৯৩৯ সন থেকে ১৯৪৫ সন পর্যন্ত বিস্তৃত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে বৃটেনের জনবল ও ধনবল ব্যাপক হারে ক্ষয় হয়। অতো দূর থেকে ভারত শাসন করা তার জন্যে কষ্টকর হয়ে উঠে। অল ইন্ডিয়া ন্যাশনাল কংগ্রেসের 'ভারত ছাড়' আন্দোলন, গুপ্ত সমিতিগুলোর সশস্ত্র হামলা, জাপানের সহায়তায় ভারতের বাইরে থেকে সুভাষ চন্দ্র বোসের নেতৃত্বাধীন আযাদ হিন্দু ফৌজ কর্তৃক ভারতের পূর্ব সীমান্তে সামরিক চাপ, আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার দেয়ার জন্যে ইউনাইটেড স্টেট্স অব এমেরিকার প্রেসিডেন্ট মিঃ রুজভেল্টের পরামর্শ, হিন্দু-মুসলিম দাংগার বিস্তৃতি-সব মিলিয়ে হিসাব নিকাশ করে বৃটিশ সরকার উপ-মহাদেশের আযাদী প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

১৯৪৬ সনের মার্চ মাসে বৃটিশ কেবিনেটের সদস্য প্যাথিক লরেন্স, স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপ্স ও এ.ডি. আলেকজান্ডার সমন্বয়ে গঠিত কেবিনেট মিশন আসে ভারতে। শান্তিপূর্ণভাবে ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রক্রিয়া উদ্ভাবনের জন্য পাঠানো হয়েছিলো এই মিশন।

কেবিনেট মিশন গোটা দেশের শাসনতন্ত্র রচনার জন্য একটি গণ-পরিষদ নির্বাচনের প্রস্তাব দেয়। কেবিনেট মিশন আরো প্রস্তাব দেয় যে উপ-মহাদেশের প্রদেশগুলোকে গ্রুপ-এ, গ্রুপ-বি ও গ্রুপ-সি তে বিভক্ত করা হবে। হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশগুলো নিয়ে গঠিত হবে গ্রুপ-এ। আর মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশগুলো নিয়ে গঠিত হবে গ্রুপ-বি ও গ্রুপ-সি।

অল ইন্ডিয়া মুসলিম লীগ এই প্রস্তাবকে পাকিস্তান অর্জনের পথে এক ধাপ অগ্রগতি গণ্য করে তা মেনে নেয়। অল ইন্ডিয়া ন্যাশনাল কংগ্রেস গোটা দেশের জন্য শাসনতন্ত্র রচনার জন্য একটি গণ-পরিষদ নির্বাচনের প্রস্তাব মেনে নেয়, কিন্তু প্রদেশগুলোর গ্রুপিং মেনে নিতে অস্বীকৃতি জানায়। এমতাবস্থায় মুসলিম লীগও সমর্থন প্রত্যাহার করে নেয়।

কেবিনেট মিশনের ব্যর্থতার ফলে হিন্দু ও মুসলিমদের মধ্যে বিরাজমান তিক্ততার মাত্রা আরো বেড়ে যায়। কলকাতায় লোমহর্ষক দাংগা সংঘটিত হয়।

২৮. দ্বিতীয় কেন্দ্রীয় সম্মেলন

১৯৪৬ সনের ৫,৬ ও ৭ই এপ্রিলে এলাহাবাদের শহরতলী হারওয়ারা-তে অনুষ্ঠিত হয় জামায়াতে ইসলামীর দ্বিতীয় কেন্দ্রীয় সম্মেলন। কিডনীর ব্যথার জন্য সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী উদ্বোধনী ভাষণ দিতে পারেন নি। সম্মেলন উদ্বোধন করেন মাওলানা আমীন আহসান ইসলাহী। এই সময় জামায়াতে ইসলামীর রুকন সংখ্যা ছিলো ৪৮৬ জন। তৃতীয় দিন সমাপ্তি ভাষণ পেশ করেন আমীরে জামায়াত সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী। ভাষণে তিনি দুঃখ প্রকাশ করে বলেন যে বৃটিশরা যখন দেশ ছেড়ে যাবার প্রস্তুতি নিচ্ছে তখন দেশবাসী একে অপরের ওপর হামলা চালাচ্ছে। তিনি হিন্দু ও মুসলিমদের প্রতি সুস্থ চিন্তা অনুশীলনের আহ্বান জানান এবং বলেন হিন্দু ও মুসলিমরা যখন পৃথক হতেই হবে তখন বন্ধুর মতো পৃথক হওয়া উচিত যাতে ভবিষ্যতে সু-প্রতিবেশী রূপে বসবাস করা সম্ভব হয়। এই ভাষণে তিনি জামায়াতে ইসলামীর রুকনদের প্রতি সর্বাবস্থায় ন্যায়ের পতাকাবাহী হিসেবে ভূমিকা পালনের আহ্বান জানান।

২৯. অবশেষে দেশ-ভাগের প্রতি কংগ্রেসের সম্মতি প্রদান

১৯৪৬ সনের ২৫শে অগাস্ট গভর্ণর জেনারেল লর্ড ওয়াভেল কলকাতা সফরে আসেন। দাংগার ভয়াবহ পরিণতি দেখে তিনি আঁতকে উঠেন।

১৬ই সেপ্টেম্বর মুসলিম লীগের শীর্ষ নেতা মুহাম্মাদ আলী জিন্নাহ লর্ড ওয়াভেলের সাথে সাক্ষাত করেন এবং পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার দাবির যৌক্তিকতা আবারো তুলে ধরেন। লর্ড ওয়াভেল নীতিগতভাবে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার দাবি মেনে নেন।

১৯৪৭ সনের মার্চ মাসের শেষভাবে লর্ড ওয়াভেলের স্থলে গভর্ণর জেনারেল হয়ে আসেন লর্ড লুই মাউন্টব্যাটেন। দুই মাস তিনি উপ-মহাদেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করেন। তিনিও উপলব্ধি করেন যে দেশ ভাগ করা ছাড়া গত্যন্তর নেই।

৩রা জুন তিনি পাকিস্তান দাবি মেনে নেয়ার কথা প্রকাশ করেন এবং হিন্দুদেরকে খুশি করার জন্য ঘোষণা করেন যে বেংগল প্রদেশ ও পাঞ্জাব প্রদেশকে বিভক্ত করা হবে।

অল ইন্ডিয়া ন্যাশনাল কংগ্রেসের শীর্ষস্থানীয় নেতা জাওহারলাল নেহরু ও সরদার বল্লভ ভাই প্যাটেল ভারত বিভক্তির প্রশ্নে তাঁদের সম্মতির কথা লর্ড লুই মাউন্টব্যাটেনকে জানিয়ে দেন। কিন্তু মিঃ গান্ধী কিছুতেই তা মানতে রাজি হলেন না। তিনি বলেন, "কংগ্রেস যদি বিভক্তি মেনে নিতে চায়, তা আমার মৃত দেহের ওপর দিয়েই হবে। যদ্দিন আমি জীবিত আছি ভারতের বিভক্তি আমি মেনে নেবো না। যদি সম্ভব হয়, আমি কংগ্রেসকে এটা করতে দেবো না।"

জোর লবিং চলতে থাকে। অবশেষে মিঃ গান্ধী তাঁর মত পরিবর্তন করেন।

কংগ্রেসের অন্যতম শীর্ষ স্থানীয় নেতা মাওলানা আবুল কালাম আযাদ ভারত বিভক্তির ঘোর বিরোধী ছিলেন। তিনি বলেন, "আমি যখন আবার গান্ধীর সাথে দেখা করলাম দেখলাম তিনি পরিবর্তিত হয়ে গেছেন। এতে আমি আমার জীবনের সবচে' বড়ো আঘাত পেলাম। তিনি প্রকাশ্যে বিভক্তির পক্ষে না হলেও বিভক্তির জোর বিরোধিতা করছিলেন না। আমার কাছে যেটা বেদনাদায়ক লাগলো এবং বিস্মিত হলাম এই দেখে যে আগে সরদার প্যাটেল যেই সব যুক্তি দেখিয়ে ছিলেন, গান্ধী সেই সব যুক্তিই দেখাতে লাগলেন। দুই ঘন্টা ধরে আমি তাঁকে বুঝাবার চেষ্টা করি। কিন্তু তাঁর ওপর কোন আছর ফেলতে পারলাম না।"

৩০. হিন্দু-মুসলিম দাংগা ও জামায়াতে ইসলামী

১৯৪৭ সনের ৩রা জুন দেশ-ভাগের পরিকল্পনা প্রকাশ পেলে হিন্দু ভারত ভয়ানক হিংস্র হয়ে উঠে। "অখন্ড ভারতে এক জাতীয়তার ভিত্তিতে দেশ শাসনের সুযোগ নষ্ট হওয়ায় তার প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য হিন্দুদের হিংস্র মানসিকতার ব্যাপক প্রকাশ ঘটে। দেশের সর্বত্র মুসলিম সংখ্যালঘু অঞ্চলগুলোতে হিন্দুদের পক্ষ থেকে চরম বর্বরতা ও পাশবিকতার তান্ডবলীলা শুরু হয়। বিহার প্রদেশে সর্বাধিক লোমহর্ষক হত্যাকান্ড হতে থাকে। অখন্ড ভারত ও একজাতীয়তার পতাকাবাহীগণ মুসলিমদের জনপদগুলো একটির পর একটি জ্বালিয়ে দিতে থাকে। বহু মানব সন্তানকে জীবন্ত অগ্নিদগ্ধ করে হত্যা করা হয়। কয়েক দিনের মধ্যে হাজার হাজার বর্গ মাইল ব্যাপী এলাকার মুসলিমগণ গৃহহারা ও সর্বস্বহারা হয়ে পড়ে।"

দ্রষ্টব্য ঃ জামায়াতে ইসলামীর ইতিহাস, আব্বাস আলী খান, পৃষ্ঠা- ১৯০

হিন্দু-মুসলিম দাংগা শুধু বিহারেই সীমাবদ্ধ থাকেনি। ছড়িয়ে পড়েছিলো উপ-মহাদেশের সর্বত্র। এই ভয়াবহ পরিস্থিতিতে করণীয় নির্ধারণের জন্য সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী মাজলিসে শূরার অধিবেশন ডাকেন। বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সারাদেশে দাংগা বিরোধী একটি প্রচারপত্র বিপুল সংখ্যায় বিতরণ করা হয়। সীমিত সামর্থ নিয়েই জামায়াতে ইসলামী দেশের বিভিন্ন স্থানে রিলিফ ক্যাম্প স্থাপন করে বিপন্ন মানুষের খিদমাতে আত্মনিয়োগ করে। একটি সার্কুলারের মাধ্যমে জামায়াতে ইসলামীর রুকনদের বলা হয়, "জামায়াতে ইসলামীর কোন রুকনের সামনে হিন্দু কিংবা মুসলিমদের কোন দলকে কোনব্যক্তির ওপর আঘাত হানতে দেখলে তাকে রক্ষা করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করতে হবে। আক্রান্ত ব্যক্তিকে রক্ষা করতে নিজের জীবন বিপন্ন হলেও তা করা উচিত।"

"দাংগা চলা অবস্থায় কোন ব্যক্তি কিংবা পরিবার যদি বিপন্ন হয়ে পড়ে সেই ব্যক্তি কিংবা পরিবার মুসলিম হোক অথবা অমুসলিম, তারা আশ্রয়প্রার্থী হোক না হোক নিজের চেষ্টায় সেই ব্যক্তি বা পরিবারকে আশ্রয় দিতে হবে। নিজের জীবনকে বিপন্ন করেও তার বা তাদের হিফাজাত করতে হবে।"

"দাংগা চলাকালে যখনই ও যেখানেই সুযোগ হবে জনসাধারণকে বুঝাবার চেষ্টা করতে হবে, তাদেরকে আল্লাহর ভয় দেখাতে হবে, মুসলিম হলে তাদেরকে দীনের প্রকৃত উদ্দেশ্য ও তা হাছিলের সঠিক পন্থা বলে দিতে হবে। তাদের কাছে এই কথা সুস্পষ্ট করে তুলতে হবে যে এই জাতীয় সংঘাত-সংঘর্ষ, এই ধরনের

হত্যাকান্ড কিছুতেই আল্লাহর কাছে পছন্দনীয় নয়, অমুসলিম হলে তাকে জাতীয়তাবাদের ভয়াবহ পরিণাম সম্পর্কে অবহিত করে তুলতে হবে।

দ্রষ্টব্য ঃ জামায়াতে ইসলামীর ইতিহাস, আব্বাস আলী খান, পৃষ্ঠা- ১৯৩

৩১. ভারত ও পাকিস্তান রাষ্ট্রগঠন

১৯৪৭ সনের পহেলা জুলাই বৃটিশ পার্লামেন্ট ইনডিপেনডেন্স অব ইন্ডিয়া এ্যাক্ট পাস করে। ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রস্তুতি দ্রুততার সাথে সম্পন্ন করা হয়।

১৯৪৭ সনের ১৪ ও ১৫ই অগাস্টের মধ্যবর্তী রাতে দিল্লীতে বসে পাকিস্তান ও ভারতের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন বৃটিশ শাসিত ভারতের সর্বশেষ গভর্ণর জেনারেল লর্ড লুই মাউন্টব্যাটেন।

স্বাধীন ভারতের প্রথম গভর্ণর জেনারেল হিসেবে দিল্লীতে শপথ গ্রহণ করেন লর্ড লুই মাউন্টব্যাটেন। আর পাকিস্তানের প্রথম গভর্ণর জেনারেল হিসেবে করাচীতে শপথ গ্রহণ করেন মিঃ মুহাম্মাদ আলী জিন্নাহ।

ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী হন জাওহারলাল নেহরু। তাঁর মন্ত্রীসভার সদস্য হন সরদার বল্লভ ভাই প্যাটেল, লাল বাহাদুর শাস্ত্রী, মাওলানা আবুল কালাম আযাদ প্রমুখ।

পাকিস্তানের প্রথম প্রধানমন্ত্রী হন লিয়াকত আলী খান। তাঁর মন্ত্রী সভার সদস্য হন মালিক গোলাম মুহাম্মাদ, স্যার জাফরুল্লাহ খান, মুশতাক আহমদ গুরমানী প্রমুখ।

৩২. সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদীর হিজরাত

আগেই বলেছি যে তখন জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় কার্যালয় পাঞ্জাবের গুরুদাসপুর জিলার পাঠানকোট তহশিলের ছোট্ট পল্লী জামালপুরে অবস্থিত ছিলো। মিঃ র‍্যাডক্লিফের নেতৃত্বাধীন বাউন্ডারী কমিশন প্রথমে ঘোষণা করেছিলো যে গুরুদাসপুর জিলা পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হবে। ১৯৪৭ সনের ১৭ই আগস্ট বাউন্ডারী কমিশন ঘোষণা করে যে গুরুদাসপুর জিলা ভারতের মধ্যে শামিল হবে। এই ঘোষণা ছিলো একেবারেই অযৌক্তিক। বিশেষজ্ঞদের মতে গুরুদাসপুর জিলাকে ভারতের অন্তর্ভুক্ত করার উদ্দেশ্য ছিলো ভারতের জন্য কাশ্মীরে পৌছার পথ সুগম করা।

"অগাস্ট পর্যন্ত গোটা পাঞ্জাব এক জাহান্নামের রূপ ধারণ করে। চারদিকে শুধু হত্যা, লুটতরাজ ও অগ্নি-সংযোগ এই অঞ্চলে মানুষের নয়, পশুর রাজত্ব কায়েম করে।"

দ্রষ্টব্য ঃ জামায়াতে ইসলামীর ইতিহাস, আব্বাস আলী খান, পৃষ্ঠা-১৯৪

জামালপুরের দারুল ইসলামে তখন সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদীসহ পঁচিশজন পুরুষ অবস্থান করছিলেন। আর ছিলেন কিছু সংখ্যক মহিলা। জামালপুরের চারদিকের গ্রামগুলোতে শিখেরা ছিলো সংখ্যাগুরু। হিন্দুদের মতো তারাও ছিলো মুসলিমদের প্রতি মারমুখো। ঐ সব গ্রামের মুসলিমদেরকে ব্যাপক হারে হত্যা করা হয়। ২২শে অগাস্টে এসে পাঠান কোট শহরও মুসলিমশূন্য হয়ে যায়। যেই সব মুসলিম প্রাণে বেঁচে গিয়েছিলো তারা ছুটে আসতে থাকে জামালপুরে। কয়েক দিনের মধ্যেই প্রায় আড়াই হাজার লোক এসে জড়ো হয়।

জামায়াতে ইসলামীর পঁচিশজন পুরুষ এই বিপুল সংখ্যক বিপন্ন মানুষের খিদমাতে আত্মনিয়োগ করেন। তাদের মাথা গুঁজবার ব্যবস্থা করা হয়। খাদ্যের ব্যবস্থা করা হয়।

আশংকা ছিলো, যেই কোন মুহূর্তে জামালপুর আক্রান্ত হবে। জামায়াতে ইসলামীর সদস্যগণ ক্যাম্পের চারদিকে ট্রেঞ্চ (পরিখা) খনন করে স্থানে স্থানে পাহারার ব্যবস্থা করেন। তিনটি বন্দুক আর কিছু সংখ্যক লাঠি ছিলো তাঁদের সম্বল। সাইয়েদ আবুল আ'লার নির্দেশ ছিলো নিজেরা জীবিত থাকা অবস্থায় কোন হামলাকারীকে দারুল ইসলামে প্রবেশ করতে দেয়া হবে না।

একাংশে অবস্থান করছিলো মহিলারা। তাদেরকে দা-ছুরি ইত্যাদি নিয়ে প্রস্তুত থাকতে বলা হয়। ২৪শে অগাস্ট মহিলাদেরকে একত্রিত করে সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী একটি ভাষণ দেন। সেই ভাষণে তিনি বলেন, "হয়তো দারুল ইসলামবাসীদের আজ জীবনের শেষ দিন। এই অবস্থায় যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের একজন পুরুষ বেঁচে থাকবে ইনশাআল্লাহ্ দুশমন তোমাদের কাছে পৌঁছতে পারবে না। আল্লাহ্ না করুন, পুরুষরা যদি খতম হয়েই যায় তোমাদেরকে মুমিন নারীর মতোই লড়াই করে যেতে হবে। আত্মহত্যা করা চলবে না। জীবিত অবস্থায় কারো কাছে আত্মসমর্পণ করা চলবেনা। হামলাকারীর মুকাবিলা করবে এবং আপন ইযযতের জন্য লড়াই করে জান দেবে।"

দ্রষ্টব্য ঃ জামায়াতে ইসলামীর ইতিহাস, আব্বাস আলী খান, পৃষ্ঠা- ১৯৬

জামালপুরের আশ্রয় শিবিরে আটকে পড়া এই আড়াই হাজার বিপন্ন মানুষের মুক্তির পথ করে দেন আল্লাহ রাব্বুল আলামীন।

১৯৪৭ সনের ২৫শে অগাস্ট সেনাবাহিনীর একটি কনভয় এসে পৌছে জামালপুর। দুইটি ট্রাকে করে শিশু, বৃদ্ধ ও মহিলাদেরকে পাঠিয়ে দেয়া হয় লাহোর। ২৯শে অগাস্ট সেনাবাহিনী জামালপুর আশ্রয় শিবিরের দায়িত্ব গ্রহণ করে। ক্যাম্প রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব থেকে জামায়াতে ইসলামী মুক্ত হয়। ঐ দিনই আরেকটি

সামরিক কনভয়ের সাথে তিনটি বাস নিয়ে জামায়াতে ইসলামীর সদস্য আবদুল জাব্বার গাজী জামালপুর পৌঁছেন। ৩০শে অগাস্ট সকালে সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী ও তাঁর সহকর্মীগণ লাহোরের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। ক্যাম্পে অবস্থানরত ব্যক্তিদের মনোবল সমুন্নত রাখা ও জামায়াতে ইসলামীর রেখে যাওয়া সম্পদ দেখাশুনা করার জন্য ইহসানুল হক, আযম হাশেমী ও মুহাম্মাদ হামেদকে রেখে যাওয়া হয় জামালপুরে।

১৯৪৭ সনের ৩০শে অগাস্ট সন্ধ্যার দিকে সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী তাঁর সাথীদের নিয়ে লাহোর পৌঁছেন। তাঁদের থাকার জন্য সরকার একটি বাড়ি বরাদ্দ করে। কিন্তু ২৪ ঘন্টার পর তা ফেরত নেয়। মুহাজির সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী ও তাঁর সাথীরা লাহোরের ইসলামীয়া পার্কে ছোট ছোট তাঁবু স্থাপন করে মাথা গুঁজলেন।

৩৩. নতুন কেন্দ্রীয় কার্যালয়

লাহোর শহরের ইছরা মহল্লার ৫-এ যাইলদার পার্কের বাড়িটি ভাড়া করে সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী ইসলামীয়া পার্কের তাঁবু থেকে সেখানে স্থানান্তরিত হন। তখন থেকে এই বাড়িটি তারজুমানুল কুরআনের কার্যালয় হিসেবে ব্যবহৃত হতে থাকে। আবার জামায়াতে ইসলামী পাকিস্তান-এর কেন্দ্রীয় কার্যালয়ও স্থাপিত হয় এই বাড়িতেই।

৩৪. জামায়াতে ইসলামীর বিভক্তি

উপ-মহাদেশের আযাদী হাছিলের সময় জামায়াতে ইসলামীর রুকন ছিলেন ৬২৫ জন। দেশ ভাগ হওয়ায় জামায়াতে ইসলামীকে জামায়াতে ইসলামী হিন্দ ও জামায়াতে ইসলামী পাকিস্তান নামে দুইটি স্বতন্ত্র সংগঠনে বিভক্ত করা হয়। দুইশত চল্লিশ জন রুকন নিয়ে জামায়াতে ইসলামী হিন্দ ও তিনশত পঁচাশি জন রুকন নিয়ে জামায়াতে ইসলামী পাকিস্তান কাজ শুরু করে।

৩৫. সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদীর রেডিও ভাষণ

সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী একজন বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ হিসেবে ইতিমধ্যেই সর্বমহলে পরিচিত হয়ে উঠেন। ইসলাম সম্পর্কে জ্ঞান-গর্ভ ভাষণ দেয়ার জন্য রেডিও পাকিস্তান লাহোর তাঁকে আমন্ত্রণ জানায়। এই আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে তিনি ১৯৪৮ সনের ৬ই জানুয়ারী "ইসলামের নৈতিক বিধান" ২০শে জানুয়ারী "ইসলামের রাজনৈতিক বিধান", ১০ই ফেব্রুয়ারী "ইসলামের সমাজ ব্যবস্থা", ২রা মার্চ "ইসলামের অর্থ ব্যবস্থা" ও ১৬ই মার্চ "ইসলামের আধ্যাত্মিক বিধান" সম্পর্কে মূল্যবান ভাষণ পেশ করেন।

৩৬. ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলন

১৯৪৮ সনের জানুয়ারী মাসে "ল কলেজ, লাহোর" তাঁকে "ইসলামী আইন" সম্পর্কে বক্তব্য রাখার জন্য আহ্বান জানায়। জ্ঞানী গুণী ব্যক্তিরা সমবেত হয়েছিলেন ঐ আলোচনা সভায়। সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী প্রাঞ্জল ভাষায় ইসলামী আইনের বিভিন্ন দিক ও এইগুলোর শ্রেষ্ঠত্ব তুলে ধরেন তাঁর ভাষণে। তিনি এই কথাও স্মরণ করিয়ে দেন যে পাকিস্তান আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ একদিকে আল্লাহর কাছে, অন্য দিকে মানুষের কাছে এই ওয়াদা করেছেন যে তাঁরা পাকিস্তানে ইসলামী বিধি বিধান প্রবর্তন করবেন। এখন যদি ইসলামের পরিবর্তে পাশ্চাত্য জগতের আইন প্রবর্তন করার চেষ্টা চালানো হয় তাহলে তো মুসলিমদের জন্য আলাদা আবাসভূমি প্রতিষ্ঠার যৌক্তিকতাই থাকে না।

১৯৪৮ সনের ১৯শে ফেব্রুয়ারি সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী "ল কলেজ, লাহোর" কর্তৃক আয়োজিত আরেকটি আলোচনা সভায় ভাষণ দেন। এবার তিনি "ইসলামী আইন প্রবর্তনের উপায়" সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন। ভাষণে তিনি বলেন যে ইসলামী আইন রাতারাতি প্রবর্তন করা যাবে না। বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে তা কার্যকর করতে হবে। তিনি আরো বলেন যে ইসলামী আইন প্রবর্তনের প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে পাকিস্তানের গণ-পরিষদকে ঘোষণা করতে হবে ঃ

১. "সার্বভৌমত্ব আল্লাহর। আর পাকিস্তান সরকার আল্লাহর প্রতিনিধি হিসেবে দেশ শাসন করবে।
২. ইসলামী শারীয়াহ হবে দেশের মৌলিক আইন।
৩. ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক আইনগুলোকে পরিবর্তিত করে ইসলামের সাথে সংগতিশীল আইনে পরিণত করতে হবে।
৪. ক্ষমতা প্রয়োগ করতে গিয়ে রাষ্ট্র কোন অবস্থাতেই শারীয়াহর সীমা লংঘন করতে পারবে না।"

দ্রষ্টব্য ঃ মাওলানা মওদূদী এন্ড হিজ থট, প্রফেসার মাসুদুল হাসান, পৃষ্ঠা- ৩৪৫

১৯৪৮ সনের মার্চ মাসে জামায়াতে ইসলামীর উদ্যোগে করাচীর জাহাংগীর পার্কে এক জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। এই জনসভায় প্রধান বক্তা ছিলেন সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী। এই জনসভায় তিনি উপরোক্ত চার দফা দাবি উত্থাপন করেন এবং চারদফা ভিত্তিক "আদর্শ প্রস্তাব" গ্রহণের জন্য গণ-পরিষদের প্রতি আহ্বান জানান। এইভাবে ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলনের সূচনা করে সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী দেশের বিভিন্ন স্থানে সফর করে জনসভায় ভাষণ দিতে থাকেন। অল্প সময়ের মধ্যেই ইসলামী শাসনতন্ত্রের পক্ষে জনমত গড়ে উঠে। কিন্তু বিব্রতবোধ করতে থাকেন পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠীর সেকুলার অংশটি।

৩৭. প্রথম গ্রেফতারী

১৯৪৮ সনের ১১ই সেপ্টেম্বর পাকিস্তানের স্থপতি ও প্রথম গভর্ণর জেনারেল মুহাম্মাদ আলী জিন্নাহ্ ইন্তিকাল করেন। খাজা নাজিমুদ্দিন হন পাকিস্তানের দ্বিতীয় গভর্ণর জেনারেল। প্রধানমন্ত্রী পদে বহাল থাকেন লিয়াকত আলী খান।

১৯৪৮ সনের ৪ঠা অক্টোবর অর্থাৎ মুহাম্মাদ আলী জিন্নাহর ইন্তিকালের ২২ দিন পর জননিরাপত্তা আইনে গ্রেফতার হন সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী, মাওলানা আমীন আহসান ইসলাহী, মিয়া তুফাইল মুহাম্মাদ প্রমুখ।

সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদীকে লায়ালপুর জেলে রাখা হয়। অতপর তাঁকে মুলতান জেলে স্থানান্তরিত করা হয়। অন্যান্য জেলখানা থেকে মাওলানা আমীন আহসান ইসলাহী, মিয়া তুফাইল মুহাম্মাদ ও আরো কয়েকজন সহকর্মী বন্দীকেও মুলতান জেলে আনা হয়। তাঁরা ছালাতুল ফাজর আদায় করার পর জেলের ভেতরে খোলা জায়গায় ভ্রমণ করতেন। সকালের নাশতা খেয়ে তাঁরা আল কুরআন অধ্যয়ন করতেন। এরপর খবরের কাগজ ও অন্য বই পড়তেন। ছালাতুজ জুহরের পর আবার একত্রিত হতেন ও বিভিন্ন বিষয়ে মত বিনিময় করতেন। বিকেলে তাঁরা আবার বেরুতেন হাঁটার জন্য। রাতের খাবার খেয়ে ছালাতুল ইশা আদায় করে ঘুমুতে যেতেন। মোটামুটি এই ছিলো জেলখানায় তাঁদের কাজের রুটিন।

শীর্ষ স্থানীয় নেতারা জেলে থাকলেও জামায়াতে ইসলামীর জনশক্তি ইসলামী শাসনতন্ত্রের পক্ষে জনমত গঠনের প্রয়াস চালাতে থাকে। অকুণ্ঠ সমর্থন নিয়ে এগিয়ে আসে জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম। জনমত এতোখানি প্রবল হয়ে উঠে যে তা উপেক্ষা করা সরকারের পক্ষে কঠিন হয়ে পড়ে।

১৯৪৯ সনের ৯ই মার্চ গণ-পরিষদ প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খানের নেতৃত্বে "আদর্শ প্রস্তাব" (Objective Resolution) পাস করে। "আদর্শ প্রস্তাব" পাস করায় জামায়াতে ইসলামীর মাজলিসে শূরা সরকারকে মুবারকবাদ জানায়। এই দিকে সরকার একের পর এক ডিটেনশান অর্ডার দিয়ে সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী ও তাঁর সাথীদের জেলবাস দীর্ঘায়িত করতে থাকে। সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী তাঁর ডিটেনশান চ্যালেঞ্জ করে কোন পিটিশান পেশ করেননি। তিনি বলেন যে তিনি তাঁর বিষয়টি আল্লাহর নিকট সুপর্দ করে দিয়েছেন। অন্য এক মামলা নিষ্পত্তি করতে গিয়ে ফেডারেল কোর্ট রায় দেয় যে জননিরাপত্তা আইনে ডিটেনশান মাত্র দুইবার বর্ধিত করা যায়, দুইবারের বেশি বর্ধিত করা যায় না। ঐ রায় সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদীর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য ছিলো বিধায়

সরকার অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাঁকে ও তাঁর সাথীদেরকে মুক্তি দেয়। ১৯৫০ সনের ২৮শে মে প্রায় বিশ মাস কারাবাসের পর সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী ও তাঁর সাথীরা মুক্তি লাভ করেন।

১৯৫০ সনের সেপ্টেম্বর মাসে প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান শাসনতন্ত্রের মূলনীতি কমিটির রিপোর্ট গণপরিষদে উত্থাপন করেন। বিস্ময়ের ব্যাপার এই রিপোর্ট ছিলো ইতিপূর্বে গৃহীত "আদর্শ প্রস্তাবের" সাথে সামঞ্জস্যহীন। এতে ছিলো ইসলামের পরিবর্তে পাশ্চাত্য চিন্তা-চেতনার প্রতিফলন।

১৯৫০ সনের ১৪ই অক্টোবর লাহোরে অনুষ্ঠিত জনসভায় সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী এই রিপোর্টের তীব্র সমালোচনা করেন। জামায়াতে ইসলামী দেশের বিভিন্ন স্থানে জনসভা করতে থাকে। সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী এইসব জনসভায় বক্তব্য রেখে মূলনীতি কমিটির রিপোর্টের বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তুলতে থাকেন। দেশের অন্যান্য ইসলামী ব্যক্তিত্বও এই সময় সোচ্চার হন। সমালোচনার মুখে সরকার মূলনীতি কমিটির রিপোর্ট প্রত্যাহার করে নেয়। এই সময় প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান এই চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেন যে দেশের আলিম সমাজ যদি সর্বসম্মতভাবে কোন শাসনতান্ত্রিক প্রস্তাব উপস্থাপন করতে পারে তবে গণ-পরিষদ তা বিবেচনা করে দেখবে।

৩৮. ইসলামী শাসনতন্ত্রের মূলনীতি প্রণয়ন

সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদীর উদ্যোগে ১৯৫১ সনের ২১শে জানুয়ারী করাচীতে অনুষ্ঠিত হয় দেশের সেরা আলিমদের একটি গুরুত্বপূর্ণ মিটিং। দীর্ঘ আলাপ-আলোচনার পর তৈরি হয় মূল্যবান একটি দলীল- "ইসলামী শাসনতন্ত্রের ২২ দফা মূলনীতি"। মূলনীতিগুলো ছিলো নিম্নরূপ ঃ

১. দেশের সার্বভৌমত্বের মালিক আল্লাহ্।

২. দেশের আইন আল-কুরআন ও আস্‌সুন্নাহ্‌র ভিত্তিতে রচিত হবে।

৩. রাষ্ট্র ইসলামী আদর্শ ও নীতিমালার ওপর সংস্থাপিত হবে।

৪. রাষ্ট্র মারূফ প্রতিষ্ঠা করবে ও মুনকার উচ্ছেদ করবে।

৫. রাষ্ট্র মুসলিম দেশগুলোর সাথে ভ্রাতৃত্ব ঐক্য-সম্পর্ক মজবুত করবে।

৬. রাষ্ট্রকে দেশের সকল নাগরিকের মৌলিক প্রয়োজন পূরণের গ্যারান্টি দিতে হবে।

৭. শারীয়াহ্‌র নিরিখে নাগরিকদের সকল অধিকার নিশ্চিত করতে হবে।

৮. আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ না দিয়ে কাউকে শাস্তি দেয়া যাবে না।

৯. স্বীকৃত মুসলিম মাযহাবগুলো আইনের আওতায় পরিপূর্ণ দীনী স্বাধীনতা ভোগ করবে।

১০. অমুসলিম নাগরিকরা আইনের আওতায় পার্সোনাল ল ও পূর্ণধর্মীয় স্বাধীনতা ভোগ করবে।

১১. রাষ্ট্র শারীয়াহ্ কর্তৃক নির্ধারিত অ-মুসলিমদের অধিকারগুলো নিশ্চিত করবে।

১২. রাষ্ট্র-প্রধান হবেন একজন মুসলিম পুরুষ।

১৩. রাষ্ট্র-প্রধানের হাতে রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব অর্পিত হবে।

১৪. রাষ্ট্র-প্রধানকে পরামর্শ প্রদানের জন্য একটি মাজলিসে শূরা থাকবে।

১৫. রাষ্ট্র-প্রধান দেশের শাসনতন্ত্র সাসপেন্ড করতে পারবেন না।

১৬. সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে রাষ্ট্র- প্রধানকে পদচ্যুত করা যাবে।

১৭. রাষ্ট্র-প্রধান তাঁর কার্যাবলীর জন্য দায়ী থাকবেন এবং তিনি আইনের উর্ধে হবেন না।

১৮. বিচার বিভাগ নির্বাহী বিভাগ থেকে স্বাধীন হবে।

১৯. সরকারী ও প্রাইভেট সকল নাগরিক একই আইনের অধীন হবে।

২০. ইসলাম বিরোধী মতবাদের প্রচারণা নিষিদ্ধ হবে।

২১. দেশের বিভিন্ন অঞ্চল একই দেশের বিভিন্ন প্রশাসনিক ইউনিট বলে গণ্য হবে।

২২. আল কুরআন ও আস্‌সুন্নাহর পরিপন্থী শাসনতন্ত্রের যেই কোন ব্যাখ্যা বাতিল বলে গণ্য হবে।

এই মিটিংয়ে সভাপতিত্ব করেন সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী। প্রস্তাবের খসড়া তিনিই তৈরি করেন। অন্যদের উত্থাপিত সামান্য সংশোধনীসহ সর্বসম্মতিক্রমে এই নীতিমালা গৃহীত হয়।

১৯৫১ সনের ৮ই মে করাচীর আরামবাগে অনুষ্ঠিত জনসভায় সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী ইসলামী শাসনতন্ত্র প্রণয়নের দাবিতে জোরালো বক্তব্য রাখেন। তিনি দুঃখ প্রকাশ করে বলেন যে ভারত ও পাকিস্তান একই সময়ে স্বাধীন হলো, ভারত তার শাসনতন্ত্র তৈরি করে নিলো, কিন্তু পাকিস্তান তার শাসনতন্ত্র তৈরির কাজে এখনো একেবারে প্রাথমিক পর্যায়ে অবস্থান করছে। শাসনতন্ত্র প্রণয়নে বিলম্বকে তিনি জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থী বলেও উল্লেখ করেন। তিনি আরো বলেন যে দেশের মানুষ গণ-পরিষদের কাছে শুধু একটি শাসনতন্ত্রই চাচ্ছে না, চাচ্ছে একটি ইসলামী শাসনতন্ত্র।

সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদীর নেতৃত্বে জামায়াতে ইসলামী সারা দেশে জনসভা অনুষ্ঠান, পোস্টারিং ও হ্যান্ডবিল বিলির মাধ্যমে ইসলামী শাসনতন্ত্রের পক্ষে জনমত বলিষ্ঠতর করার অভিযান চালাতে থাকে।

১৯৫১ সনের ১৬ই অক্টোবর রাওয়ালপিন্ডির এক জনসভায় বক্তৃতা দান কালে আততায়ীর গুলিতে নিহত হন প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান। ক্ষমতার উচ্চ কেন্দ্রে ঘটে বড়ো রকমের রদবদল। পাকিস্তানের তৃতীয় গভর্ণর জেনারেল হন ইসলাম বিদ্বেষী মালিক গোলাম মুহাম্মাদ। আর গভর্ণর জেনারেল পদ থেকে নামিয়ে খাজা নাজিমুদ্দীনকে করা হয় প্রধানমন্ত্রী।

খাজা নাজিমুদ্দীন শাসনতন্ত্র রচনার কাজে হাত দেন। তাঁরই প্রচেষ্টায় ১৯৫২ সনের ২২শে ডিসেম্বর গণ-পরিষদে নতুন করে শাসনতন্ত্রের মূলনীতি কমিটির রিপোর্ট উপস্থাপিত হয়।

১৯৫৩ সনের ৩০শে জানুয়ারী লাহোরে অনুষ্ঠিত জামায়াতে ইসলামীর জনসভায় সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী ভাষণ দেন। এই ভাষণে তিনি মূলনীতি কমিটির রিপোর্ট প্রসংগে বলেন যে এই রিপোর্টের অনেক কিছু ভালো দিক রয়েছে। আবার কিছু মন্দ দিকও রয়েছে। তিনি আরো বলেন যে ভালো দিকগুলোকে সমর্থন করা ও মন্দ দিকগুলো পরিবর্তনের জন্য কাজ করা প্রয়োজন।।

৩৯. কাদিয়ানীদেরকে অ-মুসলিম ঘোষণার দাবিতে আন্দোলন

১৯৫৩ সনের জানুয়ারী মাসে কাদিয়ানী সমস্যা নিয়ে আলোচনার জন্য করাচীতে একটি সর্বদলীয় কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। এতে যোগদান করে জামায়াতে ইসলামী, জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম, মজলিসে আহরার, জমিয়তে আহলে হাদীস, আনজুমানে তাহাফফুজে হুকুকে শিয়া, মুসলিম লীগ প্রভৃতি।

সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী কাদিয়ানী সমস্যাটিকে ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলনে শামিল করে নেয়ার প্রস্তাব দেন।

১৯৫৩ সনের ২৭শে ফেব্রুয়ারী এই বিষয়ে আলোচনার জন্য করাচীতে সর্বদলীয় নির্বাহী পরিষদের মিটিং বসে। এই সভায় সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টির জন্য ডাইরেকট্ এ্যাকশানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। জামায়াতে ইসলামী এই ধরনের কার্যক্রমে বিশ্বাসী ছিলো না বিধায় সর্বদলীয় কনভেনশনের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করে। করাচীতে ডাইরেক্‌ট এ্যাকশান ব্যর্থ হয়। পাঞ্জাবে তা ভয়াবহ আকার ধারণ করে। এই জন্য সরকারের অসহিষ্ণুতাই মূলত দায়ী ছিলো।

পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন মুসলিম লীগের মমতাজ দাওলাতানা। মুসলিম লীগ

সরকারের বিরুদ্ধে মুসলিম লীগের বিক্ষোভ, এটা তিনি মেনে নিতে পারছিলেন না। তিনি পুলিশ লেলিয়ে দেন। কাদিয়ানীরাও জীপে চড়ে এখানে ওখানে মুসলিমদের ওপর গুলি ছোঁড়ে। ফলে পরিস্থিতি মারাত্মক আকার ধারন করে।

১৯৫৩ সনের ৬ই মার্চ লাহোরে মার্শাল ল ঘোষণা করা হয়। কয়েক ঘন্টার মধ্যে পরিস্থিতি শান্ত হয়ে যায়।

৪০. দ্বিতীয় গ্রেফতারী ও মৃত্যুদণ্ডাদেশ

১৯৫৩ সনের ২৮শে মার্চ মার্শাল ল কর্তৃপক্ষ সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী, মাওলানা আমীন আহ্সান ইসলাহী, মিয়া তুফাইল মুহাম্মাদ, মালিক নাসরুল্লাহ খান আযীয, চৌধুরী মুহাম্মদ আকবার ও সাইয়েদ নকী আলীকে গ্রেফতার করে।

"কাদিয়ানী সমস্যা" শীর্ষক পুস্তিকার মাধ্যমে জনগণের মধ্যে বিদ্বেষ ছড়ানো ও সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার অভিযোগ এনে মিলিটারী ট্রাইবুনালে সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদীর বিচার শুরু করা হয়। ৮ই মে ট্রাইবুনাল তাঁকে ফাঁসির হুকুম দেয়।

উল্লেখ্য যে এই দাংগায় নিহত হন ১১ জন লোক। আহত হন ৪৯ জন। এই দাংগার জন্য জামায়াতে ইসলামী বিন্দুমাত্র দায়ী ছিলো না। উদোর পিন্ডি বুধোর ঘাড়ে চাপায় সরকার।

সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদীকে ফাঁসির হুকুম দেয়ায় দারুণ উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা প্রকাশ করতে থাকে তাঁর আত্মীয়-স্বজন ও জামায়াতে ইসলামীর কর্মীরা। কিন্তু সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী ছিলেন একেবারেই নিরুদ্বিগ্ন। তাঁর ক্রন্দনরত ছেলেকে সান্ত্বনা দিয়ে তিনি বলেন, "কাঁদছো কেন? জীবন ও মৃত্যুর ফায়সালা হয় আসমানে, যমীনে নয়।"

৪১. ইসলামী শাসনতন্ত্র প্রণয়নে অগ্রগতি

প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দীন শাসনতন্ত্র প্রণয়নে হাত দেন। কিন্তু বিভিন্ন বিষয়ে গভর্ণর জেনারেল মালিক গোলাম মুহাম্মাদের সাথে তাঁর মত বিরোধ ঘটে। ১৯৫৩ সনের ১৭ই এপ্রিল গোলাম মুহাম্মাদ প্রধানমন্ত্রী পদ থেকে খাজা নাজিমুদ্দীনকে বরখাস্ত করেন। আমেরিকা থেকে বগুড়ার মুহাম্মাদ আলীকে ডেকে এনে প্রধানমন্ত্রী বানানো হয়।

সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদীর মৃত্যু দন্ডাদেশ প্রচারিত হবার পর দেশে-বিদেশে প্রতিবাদের ঝড় উঠে। ১২ই মে করাচীতে হরতাল পালিত হয়। প্রধানমন্ত্রী মুহাম্মাদ আলী ঢাকা থেকে করাচী এয়ারপোর্টে পৌছে বিশাল জনতার বিক্ষোভের

সম্মুখীন হন। প্রধানমন্ত্রী বিষয়টি বিবেচনার ওয়াদা করেন। ১৪ই মে মার্শাল ল কর্তৃপক্ষ সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদীর মৃত্যু দন্ড রহিত করে চৌদ্দ বছর সশ্রম কারাদন্ডের কথা ঘোষণা করে।

প্রধানমন্ত্রী মুহাম্মাদ আলী ঘোষণা করেছিলেন যে তিনি পাকিস্তানের স্থপতি মুহাম্মাদ আলী জিন্নাহর জন্মদিন ২৫শে ডিসেম্বর দেশবাসীকে একটি ইসলামী শাসনতন্ত্র উপহার দেবেন।

গভর্ণর জেনারেল গোলাম মুহাম্মাদ সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদীকে ফাঁসিতে ঝুলাতে পারেন নি, সেই জন্য দারুণ মর্মজ্বালায় ভুগছিলেন। ইসলামী শাসনতন্ত্রের ঘোষণা উচ্চারিত হওয়ায় তিনি আর স্থির থাকতে পারলেন না। ১৯৫৪ সনের ২৪শে অক্টোবর তিনি শাসনতন্ত্র তৈরির কাজে নিয়োজিত গণ-পরিষদই ভেংগে দেন।

গণ-পরিষদের স্পীকার মৌলভী তমিজউদ্দীন খান সিনধের চীফ কোর্টে গভর্ণর জেনারেলের পদক্ষেপ চ্যালেঞ্জ করেন। কোর্ট তাঁর পক্ষে রায় দেয়। কিন্তু ফেডারেল কোর্ট সরকারের পক্ষে রায় দেয়।

এমতাবস্থায় গভর্ণর জেনারেল মালিক গোলাম মুহাম্মাদ ইমার্জেন্সী পাওয়ারস অর্ডিন্যান্স জারি করে অনেক ধরনের ক্ষমতার সাথে শাসনতন্ত্র প্রণয়নের ক্ষমতাও নিজের হাতে তুলে নেন। কিন্তু ১৯৫৫ সনের ১৩ই এপ্রিল ভিন্ন একটি মামলার রায় প্রদান কালে ফেডারেল কোর্ট ইমার্জেন্সী পাওয়ারস অর্ডিন্যান্স বাতিল ঘোষণা করে এবং সরকারকে নতুন গণ-পরিষদ গঠন করে তার ওপর শাসনতন্ত্র রচনার ভার অর্পণ করতে বলে।

ফেডারেল কোর্টের রায়ের ফলে যেই সব আইন অকার্যকর হয়ে পড়ে তার একটির আওতায় বন্দী ছিলেন সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী। ফলে তাঁকে আর বন্দী রাখা সম্ভব ছিলো না। দুই বছর একমাস কারাবাসের পর ১৯৫৫ সনের ২৯শে এপ্রিল সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী মুক্তি লাভ করেন।

১৯৫৫ সনের ২৫শে জুন ৮০ সদস্য বিশিষ্ট নতুন গণ-পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। গভর্ণর জেনারেল মালিক গোলাম মুহাম্মাদ এবার চৌধুরী মুহাম্মাদ আলীকে প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত করেন।

চৌধুরী মুহাম্মাদ আলী একটি ইসলামী শাসনতন্ত্র তৈরির জন্য আন্তরিকভাবে চেষ্টা চালাতে থাকেন।

১৯৫৬ সনের ২৯শে ফেব্রুয়ারি গণ-পরিষদ পাকিস্তানের জন্য একটি শাসনতন্ত্র পাস করে। ২রা মার্চ গভর্ণর জেনারেল তাতে স্বাক্ষর করেন। ২৩শে মার্চ থেকে

এই শাসনতন্ত্র কার্যকর করা হবে বলে স্থির হয়। উল্লেখ্য যে ১৯৪০ সনের ২৩শে মার্চ লাহোর সম্মেলনে অল ইন্ডিয়া মুসলিম লীগ 'পাকিস্তান প্রস্তাব' গ্রহণ করেছিলো।

১৯৫৬ সনের ২৩শে মার্চ গভর্ণর জেনারেল মালিক গোলাম মুহাম্মাদকে অব্যাহতি দেয়া হয়। শাসনতন্ত্র অনুযায়ী দেশের নাম হয় ইসলামিক রিপাবলিক অব পাকিস্তান। আর এর প্রথম প্রেসিডেন্ট হন মেজর জেনারেল ইসকান্দার আলী মির্যা। চৌধুরী মুহাম্মাদ আলী বহাল থাকেন প্রধানমন্ত্রী পদে। বহু চড়াই-উৎরাই অতিক্রম করে অবশেষে একটি শাসনতন্ত্র তৈরি ও প্রবর্তন করা সম্ভব হয়।

৪২. সাইয়েদ আবুল আ'লার (তদানীন্তন) পূর্ব পাকিস্তান সফর

১৯৫৫ সনের ২৯শে এপ্রিল মুলতান জেলখানা থেকে মুক্তি লাভের পর সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী কোয়েটা এক্সপ্রেস ট্রেনে করে লাহোর পৌঁছেন। লাহোর রেলস্টেশন তখন লোকে লোকারণ্য। চার মাইল দীর্ঘ এক মিছিলের সাথে তিনি পৌঁছেন জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে। এর পর তিনি সফরে বের হন। দেশের বিভিন্ন স্থানে অনুষ্ঠিত সমাবেশে তিনি ইসলামী শাসনতন্ত্রের বৈশিষ্ট, প্রয়োজনীয়তা ও যৌক্তিকতা সম্পর্কে বক্তব্য পেশ করতে থাকেন।

১৯৫৬ সনের ২৬শে জানুয়ারী সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী আকাশ পথে লাহোর থেকে ঢাকা পৌঁছেন। তেজগাঁও এয়ারপোর্টে প্রাদেশিক শীর্ষনেতা মাওলানা আবদুর রহীম ও অধ্যাপক গোলাম আযমের নেতৃত্বে জামায়াতে ইসলামীর কর্মীরা তাঁকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করে।

২৭ শে জানুয়ারী তিনি ঢাকা পল্টন ময়দানে একটি জনসভায় বক্তৃতা করেন। ৩০শে জানুয়ারী তিনি ভাষণ দেন সিলেটের জনসভায়। ১লা ফেব্রুয়ারী তিনি বক্তব্য রাখেন কুমিল্লা টাউন হলে, ২রা ফেব্রুয়ারী তিনি চট্টগ্রামের জে. এম সেন হলে অনুষ্ঠিত সুধী সমাবেশে বক্তব্য রাখেন। ৬ই ফেব্রুয়ারী তিনি বক্তব্য রাখেন লালদীঘি ময়দানে অনুষ্ঠিত জনসভায়। ৭ই ফেব্রুয়ারী তিনি নারায়ণগঞ্জে অনুষ্ঠিত জনসভায় বক্তৃতা করেন। ১০ই ফেব্রুয়ারী তিনি বরিশালের জনসভায় যোগ দেন। বরিশাল বি.এম. কলেজে একটি ছাত্র সমাবেশেও তিনি বক্তব্য রাখেন। টাউন হলে অনুষ্ঠিত সমাবেশেও তিনি মূল্যবান বক্তব্য পেশ করেন।

বরিশাল থেকে তিনি স্টীমারে করে খুলনা পৌঁছেন। ১১ই ফেব্রুয়ারী তিনি খুলনার জনসভায় ভাষণ দেন। ১৩ই ফেব্রুয়ারী তিনি বক্তব্য পেশ করেন যশোরে অনুষ্ঠিত জনসভায়। রাতে তিনি ফরিদপুরের পথে রাজবাড়ী এসে পৌঁছেন। রাজবাড়ী

পৌঁছে তিনি রেস্ট হাউসের সামনে সমবেত ব্যক্তিদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখেন এবং রেস্ট হাউসেই রাত কাটান। ১৪ই ফেব্রুয়ারী তিনি ফরিদপুরে অনুষ্ঠিত জনসভায় ভাষণ দেন। ১৫ ফেব্রুয়ারী তিনি কুষ্টিয়া জনসভায় বক্তব্য রাখেন। অতপর তিনি রাজশাহী ঈদগাহ ময়দানে অনুষ্ঠিত জনসভায় ভাষণ দেন। তিনি রাজশাহী বারে রাজশাহী বার এসোসিয়েশনের সদস্যদের উদ্দেশ্যেও বক্তব্য রাখেন। ২২শে ফেব্রুয়ারী তিনি বগুড়াতে এক জনসভায় ভাষণ দেন। ২৩শে ফেব্রুয়ারী তিনি বক্তব্য রাখেন গাইবান্ধা জনসমাবেশে। পরদিন তিনি ঠাকুরগাঁও সফর করেন। ১লা মার্চ তিনি ঢাকা পৌঁছেন। ২রা মার্চ তিনি ঢাকা ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড হলে অনুষ্ঠিত এক সুধী সমাবেশে বক্তব্য রাখেন।

তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানে (বর্তমান বাংলাদেশে) ব্যাপক সফর করে ইসলামের পক্ষে আলোড়ন সৃষ্টি করে সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী ১৯৫৬ সনের ৪ঠা মার্চ লাহোরে ফিরেন।

৪৩. সাইয়েদ আবুল আ'লার প্রথম বিদেশ সফর

১৯৫৬ সনের মধ্যভাগে সিরিয়ার রাজধানী দামেসকে অনুষ্ঠিত হয় মু'তামার আল আলম আল ইসলামীর সম্মেলন। এই সম্মেলনে সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী অন্যতম মেহমান হিসেবে আমন্ত্রিত হন। ২৫শে জুন তিনি করাচী এয়ারপোর্ট থেকে আকাশপথে বৈরুত রওয়ানা হন। যথাসময়ে তিনি সেখানে পৌঁছেন। লেবাননের ইসলামী আন্দোলন "ইবাদুর রাহমান" ও "আল ইখওয়ানুল মুসলিমূনের" নেতৃবৃন্দ তাঁকে এয়ারপোর্টে সম্বর্ধনা জানান। সেখান থেকে মোটর গাড়িতে চড়ে তিনি সিরিয়ার রাজধানী দামেসকে পৌঁছেন। মু'তামারের সম্মেলনে মুসলিম উম্মাহর সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সমস্যা সম্পর্কে তিনি জ্ঞানগর্ভ ভাষণ পেশ করেন। তিনি মুসলিম উম্মাহর ঐক্য ও সংহতির গুরুত্বও বিশ্লেষণ করেন। তিনি একটি কেন্দ্রীয় সংস্থা গড়ে তোলার প্রস্তাব দেন যেটি দুনিয়ার বিভিন্ন ভাষায় রচিত উন্নতমানের ইসলামী সাহিত্য অন্যান্য ভাষায় অনুবাদ ও বিতরণের ব্যবস্থা করবে। তিনি আন্তর্জাতিক পর্যায়ে মুসলিম প্রিন্ট মিডিয়া ও নিউজ এজেন্সী গড়ে তোলার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি মুসলিম দেশগুলোর শিক্ষা ব্যবস্থাকে ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থায় রূপান্তরের প্রয়োজনীয়তাও বিশদভাবে ব্যাখ্যা করেন।

তাঁর সফর কালে তিনি দামেসক বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের এক সমাবেশে বক্তৃতা করেন। এই সমাবেশে সভাপতিত্ব করেছিলেন সিরিয়ার তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী। দামেসকে অবস্থানকালে তিনি মরক্কোর ইসলামী আন্দোলনের নেতা মাক্কী

আন্‌নাসিরী এবং মিসরের আল ইখওয়ানুল মুসলিমূনের" স্থপতি শহীদ শায়খ হাসানুল বান্নার জামাতা ডঃ সায়ীদ রমাদানের সাথে সাক্ষাত ও মত বিনিময় করেন।

জর্ডনের কিং হুসাইন সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী ও মু'তামারের সম্মেলনে যোগদানকারী অন্যান্য প্রতিনিধিকে জর্ডন সফরের আমন্ত্রণ জানান। যথা সময়ে তাঁরা জর্ডন পৌছেন। সাইয়েদ আবুল আ'লা রাজধানী আম্মানে এক বিশাল জনসমাবেশে ভাষণ দেন। তিনি ইবরাহীম (আ) এর কর্মকেন্দ্র ও সমাধিস্থল আল খালীল বা হেবরনও দর্শন করেন। (তখন আল খালীল জর্ডনের অন্তর্ভুক্ত ছিলো। বর্তমানে এটি ইহুদী রাষ্ট্র ইসরাঈলের দখলে রয়েছে)। অতপর তিনি হালব শহর দেখতে যান। পরে দামেসক পৌছেন।

১৯৫৬ সনের ১১ই জুলাই সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী আকাশ পথে সাউদী আরবের জিদ্দা পৌছেন। জিদ্দা থেকে মাক্কার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। তখন ছিলো হাজ মওসুম। সাইয়েদ আবুল আ'লা হাজ পালন করেন। মাক্‌কাতে তিনি আঠার দিন অবস্থান করেন। এই সময় তিনি ইসলামের ঐতিহাসিক স্থানগুলো দেখার সুযোগ পান। মাক্‌কা থেকে তিনি পৌছেন মাদীনা। তিনি মাসজিদে নববীতে ছালাত আদায় করেন। মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহর (সা) কবরের সন্নিকটে দাঁড়িয়ে প্রিয় নবীর উদ্দেশ্যে ছালাত ও সালাম পেশ করেন। তিনি মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা) ও খুলাফায়ে রাশেদীনের স্মৃতি বিজড়িত বিভিন্ন স্থান দেখেন।

১৯৫৬ সনের অগাস্ট মাসের মাঝামাঝি সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী তাঁর প্রথম বিদেশ সফর সমাপ্ত করে লাহোর ফিরেন।

৪৪. ১৯৫৬ সনের শাসনতন্ত্রের দুই দিক

সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী দেশের জন্য একটি শাসনতন্ত্র তৈরি হওয়ায় সন্তোষ প্রকাশ করেন। শাসনতন্ত্রে আল্লাহর সার্বভৌমত্বের স্বীকৃতি থাকাটাকে তিনি খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় গণ্য করেন। শাসনতন্ত্রে নির্বাহী বিভাগ থেকে বিচার বিভাগকে সম্পূর্ণরূপে আলাদা করার বিধান রাখা হয়েছিলো এবং জনগণের মৌলিক অধিকার হিফাজাতের দায়িত্ব বিচার বিভাগের ওপর ন্যস্ত করা হয়েছিলো। এটিকেও তিনি বড়ো রকমের সাফল্য হিসেবে দেখেন।

তবে এই কথাও সত্য যে ইসলামী মুলনীতিগুলোকে জাতীয় জীবনে কিভাবে বাস্তবায়ন করা হবে তার দিক নির্দেশনা শাসনতন্ত্রে ছিলো না। তদুপরি "যুক্ত নির্বাচন" না "পৃথক নির্বাচন"- এই বিষয়টিও অমীমাংসিত রাখা হয়েছিলো।

৪৫. ক্ষমতার দ্বন্দ্ব

এই শাসনতন্ত্র না ছিলো পুরোপুরি প্রেসিডেনশ্যাল" না ছিলো পুরোপুরি "পার্লামেন্টারী"। ফলে প্রেসিডেন্ট ও প্রধানমন্ত্রীর মধ্যে বনিবনা না থাকলে ক্ষমতা নিয়ে টাগ-অব-ওয়ারের সুযোগ ছিলো। এই সুযোগেরই সদ্ব্যবহার করেছিলেন "ইসলামিক রিপাবলিক অব পাকিস্তানের" প্রথম প্রেসিডেন্ট ইসকান্দার আলী মীর্যা।

ব্যক্তিগতভাবে তিনি কোন ইসলামী ব্যক্তিত্ব ছিলেন না। ইসলামের প্রতি তাঁর অনুরাগও ছিলো না। পক্ষান্তরে প্রধানমন্ত্রী চৌধুরী মুহাম্মাদ আলী ছিলেন একজন নিষ্ঠাবান মুসলিম। এসেম্বলীতে মুসলিম লীগের নেতা হিসেবে তিনি প্রধানমন্ত্রীর পদ অলংকৃত করছিলেন। তাঁর সাথে বনিবনা না হওয়ায় প্রেসিডেন্ট ইসকান্দার আলী মীর্যা, মালিক ফিরোজ খান নুনকে দিয়ে কেন্দ্রীয় পর্যায়ে রিপাবলিকান পার্টিকে শক্তিশালী করে তোলেন। একে একে বহু লোক মুসলিম লীগ ছেড়ে রিপাবলিকান পার্টিতে যোগ দিতে থাকে।

চৌধুরী মুহাম্মাদ আলীর জন্য অবস্থা নাজুক হয়ে উঠে। বিরক্ত হয়ে তিনি ১৯৫৬ সনের ৮ই সেপ্টেম্বর প্রধানমন্ত্রী পদে ইস্তফা দেন।

১৯৫৬ সনের ১২ই সেপ্টেম্বর কেন্দ্রে আওয়ামী লীগ ও রিপাবলিকান পার্টির কোয়ালিশান সরকার কায়েম হয়। প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হন আওয়ামী লীগের হুসাইন শহীদ সোহরাওয়ার্দী।

প্রধানমন্ত্রী হওয়ার কিছুদিন পরেই প্রধানমন্ত্রী হুসাইন শহীদ সোহরাওয়ার্দী লাহোরের এক জনসভায় "যুক্ত নির্বাচন" পদ্ধতির পক্ষে জনমত সৃষ্টির উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখেন। ঐ বছরের অকটোবর মাসে করাচীতে অনুষ্ঠিত এক জনসভায় সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী "পৃথক নির্বাচন" পদ্ধতির পক্ষে বক্তব্য রাখেন। ঐ জনসভায় এক লাখের বেশি শ্রোতা উপস্থিত ছিলেন।

৪৬. জামায়াতে ইসলামীতে মতবিরোধ

গণ-পরিষদে "আদর্শ প্রস্তাব" পাস হওয়ার পর ১৯৫১ সনের ১০ই নভেম্বর করাচীতে অনুষ্ঠিত হয় জামায়াতে ইসলামীর রুকন সম্মেলন। এই সম্মেলনে গৃহীত একটি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত ছিলো এই যে অতপর জামায়াতে ইসলামী দেশের সাধারণ নির্বাচনগুলোতে অংশ নেবে।

এই সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে জামায়াতে ইসলামী পাঞ্জাব প্রদেশ, সীমান্ত প্রদেশ ও বাহাওয়ালপুর রাজ্যের কয়েকটি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। পাঞ্জাব প্রদেশে

একজন ও বাহাওয়ালপুরে দুইজন নমিনি নির্বাচিত হন। অধিকাংশ নমিনি নির্বাচনে ফেল করায় কেন্দ্রীয় মাজলিসে শূরার কয়েকজন সদস্য বলেন যে জামায়াতে ইসলামীর নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করা ভুল হয়েছে এবং ব্যাপক হারে লোক তৈরি না হওয়া পর্যন্ত জামায়াতে ইসলামী নির্বাচনে অংশগ্রহণ করা থেকে বিরত থাকা উচিত।

এই মত-বিরোধ নিরসনের জন্যই ১৯৫৭ সনের ১৭, ১৮, ১৯, ২০ ও ২১শে ফেব্রুয়ারী বাহাওয়ালপুর রাজ্যের রহীম ইয়ার খান জিলার মাছিগোঠ পল্লীতে অনুষ্ঠিত হয় জামায়াতে ইসলামীর রুকন সম্মেলন। এই সময় রুকন ছিলেন ১২৭২ জন। নয় শত পঁয়তাল্লিশজন রুকন সম্মেলনে যোগদান করেন।

নির্বাচন অংশগ্রহণ করা থেকে বিরত থাকার জন্য যাঁরা বক্তৃতা করেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন মাওলানা আমীন আহসান ইসলাহী ও আবদুল জাব্বার গাজী। বিভিন্ন যুক্তির অবতারণা করে তাঁরা ছয় ঘন্টা বক্তব্য রাখেন। তাঁদের যুক্তি খণ্ডন করে সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদীও ছয় ঘন্টাব্যাপী ভাষণ পেশ করেন।

এই ভাষণে তিনি বলেন,

"সমাজকে ইসলামী জীবন ব্যবস্থার জন্য তৈরি করাই যদি আপনাদের সমাজ সংশোধনের উদ্দেশ্য হয় তাহলে ভোটারদেরকে সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য তৈরি করার কাজটি সেই প্রচেষ্টার কর্ম সীমার বাইরের বিষয় হয় কিভাবে? আর এই কাজটি না করলে সমাজ বিপর্যয় সৃষ্টিকারী নেতৃত্বকে অপসারিত করে সৎ নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার যোগ্য হবে- এটাই বা কি করে সম্ভব? ইসলামী জীবন বিধানের সাথে তাদেরকে পরিচিত করে তুলতে হবে। ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থার আকাংখা তাদের মাঝে সৃষ্টি করতে হবে। সৎ ও অসৎ নেতৃত্বের পার্থক্য তাদেরকে বুঝাতে হবে। দেশের ভালো-মন্দ, কল্যাণ-অকল্যাণের দায়িত্ব যে তাদের ওপর ন্যস্ত, এই চেতনা তাদের মাঝে সৃষ্টি করতে হবে। তারা যাতে অর্থের বিনিময়ে ভোট বিক্রি না করে, কারো হুমকিতে বিবেকের বিরুদ্ধে গিয়ে কাউকে ভোট না দেয়, কোন ধোঁকাবাজের দ্বারা প্রতারিত না হয়, অথবা দুর্নীতি দেখে বীতশ্রদ্ধ হয়ে ঘরে বসে না থাকে– অন্তত অতোটুকু নৈতিক শক্তি ও বিচারবুদ্ধি তাদের মাঝে সৃষ্টি করতে হবে। নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে এই কাজটুকু আমরা করতে চাই। কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি কি ভাবতে পারেন যে এটা সমাজ সংশোধনের কাজ নয়? কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি কি ভাবতে পারেন যে দেশের ভোটারদেরকে এইভাবে তৈরি না করেই নেতৃত্বের পরিবর্তন সাধিত হতে পারে ?"

দ্রষ্টব্য ঃ ইসলামী আন্দোলনের ভবিষ্যত কর্মসূচী, সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী, পৃষ্ঠা-১২৩, ১২৪।

এই ভাষণের একাংশে তিনি বলেন,

"লোকদের ঈমানদার, নামাযী, পরহেযগার ও সংশোধনকামী হওয়া এক কথা, আর ফায়সালার সময় বিদ্বেষ, প্রলোভন, ভয়-ভীতি ও প্রতারণা থেকে মুক্ত হয়ে কার্যত ইসলামী জীবন ব্যবস্থার পাল্লাকে ভারি করার জন্য দৃঢ় সংকল্প হওয়া ভিন্ন কথা। প্রথম ধরনের সংশোধনের কাজ যতো খুশি যতো বেশি করতে চান তো করতে থাকুন। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে কতো লোক এই চূড়ান্ত পর্যায়ের সংশোধনকে কবুল করেছে, তা শুধু ফায়সালার সময়েই জানা যেতে পারে। আর সেই ফায়সালার সময় আসে নির্বাচনের মওসুমে। এই মানদন্ডই কয়েক বছর অন্তর সমাজের মনোভংগি ও নৈতিকতার প্রকৃত অবস্থা এবং তার ভালো-মন্দের প্রতিটি দিক মেপে জুকে দেখিয়ে দেয়। এ এক ধরনের আদম শুমারী। সমাজে কয়জন ভোট বিক্রয়কারী রয়েছে, কয়জন চাপের কাছে নতি স্বীকার করে, কয়জন বিদ্বেষে লিপ্ত, কয়জন ইসলাম-বিরোধী মতবাদ দ্বারা প্রভাবিত, কি পরিমাণ দুর্নীতি এখানে প্রচলিত এবং তাদের মধ্যে কয়জন ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থার সহায়তার জন্য তৈরি হয়েছে- এর প্রতিটি বিষয়ই এই আদম শুমারী হিসাব করে বলে দেয়। এই মানদন্ডের সম্মুখীন না হয়ে সমাজ সংশোধনের জন্য আপনাদের মেহনতের ফলে প্রকৃতপক্ষে কতোটুকু সংশোধনের কাজ সম্পন্ন হয়েছে, আর কতোটুকুই বা বাকি আছে- তা জানা যাবে আর কোন উপায়ে?"

দ্রষ্টব্য ঃ ইসলামী আন্দোলনের ভবিষ্যত কর্মসূচী, সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী, পৃষ্ঠা-১২৫

তিনি আরো বলেন,

"আমি স্বীকার করি যে বর্তমান পরিস্থিতিতে সাফল্যের সম্ভাবনা খুবই কম। এও স্বীকার করি যে ব্যর্থতার ফলে জনমনেও খারাপ প্রভাব পড়ে, আন্দোলনের সমর্থকরাও নিরুৎসাহিত হয় এবং আমাদের কর্মীদের মধ্যেও কিছুটা বীতশ্রদ্ধার সৃষ্টি হয়। কিন্তু এতদসত্ত্বেও নির্বাচন থেকে বিচ্ছিন্ন থাকার জন্য এটাকে সঠিক ও যুক্তিসংগত কারণ বলে আমি স্বীকার করিনা। ব্যর্থতার যেই কারণগুলো দেখানো হয়, নির্বাচনে অংশ গ্রহণ না করে তার একটিও দূর করা যাবে না। নির্বাচন থেকে দূরে সরে থাকলে এই কারণগুলো হ্রাস পাওয়া তো দূরে থাক বরং আরো বৃদ্ধি পেতে থাকবে। এইগুলোর প্রতিকারের একমাত্র উপায় হচ্ছে নিরবচ্ছিন্নভাবে এই সংগ্রাম ক্ষেত্রে অবতরণ করে এইগুলোর মুকাবিলা করতে থাকা ও এইগুলোর শিকড় উপড়ে ফেলা।"

দ্রষ্টব্য ঃ ইসলামী আন্দোলনের ভবিষ্যত কর্মসূচী, সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী, পৃষ্ঠা-১৩২, ১৩৩

আরো এগিয়ে তিনি বলেন,

"রাজনৈতিক দলগুলো যেইসব নির্বাচনী অস্ত্র ব্যবহার করে ও শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ব্যক্তিরা যেইগুলো ব্যবহারে অধিকতর দক্ষতা, নির্ভীকতা ও বেপরোয়া ভাব দেখায় তা আপনা-আপনি পরিত্যক্ত হবে বলে কি আপনারা মনে করেন? আপনারা কি মনে করেন যে এই লোকগুলো আপনা-আপনি সাধু-সজ্জন হয়ে যাবে ও এইসব অস্ত্র ব্যবহার করতে লজ্জা পাবে? নেতৃত্ব-কর্তৃত্ব ক্ষমতার পরিবর্তনের জন্য আপনারা কি এমন একটি মুহূর্তের প্রত্যাশী যখন দুষ্কৃতিকারীরা ময়দান থেকে আপনা আপনি সরে দাঁড়াবে, আর কেবল ভদ্র লোকদের সাথেই আপনাদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা হবে? এই যদি আপনাদের আকাংখা হয় এবং এই শর্তগুলো পূর্ণ হলেই যদি আপনারা নেতৃত্বের পরিবর্তনের জন্য কাজ করতে চান, তবে আপনাদের এই আকাংখা ও শর্তগুলো কবে পূর্ণ হবে এবং কবে আপনারা এই সৎ কাজের জন্য অগ্রসর হতে পারবেন, তা আমি জানিনা। নেতৃত্বের পরিবর্তনের জন্য আপনারা যদি সত্যিই কিছু করতে চান তো এই "নোংরা খেলায়" পবিত্রতার সাথে এগিয়ে আসুন, বৈধ পন্থায় তামাম অবৈধ অস্ত্রের মুকাবিলা করুন, জাল ভোটের মুকাবিলায় নির্ভেজাল ভোট দিন, অর্থের বিনিময়ে ভোট ক্রয়কারীদের মুকাবিলায় নীতি ও আদর্শের খাতিরে ভোট দাতাদের নিয়ে আসুন এবং ধোঁকা প্রতারণা ও মিথ্যার দ্বারা কাজ হাছিলকারীদের মুকাবিলায় ইস্পাত কঠিন ঈমানের পরিচয় দিন। এর ফলে একবার নয়, দশবার পরাজয় বরণ করতে হলেও করুন। আপনারা পরিবর্তন আনতে চাইলে একমাত্র এইভাবেই আনতে পারেন। এইভাবে কাজ করতে করতে এমন এক সময় আসবে যখন সমস্ত অবৈধ অস্ত্র প্রয়োগ করেও দুষ্কৃতিকারীরা পরাজিত হবে।"

দ্রষ্টব্য ঃ ইসলামী আন্দোলনের ভবিষ্যত কর্মসূচী, সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী, পৃষ্ঠা-১৩৩

এই ভাষণে তিনি আরো বলেন,

"সন্দেহ নেই, এ একটি দুর্গম পথ। এতে হোঁচট খেতে হবে, পরাজয় বরণ করতে হবে, দুর্বলচিত্ত লোকেরা নিরুৎসাহিত হবে। আন্দোলনের সাথে সংশ্লিষ্ট অন্যদের মনেও হতাশা সৃষ্টি হবে। আর এই কথাও সত্য যে জনগণের একটি বিরাট অংশ এই প্রাথমিক পরাজয় থেকে ভুল অর্থ গ্রহণ করবে। কিন্তু এই দুর্গম পথ ছাড়া আমাদের লক্ষ্যস্থলে পৌছার বিকল্প কোন পথ নেই।"

দ্রষ্টব্য ঃ ইসলামী আন্দোলনের ভবিষ্যত কর্মসূচী, সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী, পৃষ্ঠা- ১৩৪

উল্লেখ্য যে, এই ভাষণে একটি মৌলিক বিষয়ের দিকেও তিনি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তিনি বলেন, "একটি নিয়মতান্ত্রিক ও গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় বসবাস করে নেতৃত্বের পরিবর্তনের জন্য কোন অনিয়মতান্ত্রিক পন্থা অবলম্বন করা শারীয়াহ সমর্থিত নয়।"

দ্রষ্টব্য ঃ ইসলামী আন্দোলনের ভবিষ্যত কর্মসূচী, সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী-পৃষ্ঠা-১২০

অতপর সম্মেলনে উপস্থিত রুকনদের মতামত গ্রহণ করা হয়। নয়শত পঁয়তাল্লিশ জন রুকনের মধ্যে নয়শত বিশ জন সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদীর মত সমর্থন করেন। ভিন্নমত সমর্থন করেন মাত্র পঁচিশ জন রুকন।

৪৭. দেশের নির্বাচন পদ্ধতি প্রশ্নে গণ-ভোট দাবি

প্রেসিডেন্ট ইসকান্দার আলী মীর্যার সাথে মত বিরোধ সৃষ্টি হওয়ায় ১৯৫৭ সনের ১৬ই অকটোবর হুসাইন শহীদ সোহরাওয়ার্দী প্রধানমন্ত্রী পদে ইস্তফা দেন।

এবার প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হন মুসলিম লীগের আই.আই. চুন্দ্রিগড়। নতুন প্রধানমন্ত্রী "পৃথক নির্বাচন" পদ্ধতি প্রবর্তনের জন্য একটি বিলের খসড়া তৈরি করে ফেলেন। কিন্তু আওয়ামী লীগ "পৃথক নির্বাচন" পদ্ধতি প্রতিরোধ করতে ছিলো দৃঢ় সংকল্প। আওয়ামী লীগ কেন্দ্রে রিপাবলিকান পার্টিকে মন্ত্রীসভা গঠনে সাহায্য করতে এই শর্তে প্রস্তুত হয় যে রিপাবলিকান পার্টি "পৃথক নির্বাচন" নয় "যুক্ত নির্বাচন" পদ্ধতি প্রবর্তন করবে। ক্ষমতার মোহে দেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর মনোভংগি উপেক্ষা করে রিপাবলিকান পার্টি আওয়ামী লীগের প্রস্তাব মেনে নেয়। ১৯৫৭ সনের ১৬ই ডিসেম্বর মালিক ফিরোজ খান নূন প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হন।

প্রধানমন্ত্রী হয়ে মালিক ফিরোজ খান নূন "যুক্ত নির্বাচন" পদ্ধতি সংক্রান্ত বিল তৈরির কাজে হাত দেন। দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের মত উপেক্ষা করে "যুক্ত নির্বাচন" সংক্রান্ত বিল তৈরি করার উদ্যোগ গ্রহণ করায় সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী এক প্রেস বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে রিপাবলিকান পার্টি ও আওয়ামী লীগের তীব্র সমালোচনা করেন।

১৯৫৮ সনের ১৯শে জানুয়ারী লাহোরের মুচিগেটে অনুষ্ঠিত এক বিশাল জনসভায় সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী নির্বাচন পদ্ধতি বিষয়ে সারা দেশে গণভোট (রেফারেন্ডাম) অনুষ্ঠানের দাবি জানান।

৪৮. সাইয়েদ আবুল আ'লার তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানে দ্বিতীয় সফর

১৯৫৮ সনের ৩০শে জানুয়ারী সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী করাচী থেকে আকাশ পথে ঢাকা পৌছেন। ৩১শে জানুয়ারী তাঁকে ঢাকাতে সম্বর্ধনা দেয়া হয়।

সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানে তিনি "যুক্ত নির্বাচন" পদ্ধতির ক্ষতিকর দিকগুলো তুলে ধরে বক্তব্য রাখেন।

অতপর সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী চট্টগ্রাম সফর করেন। এখানে তিনি সুধী সমাবেশ, বার এসোসিয়েশান সদস্যদের সমাবেশ ও জনসভায় বক্তব্য রাখেন।

সেখান থেকে কুমিল্লা পৌঁছেন। কুমিল্লায় তিনি সুধী সমাবেশে ও জনসভায় বক্তব্য রাখেন।

৮ই ফেব্রুয়ারী তিনি সিলেটে এক জনসভায় ভাষণ দেন। ১১ই ফেব্রুয়ারী তিনি বক্তৃতা করেন রাজশাহীতে অনুষ্ঠিত জনসভায়।

১৫ই ফেব্রুয়ারী তিনি মোমেনশাহীতে একটি সুধী সমাবেশে বক্তব্য রাখেন।

২২ ফেব্রুয়ারী তিনি ট্রেনযোগে রংপুর পৌঁছেন। স্টেশনে পৌঁছলে তাঁকে জানানো হয় যে জিলা ম্যাজিস্ট্রেট শহরে ১৪৪ ধারা জারি করেছেন। শহরে জামায়াতে ইসলামী কোন জনসভা করতে পারবে না। উল্লেখ্য যে তখন তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানে আওয়ামী লীগ সরকার কায়েম ছিল। সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী স্টেশনে সমবেত ব্যক্তিদের উদ্দেশ্যে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রেখে ঐ ট্রেনে করেই সৈয়দপুর পৌঁছেন। ২৩শে ফেব্রুয়ারী তিনি সৈয়দপুর জনসভায় ভাষণ দেন। ২৭শে ফেব্রুয়ারী তিনি ভাষণ দেন দিনাজপুরে অনুষ্ঠিত জনসভায়। ২৮শে ফেব্রুয়ারী ঠাকুরগাঁওতে অনুষ্ঠিত জনসভায় তিনি বক্তব্য রাখেন।

এবার তিনি একটানা ৪৫ দিন সফর করেন। ১৯৫৮ সনের ১৫ই মার্চ ঢাকাতে তিনি একটি প্রেস বিবৃতি দেন। এতে তিনি বলেন যে ৮০ থেকে ৯০ ভাগ লোক "পৃথক নির্বাচন" পদ্ধতির পক্ষে। রিপাবলিকান পার্টি ও আওয়ামীলীগ বলে বেড়াচ্ছে যে দেশের বেশির ভাগ লোক "যুক্ত নির্বাচন পদ্ধতির পক্ষে। তিনি প্রশ্ন করেন, তাদের দাবি যদি সত্য হয় তাহলে তারা গণভোট (রেফারেন্ডাম) দিতে ভয় পাচ্ছে কেন?

সফর শেষে তিনি লাহোর ফিরেন।

৪৯. অ-শাসনতান্ত্রিক শাসনের কবলে পাকিস্তান

১৯৫৪ সনের ৮ থেকে ১২ই মার্চ তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। প্রাদেশিক পরিষদের আসন সংখ্যা ছিলো তিনশত নয়।

এই নির্বাচনে শেরে বাংলা এ.কে. ফজলুল হক, মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী ও হুসাইন শহীদ সোহরাওয়ার্দী কর্তৃক পরিচালিত যুক্তফ্রন্ট তিন শত আসনে বিজয়ী হয়। মুসলিম লীগ পায় মাত্র নয়টি আসন।

১৯৫৪ সনের ৩রা এপ্রিল শেরে বাংলা এ.কে. ফজলুল হকের নেতৃত্বে প্রাদেশিক মন্ত্রীসভা গঠিত হয়। আওয়ামী লীগ এই মন্ত্রীসভায় যোগদানে বিরত থাকে। যুক্তফ্রন্টের বিভিন্ন দলগুলো পারস্পরিক কোন্দলে লিপ্ত হয়। এক মাস সাতাশ দিন পর ১৯৫৪ সনের ৩০শে মে কেন্দ্রীয় সরকার যুক্তফ্রন্ট সরকার ভেংগে দিয়ে প্রদেশে গভর্ণরের শাসন কায়েম করে।

১৯৫৬ সনের ৬ই জুন গভর্ণরের শাসন প্রত্যাহার করা হয় এবং আবু হুসাইন সরকারের নেতৃত্বে দ্বিতীয়বার যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠন করা হয়। এবারও আওয়ামী লীগ মন্ত্রীসভায় যোগদানে বিরত থাকে। মাত্র দুই মাস পর আওয়ামী লীগ আনীত অনাস্থা প্রস্তাবের ফলে আবু হুসাইন সরকার মন্ত্রীসভার পতন ঘটে। ১৯৫৬ সনের ৬ই সেপ্টেম্বর আতাউর রহমান খানের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ একটি কোয়ালিশন সরকার গঠন করে। প্রায় দুই বছর এই সরকার ক্ষমতায় ছিলো।

১৯৫৮ সনের ৩০ মার্চ তদানীন্তন গর্ভণর শেরে বাংলা এ.কে. ফজলুল হক আতাউর রহমান খানের মন্ত্রীসভা বরখাস্ত করায় আবু হুসাইন সরকারের নেতৃত্বে আবার মন্ত্রীসভা গঠিত হয়। এই দিকে এ.কে. ফজলুল হক গভর্ণর পদ হারান। নতুন গভর্ণর হয়ে আসেন সুলতানউদ্দীন আহমদ। তিনি আবু হুসাইন সরকারকে বরখাস্ত করে আবার মুখ্যমন্ত্রী নিযুক্ত করেন আতাউর রহমান খানকে।

১৯৫৮ সনের ২০শে সেপ্টেম্বর আতাউর রহমান খান মন্ত্রীসভার প্রতি আস্থা ভোটের জন্য প্রাদেশিক পরিষদের অধিবেশন ডাকা হয়। এই অধিবেশন স্পীকার আবদুল হামিদের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব পাস করে। ফলে ডেপুটি স্পীকার শাহেদ আলী পাটোয়ারী স্পীকারের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। কিন্তু সংসদ সদস্যরা এক পর্যায়ে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে স্পীকারের ওপর হামলা চালায়। হাসপাতালে তিনি ইন্তিকাল করেন।

এই সময় তদানীন্তন পশ্চিম পাকিস্তানে খান আবদুল কাইয়ুম খানের নেতৃত্বে মুসলিম লীগ মারমুখো হয়ে উঠে। আবার কালাত দেশীয় রাজ্যের খান তার রাজ্যটিকে পাকিস্তান থেকে আলাদা করে নেয়ার চেষ্টা চালাতে থাকেন।

১৯৫৮ সনের ৬ই অক্টোবর সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী লাহোরের মুচিগেটে অনুষ্ঠিত জনসভায় ভাষণ দেন। তিনি দুঃখ প্রকাশ করে বলেন যে দেশ এমন এক নাজুক অবস্থায় পৌছেছে যে কেউ বলতে পারে না আগামী কাল কি ঘটবে, এমন হতে পারে যে লোকেরা রাতে ঘুমিয়ে পড়বে, আর সকালে উঠে জানতে পাবে যে পুরো শাসনতন্ত্রই বাতিল হয়ে গেছে।

বিরাজমান পরিস্থিতি বস্তুনিষ্ঠভাবে বিশ্লেষণ করেই সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী এমন মন্তব্য করেছিলেন। তাঁর এই আশংকা সত্যে পরিণত হয়।

১৯৫৮ সনের ৭ই অক্টোবর প্রেসিডেন্ট ইসকান্দার আলী মীর্যা দেশে সামরিক শাসন জারি করেন। শাসনতন্ত্র বাতিল করা হয়। জাতীয় পরিষদ, প্রাদেশিক পরিষদ, কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভা ও প্রাদেশিক মন্ত্রসভাগুলো ভেংগে দেয়া হয়। প্রধান মার্শাল ল এডমিনিষ্ট্রেটর নিযুক্ত হন সেনা প্রধান জেনারেল মুহাম্মাদ আইউব খান।

প্রাসাদ ষড়যন্ত্রের আরেক দৃশ্য দেখা গেলো ২৭শে অক্টোবর। ঐ দিন জেনারেল মুহাম্মাদ আইউব খানের চাপের মুখে প্রেসিডেন্ট পদে ইস্তাফা দেন ইসকান্দার আলী মীর্যা। শুধু ক্ষমতা ছাড়তেই নয়, দেশ ছাড়তেও তিনি বাধ্য হন। জেনারেল মুহাম্মাদ আইউব খান নিজেই প্রেসিডেন্টের ক্ষমতা গ্রহণ করেন।

সামরিক শাসন কায়েম হওয়ায় সকল রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড নিষিদ্ধ হয়ে যায়। জামায়াতে ইসলামীও রাজনৈতিক কার্যক্রম বন্ধ করে দিতে বাধ্য হয়।

৫০. সাইয়েদ আবুল আ'লার দ্বিতীয় বিদেশ সফর

সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী অবিরাম লিখে চলছিলেন তাফহীমুল কুরআন। আল কুরআনে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বিভিন্ন নবীর কার্যাবলী আলোচনা করতে গিয়ে তাঁদের বিচরিত বিভিন্ন স্থানের নাম উল্লেখ করেছেন। ঐ সব স্থান দেখার দারুণ আগ্রহ ছিলো সাইয়েদ আবুল আ'লার মনে।

১৯৫৯ সনের ৩রা নভেম্বর তিনি করাচী থেকে সমুদ্র পথে যাত্রা করে ৮ই নভেম্বর বাহরাইন পৌছেন। রাজধানী মানামা থেকে আকাশপথে তিনি খুবার পৌছেন ১০ই নভেম্বর। ১১ই নভেম্বর রাস তানুরাহ ও ১৩ই নভেম্বর বাকিক সফর করেন।

১৩ই নভেম্বর তিনি পৌছেন সউদী আরবের অন্যতম শহর দাহরান। ১৪ই নভেম্বর তিনি দাম্মাম পৌছেন। ১৫ই নভেম্বর উক্ত অঞ্চলের গভর্ণর সাইয়েদ আবুল আলা'র সম্মানে লাঞ্চের আয়োজন করেন এবং এয়ারপোর্ট হোটেলে রাষ্ট্রীয় মেহমান হিসেবে তাঁর থাকার ব্যবস্থা করেন। ১৮ই নভেম্বর তিনি ট্রেনযোগে সউদী আরবের রাজধানী রিয়াদ পৌছেন। রিয়াদে তিনি শায়খ আবদুল আযীয বিন বায, উস্তাদ হামাদুল জাসার, শায়খ মিনাহ আলকাতান, আবদুল্লাহ ফিলবী প্রমুখ ইসলামী চিন্তাবিদদের সাথে সাক্ষাত ও মত বিনিময় করেন।

রিয়াদের গর্ভণর আমীর আবদুল্লাহ তাঁর সম্মানে এক ডিনারের আয়োজন করেন। আমীর আবদুল্লাহ তাঁকে দারইয়াহ সফরের আমন্ত্রণ জানান।

২৩শে নভেম্বর সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী দারইয়াহ পৌছেন। উল্লেখ্য যে

দারইয়াহ ছিলো ছোট্ট একটি রাজ্য যার আমীর ছিলেন সাউদী রাজ বংশের পূর্বপুরুষ মুহাম্মাদ ইবনুস সাউদ। উয়াইনা থেকে শায়খ মুহাম্মাদ ইবনু আবদিল ওয়াহহাব (রহ) দারইয়াহ এসে আমীর মুহাম্মাদ ইবনুস সাউদের নিকট ইসলামের খাঁটি রূপ তুলে ধরেন। আমীর মুহাম্মাদ তাঁর আহবানে সাড়া দিয়ে দারইয়াহকে একটি ক্ষুদ্র ইসলামী রাষ্ট্রে পরিণত করেন। আজকের সাউদী আরব সেই রাষ্ট্রের সম্প্রসারিত রূপ। সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী ঐতিহাসিক স্থানগুলো ঘুরে ঘুরে দেখেন।

২৮শে নভেম্বর সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী আকাশ পথে জিদ্দা পৌছেন। জিদ্দা এয়ারপোর্টে পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূত চৌধুরী আলী আকবার তাঁকে রিসিভ করেন। রাষ্ট্রদূত তাঁর সম্মানে একটি ডিনারের আয়োজন করেন। জিদ্দার গণ্যমান্য ব্যক্তিরাও এতে যোগ দেন। জিদ্দাতে বাস করতেন শায়খ মুহাম্মাদ নাসিফ নামক একজন বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ। সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী তাঁর বাড়িতে গিয়ে তার সাথে সাক্ষাত করেন। ৩০শে নভেম্বর সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী মাক্কা পৌছেন এবং ১লা ডিসেম্বর উমরাহ করেন। মাক্কায় অবস্থানকালে তিনি দারুল আরকাম, মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহর (সা) জন্মস্থান, শিয়াবে আবু তালিব, মাসজিদে রাইয়া, মাসজিদে জিন, আলমায়াল্লা কবরস্থান, জাবালুন্নুর, মিনা, মাশআরুল হারাম, মুযদালিফা, আরাফাত প্রান্তর, সাউর পাহাড় প্রভৃতি স্থান দর্শন করেন।

৪ঠা ডিসেম্বর তিনি মোটর গাড়িতে করে তায়েফের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন এবং রাত দশটায় তায়েফ পৌছেন। ৫ই ডিসেম্বর তায়েফের নিকটবর্তী বিভিন্ন ঐতিহাসিক স্থান দেখেন। মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা) তায়েফের মুশরিকদের নিক্ষিপ্ত কংকরের আঘাতে জর্জরিত হয়ে যেই স্থানটিতে বসে বিশ্রাম নিয়েছিলেন ও আদ্দাস নামক একজন নিনেভাবাসী ক্রীতদাস তাঁকে আংগুর খেতে দিয়েছিলেন সেই স্থানটিতে রয়েছে একটি মাসজিদ। সাইয়েদ আবুল আ'লা সেই স্থানটিও দেখেন। তায়েফের মাসজিদে আব্দুল্লাহ ইবনুল আব্বাসও তিনি দেখতে যান। এই মাসজিদের পাশেই রয়েছে আল্লাহর রাসূলের (সা) অন্যতম প্রিয় সাহাবী ও চাচাতো ভাই আবদুল্লাহ ইবনুল আব্বাসের (রা) কবর। উল্লেখ্য যে তায়েফ অবরোধ কালে মুসলিম বাহিনী এই স্থানটিতেই ক্যাম্প স্থাপন করেছিলো।

৬ই ডিসেম্বর উকায ও হুনাইন হয়ে সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী মাক্কা পৌছেন।

৭ই ডিসেম্বর তিনি ঐতিহাসিক হুদাইবিয়া চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার স্থান হুদাইবিয়া জনপদ পরিদর্শন করেন ও রাতে মাক্কায় ফিরে আসেন।

৮ই ডিসেম্বর তিনি জিদ্দা পৌছেন।

১২ই ডিসেম্বর সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী স্থলপথে মাদীনার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। মাসতুরা, মুফরাক প্রভৃতি স্থান অতিক্রম করে তিনি বদর জনপদে প্রবেশ করেন। বদরের যুদ্ধের ময়দান, বদরের শহীদদের কবর, যুদ্ধকালে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহর (সা) অবস্থান স্থল দর্শন করে সংগীদের নিয়ে তিনি আলওয়াসতা, আলহামরা ও যুল হুলাইফা হয়ে ১৩ই ডিসেম্বর সন্ধ্যায় মাদীনায় পৌছেন। মাদীনায় তিনি প্যালেস হোটেলে অবস্থান করেন। রাতেই তিনি মাসজিদে নববীতে যান, ছালাত আদায় করেন ও মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহর (সা) উদ্দেশ্যে ছালাত ও সালাম পেশ করেন।

১৪ ডিসেম্বর তিনি মাদীনা অঞ্চলের আমীরের সাথে সাক্ষাত করেন। ১৫ই ডিসেম্বর তিনি উহুদ প্রান্তরে যান এবং মহানবী (সা) ও সাহাবীদের স্মৃতি বিজড়িত স্থানগুলো দেখেন। ঐদিন বিকেলে তিনি কুবা মাসজিদে যান। সেখানে ছালাতুল আছর আদায় করেন। আরো কিছু স্থান দেখে তিনি হোটেলে ফিরে আসেন। ১৬ই ডিসেম্বর তিনি বিরে উসমান, মাসজিদে কিবলাতাইন, আতীক উপত্যকা, সালা পাহাড়, জুবাব মাসজিদ, মাসজিদুল ফাতহ, পাঁচ মাসজিদ, সাকীফা বানু সায়েদাহ, আবু আইউব আনসারীর (রা) বাড়ি প্রভৃতি স্থান দেখেন।

১৮ই ডিসেম্বর আল বাকী কবরস্থান দেখতে যান। এই কবরস্থানে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহর (সা) বহু সংখ্যক প্রিয়জন ও সাহাবীর কবর রয়েছে।

২০শে ডিসেম্বর ওয়াদিউল কুরা পৌছেন। ২১শে ডিসেম্বর তিনি আল্লাহর অন্যতম নবী সালিহ (আ) এর স্মৃতি বিজড়িত স্থান মাদায়েনে সালিহ (আল হিজর) পৌছেন। এটি ছিলো সামুদ জাতির বসতি স্থল।

২৩শে ডিসেম্বর তিনি পৌছেন খাইবার। তিনি সেই রণাংগন দেখেন যেখানে রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে খাইবারের ইহুদীদের যুদ্ধ হয়েছিলো। তিনি বিভিন্ন দুর্গের ধ্বংসাবশেষও দেখেন। ২৫শে ডিসেম্বর তিনি তাইমা পৌছে সেখানেই রাত কাটান। ২৬শে ডিসেম্বর তিনি তাবুক পৌছেন। এখানে তিনি সরকারী গেস্ট হাউসে উঠেন। ২৭শে ডিসেম্বর তিনি তাবুকের বিভিন্ন স্থান দেখার জন্য বের হন। সম্রাট হিরাক্লিয়াসের নেতৃত্বে রোমান সৈন্য বাহিনী মাদীনা ইসলামী রাষ্ট্রের সীমান্তে চাপ সৃষ্টি করলে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা) ত্রিশ হাজার মুজাহিদ নিয়ে তাবুক পৌছেন। তাঁর আগমনের খবর পেয়ে সম্রাট হিরাক্লিয়াস সীমান্ত থেকে রোমান সৈন্যদেরকে সরিয়ে নেন। যেই স্থানটিতে মুসলিম সৈনিকেরা তাঁবু গেড়ে অবস্থান করেছিলেন সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী ঘুরেফিরে সেই স্থানটি

দেখেন। ২৯শে ডিসেম্বর তিনি শুয়াইব (আ) এর কর্মক্ষেত্র মাদাইন দেখে এসে বাদাহ-তে বিশ্রাম নেন।

৩০শে ডিসেম্বর সাউদী আরবের সীমানা পেরিয়ে তিনি তাঁর সাথীদের নিয়ে জর্ডনের আকাবাহ শহরে পৌছেন। অতীতে এই স্থানের নাম ছিলো আইলা। এখানে "আল-ইখওয়ানুল মুসলিমূনের" স্থানীয় শাখার সদস্যরা তাঁকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করেন।

৩১শে ডিসেম্বর তিনি ওয়াদিয়ে মূসা পৌছেন। এখানে মূসা (আ) তাঁর জীবনের শেষ দিনগুলো কাটান। হারুন (আ) এখানেই ইন্তিকাল করেন। এই উপত্যকায় অবস্থিত জাবালে হারুনের শীর্ষদেশে হারুন (আ) কবরস্থ হন।

এই উপত্যকাতেই প্রাচীন পেত্রা নগরীর ধ্বংসাবশেষ রয়েছে। ঈসা ইবনু মারইয়ামের (আ) জন্মের দুই শত বৎসর পূর্বে নাবাতী নামক একটি জাতির রাজধানী ছিলো এই পেত্রা নগরী। সাইয়েদ আবুল আ'লা শহরের ধ্বংসাবশেষ দর্শন করেন।

পেত্রা থেকে আলমাযার নামক স্থানে পৌছেন। এখানে যায়িদ ইবন হারিসাহ (রা), জা'ফর ইবনু আবী তালিব (রা) ও আবদুল্লাহ ইবনু রাওয়াহা (রা) সহ মূতাহ যুদ্ধে যাঁরা শহীদ হয়েছিলেন তাঁদের কবর রয়েছে।

১৯৬০ সনের ১লা জানুয়ারী তিনি মৃত সাগরের (Dead Sea) পূর্ব তীরে পৌছেন। এই স্থানটিতে লূত (আ) এর জাতি বসবাস করতো।

ঐদিনই তিনি জর্ডনের রাজধানী আম্মান পৌছেন এবং প্যালেস হোটেলে অবস্থান গ্রহণ করেন। ২রা জানুয়ারী জর্ডনের আল ইখওয়ানুল মুসলিমুনের নেতা আবদুর রাহমান খালীফাহ তাঁর সম্মানে এক সম্বর্ধনা সভার আয়োজন করেন। এতে আম্মানের বিশিষ্ট ইসলামী ব্যক্তিরা যোগ দেন।

৪ঠা জানুয়ারী তিনি সাথীদেরকে নিয়ে ফিলিস্তিনের পথে রওয়ানা হন। আস ছাল্লাত শহরে তিনি শুভাকাংখীদের এক সভায় বক্তব্য রাখেন। সেখান থেকে তিনি ওয়াদিয়ে শুয়াইবে পৌছেন। আল্লাহর আযাবে মাদাইন ধ্বংস হয়ে যাবার প্রাককালে শুয়াইব (আ) সেখান থেকে হিজরাত করে এসে এইস্থানে বসবাস করতে থাকেন। এখানে একটি ছোট্ট পাহাড়ের ওপর তাঁর কবর রয়েছে।

জর্ডন নদী পার হয়ে সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী ফিলিস্তিন ভূ-খণ্ডে পৌছেন। বিকেল তিনটায় তিনি বহু সংখ্যক নবীর স্মৃতি বিজড়িত শহর জেরুসালেম পৌছেন। এখানে আল ইখওয়ানুল মুসলিমূনের একটি মিটিংয়ে তিনি বক্তব্য

রাখেন। অতপর তিনি মাসজিদুল আকসাতে ছালাতুল মাগরিব ও ছালাতুল ইশা আদায় করেন।

৫ই জানুয়ারী জেরুসালেম থেকে কয়েক মাইল দূরে অবস্থিত বাইতুল লাহাম (Bethelhem) দর্শন করেন। এই স্থানেই জন্মগ্রহণ করেছিলেন ঈসা ইবনু মারইয়াম(আ)।

সেখান থেকে সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী হেবরন বা আল খালীল পৌছেন। নামরূদের উর নগরী থেকে হিজরাত করে ইবরাহীম (আ) হেবরন এসে বসতি স্থাপন করেন। এখান থেকেই তিনি ফিলিস্তিন, হিজায ও মিসর রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় ইসলাম প্রচার করতেন। এখানে একটি গুহায় ইবরাহীম (আ) ও তাঁর বংশধরদের কবর রয়েছে। পাশেই রয়েছে একটি মাসজিদ। সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী তাঁর সাথীদের নিয়ে এই মাসজিদেই ছালাতুজ-জুহর আদায় করেন।

সেখান থেকে তিনি বানু নায়ীম পৌছেন। এখানে একটি ছোট্ট পাহাড়ের উপর লূত (আ) এর কবর রয়েছে। আল্লাহর আযাবে তাঁর কাউমের বসতিস্থল ধ্বংস হয়ে যাবার প্রাক্কালে হিজরাত করে তিনি এই স্থানে এসে বসতি স্থাপন করেন।

৬ই জানুয়ারী তিনি মাসজিদুল আকসা, কুব্বাতুস সাখরা ও অন্যান্য ঐতিহাসিক স্থান ঘুরে ঘুরে দেখেন।

৭ই জানুয়ারী তিনি মিউজিয়াম দর্শন করেন। ৭ই জানুয়ারী রাতে তিনি জেরুসালেম থেকে আম্মান পৌছেন।

৮ই জানুয়ারী তিনি আম্মানে আল ইখওয়ানুল মুসলিমূন পরিচালিত "কুল্লিয়াতুল ইসলামীয়া" (ইসলামীয়া কলেজ) পরিদর্শন করেন।

৯ই জানুয়ারী জর্ডন সরকার তাঁকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করে। বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সমাবেশে তিনি বক্তব্য পেশ করেন।

১০ই জানুয়ারী তিনি "আসহাবে কাহফের" গুহাটি দেখতে যান। গুহাটি আম্মান থেকে ৭ মাইল দূরে রাজিব নামক স্থানে অবস্থিত। অবশ্য ভিন্ন মতে, আসহাবে কাহফের গুহাটি তুর্কীর এফসুস নামক স্থানে অবস্থিত।

ওখান থেকে তিনি ইরবাদ পৌছেন। ১১ই জানুয়ারী তিনি ফাহল পৌছেন। এখানেই উমার ইবনুল খাত্তাবের (রা) শাসন কালে রোমান বাহিনীর সংগে মুসলিম বাহিনীর যুদ্ধ হয়। যুদ্ধক্ষেত্র দেখার পর সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী মুয়ায ইবনু জাবাল (রা), আবু উবাইদাহ ইবনুল জাররাহ (রা) শুরাহবীল ইবনু হাসনা (রা) ও যারার ইবনু আযওয়ার (রা) এর কবর দর্শন করেন।

ফাহল থেকে ইরবাদ পৌঁছে আরেকপথ ধরে তিনি ইয়ারমুক প্রান্তরে পৌঁছেন। উমার ইবনুল খাত্তাবের (রা) শাসনকালে এখানে সংঘটিত হয়েছিল মুসলিম বাহিনী ও রোমান বাহিনীর মধ্যে বড়ো রকমের এক যুদ্ধ।

অতপর সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী সিরিয়ার রাজধানী দামেসকের পথ ধরেন। ১২ থেকে ১৪ই জানুয়ারী তিনি এখানে অবস্থান করে বিভিন্ন ঐতিহাসিক স্থান ও গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করেন।

১৫ই জানুয়ারী তিনি দামেসক থেকে আকাশপথে কায়রো পৌঁছেন। পাকিস্তান এমবেসীর কর্মকর্তারা তাঁকে এয়ারপোর্টে রিসিভ করেন। তিনি গ্র্যান্ড হোটেলে উঠেন।

১৬ই জানুয়ারী মিসরে নিযুক্ত পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূত খাজা শাহাবুদ্দীন তাঁর সম্মানে এক সম্বর্ধনার আয়োজন করেন। ঐ তারিখে রাতে আল্লামা মুহাম্মাদ আল বাশীর আল ইব্রাহীমী তাঁর সম্মানে ডিনারের আয়োজন করেন। এতে কায়রোর সেরা ইসলামী ব্যক্তিরা যোগ দেন।

১৭ই জানুয়ারী তিনি পিরামিডগুলো ও কায়রো মিউজিয়াম দেখেন।

১৯শে জানুয়ারী তিনি আল আযহার বিশ্ববিদ্যালয় পরিদর্শন করেন এবং রেকটার মুহাম্মাদ মাহমুদ সালতুতের সাথে সাক্ষাত করেন। কায়রোতে অবস্থানকালে তিনি বিভিন্ন ঐতিহাসিক স্থান দেখেন ও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সাথে সাক্ষাত করেন।

২০শে জানুয়ারী তিনি কায়রো থেকে ২৫ মাইল দূরবর্তী সুয়েজ পৌঁছেন। রাতে তিনি সুয়েজে থাকেন।

২১শে জানুয়ারী তিনি সিনাই উপত্যকার দিকে রওয়ানা হন। সুয়েজ থেকে ১৪ মাইল দূরে রয়েছে আইওয়ান মূসা নামক একটি জনপদ। মূসা (আ) তাঁর অনুসারীদেরকে নিয়ে মিসর থেকে বেরিয়ে এখানে কিছু সময় অবস্থান করেছিলেন। এরপর তিনি পৌঁছেন ঈলাম উপত্যকা। অতপর তিনি আবু যানীমা বন্দরে পৌঁছেন। এটি সুয়েজ থেকে ১০০ মাইল দূরে অবস্থিত। আবু যানীমা থেকে তিনি ফারান মরুদ্যান অতিক্রম করে সেন্টক্যাথেরাইন গীর্জা এলাকায় পৌঁছেন।

২২শে জানুয়ারী তিনি তাঁর সংগীদের নিয়ে জাবালে মূসার দিকে অগ্রসর হন। এখানে কোন রাস্তা না থাকায় বেশ কিছু দূর তাঁদেরকে উটের পিঠে বসে যেতে হয়। এখানে অবস্থান কালেই আল্লাহর সাথে মূসা (আ) কথা বলেন। জাবালে মূসা থেকে এসে রাতে সেন্টক্যাথেরাইন এলাকায় অবস্থান করেন।

২৩শে জানুয়ারী তিনি কায়রোর পথ ধরেন। পথিমধ্যে তিনি একটি উপত্যকায় পৌছেন যেখানে সালিহ (আ) এর কবর রয়েছে। তাঁর এলাকায় আল্লাহর আযাব নাযিলের পূর্বে হিজরাত করে তিনি এখানে এসে বসতি স্থাপন করেন। ২৩শে জানুয়ারী রাতে তিনি কায়রো পৌছেন। ২৪ তারিখে আল আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের রেক্টারের সাথে তিনি এক ডিনারে মিলিত হন।

২৫শে জানুয়ারী রাতে তিনি আকাশ পথে কায়রো থেকে দামেস্ক পৌছেন। দামেস্ক থেকে পৌছেন কুয়েত। ৪ঠা ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত তিনি কুয়েত অবস্থান করেন।

৫ই ফেব্রুয়ারী সকাল বেলা তিনি কুয়েত থেকে করাচী পৌছেন। পরদিন তিনি পৌছেন লাহোর।

এইভাবে ১৯৬০ সনের ৬ই ফেব্রুয়ারী শেষ হয় সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদীর দ্বিতীয় বিদেশ সফর।

৫১. মাদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপকার

সাউদী আরবের কিং-সাউদের আমন্ত্রণে রাষ্ট্রীয় মেহমান হিসেবে সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী ১৯৬১ সনের ডিসেম্বর মাসে রিয়াদ পৌছেন। কিং একটি ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনে আগ্রহী ছিলেন এবং একটি পরিকল্পনা তৈরি করে দেবার জন্য সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদীর প্রতি আহ্বান জানান।

সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের খসড়া পরিকল্পনা তৈরি করে ফেলেন অল্প সময়ের মধ্যেই। তিনি প্রস্তাব করেন যে, এই বিশ্ববিদ্যালয় এমন উন্নতমানের আলিম তৈরি করবে যারা বর্তমান যুগের চাহিদার ইসলামী সমাধান পেশ করার যোগ্যতা সম্পন্ন হবে। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষাকার্য হবে নয় বছর। প্রথম স্তর হবে চার বছরের। এই স্তরে শিক্ষার্থীদেরকে আল কুরআন, আল হাদীস, আল ফিকহ, ইসলামের ইতিহাস ও সমাজ বিজ্ঞান পড়ানো হবে। দ্বিতীয় স্তর হবে তিন বছরের। এই স্তরে থাকবে পাঁচটি ফ্যাকাল্টি। যথাঃ আত্ তাফসীর ফ্যাকাল্টি, আল হাদীস ফ্যাকাল্টি, আল ফিক্হ ফ্যাকাল্টি, ইল্‌মুল কালাম ফ্যাকাল্টি, ও ইসলামের ইতিহাস ফ্যাকাল্টি। তৃতীয় স্তর হবে দুই বছরের। এই স্তরে উপরোক্ত যেই কোন একটি ফ্যাকাল্টিতে একজন স্কলার গবেষণা কাজে নিয়োজিত হবেন।

তিনি আরো প্রস্তাব করেন যে এই বিশ্ববিদ্যালয় পৃথিবীর সকল দেশের শিক্ষার্থীদের জন্য উন্মুক্ত থাকবে, বিশ্ব বিদ্যালয়টি হবে আবাসিক, এতে থাকবে একটি বিশাল সমৃদ্ধ লাইব্রেরী এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য উপযুক্ত পাঠ্যপুস্তক রচনার জন্য একটি সংস্থাও থাকবে।

১৯৬১ সনের ২১শে ডিসেম্বর সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী, চৌধুরী গোলাম মুহাম্মাদ ও খলীল আহমাদ হামিদী কিং-এর প্রাসাদে গিয়ে তাঁর কাছে এই পরিকল্পনা হস্তান্তর করেন। কিং-এর নির্দেশে সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী, শায়খ মুহাম্মাদ আকবার, শায়খ আবদুল লতীফ, শায়খ মুহাম্মাদ আলী আল হারাকান পরিকল্পনাটি চূড়ান্ত করেন।

এই পরিকল্পনার ভিত্তিতেই স্থাপিত হয় মাদীনার ইসলামী বিশ্ববিদালয়। এর প্রথম ভাইস-চ্যান্সেলার হন মুহাম্মাদ আলী আল হারাকান। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম সিন্ডিকেটের একজন সদস্য নিযুক্ত হন সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী।

১৯৬২ সনের জানুয়ারী মাসে তিনি দেশে ফিরে আসেন। কিন্তু ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেটের মিটিংয়ে যোগদানের জন্য মে মাসে আবার সাউদী আরব সফরে যান।

১৯৬২ সনের মে মাসেই গঠিত হয় "রাবিতাতুল-আলম-আল ইসলামী।" সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী এর প্রতিষ্ঠাতা সদস্য হওয়ার মর্যাদা লাভ করেন।

৫২. ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক "মুসলিম পারিবারিক আইনের" বিরোধিতা

১৯৬১ সনের ২রা মার্চ প্রেসিডেন্ট মুহাম্মাদ আইউব খান একটি অর্ডিন্যান্সের মাধ্যমে মুসলিম পারিবারিক আইন জারি করেন। এই আইনে দাদার বর্তমানে পিতা মারা গেলে নাতিকে সরাসরি দাদার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী করার বিধান রাখা হয়। তালাক সংক্রান্ত কতগুলো বিধান সন্নিবেশিত হয় যা ইসলামী ভাব ধারার সাথে সাংঘর্ষিক।

সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী এই আইনের ইসলামী শারীয়াহ পরিপন্থী বিধানগুলোর সমালোচনা করেন। তাঁরই উদ্যোগে দেশের চৌদ্দজন সেরা আলিম লাহোরে একত্রিত হয়ে এই আইনের চুলচেরা বিশ্লেষণ করেন। এঁদের মধ্যে ছিলেন মাওলানা মুহাম্মাদ ইদরিস কান্দালুভী, মুফতী মুহাম্মাদ হাসান, হাফিয কিফায়েত হাসান ও হাফিয আবদুল কাদির রূপারী। ১৯৬১ সনের ১৪ই মার্চ যুক্ত বিবৃতির মাধ্যমে তাঁরা এই আইন প্রত্যাহার করে নেবার জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানান। জামায়াতে ইসলামীর কর্মীরাও নানাভাবে আল্লাহর বিধানের সাথে সাংঘর্ষিক এই আইনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে থাকেন।

৫৩. ১৯৬২ সনের শাসনতন্ত্র গণতন্ত্রায়নের দাবি

১৯৬০ সনের মে মাসে প্রেসিডেন্ট মুহাম্মাদ আইউব খান বিচার প্রতি শাহাবুদ্দিনকে চেয়ারম্যান করে একটি কনষ্টিটিউশান কমিশন গঠন করেন।

দেশের জন্য যুগোপযোগী একটি শাসনতন্ত্রের প্রস্তাব তৈরি করার ভার ন্যস্ত হয় কমিশনের ওপর। কমিশন একটি প্রশ্নমালা প্রকাশ করে ও সুধী জনের কাছ থেকে উত্তর আহ্বান করে। সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী প্রশ্নমালার জওয়াব তৈরি করেন। তাঁর জওয়াব প্রকাশের জন্য প্রেসে পাঠানো হয় এবং বিভিন্ন পত্রিকা তা প্রকাশও করে। এতে মার্শাল ল কর্তৃপক্ষ অসন্তুষ্ট হন। তাঁকে লাহোরের মার্শাল ল প্রশাসকের অফিসে ডেকে নেয়া হয়। কর্তৃপক্ষ তাঁকে জানান যে তাঁর জওয়াব পত্রিকায় প্রকাশ করাটা মার্শাল ল-এর খেলাফ কাজ হয়েছে। সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী বলেন যে, কমিশন প্রশ্নমালা প্রকাশ করেছে, তিনি সেই প্রশ্নমালার জওয়াব দিয়েছেন এবং তিনি মনে করেন যে তিনি কি জওয়াব দিয়েছেন তা জানার অধিকার রয়েছে জনগণের। তিনি আরো বলেন যে, কর্তৃপক্ষ যদি মনে করে যে তিনি মার্শাল ল ভংগ করেছেন তাঁর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে। অবশ্য কর্তৃপক্ষ আর এই বিষয়ে অগ্রসর হয়নি।

১৯৬১ সনের মে মাসেই কমিশন তার সুপারিশমালা প্রেসিডেন্টের নিকট পেশ করে। কমিশন প্রেসিডেন্ট পদ্ধতির সরকার, প্রত্যক্ষ ভোট, দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট আইন পরিষদ ও একজন ভাইস-প্রেসিডেন্টের পদ সৃষ্টির সুফারিশ করে।

অক্টোবর মাসে প্রেসিডেন্ট মুহাম্মাদ আইউব খান রাওয়ালপিন্ডিতে গভর্ণরদের মিটিংয়ে সুপারিশগুলো আলোচনা করেন এবং বেশির ভাগ সুপারিশ প্রত্যাখ্যান করেন। অতপর প্রেসিডেন্টের মর্জি মতো একটি শাসনতন্ত্র রচিত হয়।

১৯৬২ সনের ১লা মার্চ প্রেসিডেন্ট এই শাসনতন্ত্র জারির ঘোষণা দেন। এই শাসনতন্ত্রে বিধান রাখা হয়েছিলো ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও মেম্বাররা— যাদের সংখ্যা তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানে ছিলো ৪০ হাজার ও পশ্চিম পাকিস্তানে চল্লিশ হাজার এবং যাদেরকে নাম দেয়া হয়েছিলো মৌলিক গণতন্ত্রী (Basic Democrats)— দেশের প্রেসিডেন্ট, জাতীয় পরিষদ ও প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচন করবে। এই শাসনতন্ত্রের ভিত্তিতে নির্বাচনও হয়ে যায়।

১৯৬২ সনের ৮ই জুন রাওয়ালপিন্ডিতে জাতীয় পরিষদের অধিবেশন বসে এবং জেনারেল মুহাম্মাদ আইউব খান "রিপাবলিক অব পাকিস্তানের" দ্বিতীয় প্রেসিডেন্ট হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন। ঐ দিনই মার্শাল ল তুলে নেয়া হয়। কিন্তু তখনো রাজনৈতিক দলগুলোর ওপর নিষেধাজ্ঞা বলবৎ ছিলো।

১৯৬২ সনের ১৭ই জুলাই রাজনৈতিক দলগুলোর ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেয়া হয়। আর চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে জামায়াতে ইসলামী দেশের সর্বত্র নতুন উদ্দীপনা নিয়ে কর্মমুখর হয়ে উঠে।

মার্শাল ল তুলে নেয়ার পর জামায়াতে ইসলামীর প্রথম জনসভা অনুষ্ঠিত হয় রাওয়ালপিন্ডির লিয়াকতবাগে। এই জনসভায় সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী ঘোষণা করেন যে পাকিস্তানকে ইসলামের আবাসভূমি বানাবার সংগ্রাম চলবে, এই সংগ্রাম চলবে নিয়মতান্ত্রিকভাবে। তিনি আরো বলেন যে দেশের মানুষের ওপর যেই শাসনতন্ত্র চাপিয়ে দেয়া হয়েছে তা একনায়কতান্ত্রিক। পরোক্ষ নির্বাচন পদ্ধতির মাধ্যমে একটি শ্রেণীর মধ্যে রাজনৈতিক ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করা হয়েছে, এটি মোটেই গণতান্ত্রিক নয়।

১৯৬২ সনের ১৫ই সেপ্টেম্বর লাহোরের মুচি গেটে অনুষ্ঠিত জনসভায় সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী দেশের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও নৈতিক অবস্থার ক্রমাবনতির জন্য দুঃখ প্রকাশ করেন। তিনি বলেন দেশের অর্থ-সম্পদের সিংহভাগ ২২ পরিবারের হাতে রয়েছে, অথচ দরিদ্র মানুষেরা দিন দিন আরো দরিদ্র হচ্ছে। ভাষণে তিনি আরো বলেন যে, পাকিস্তান অর্জিত হয়েছিলো ইসলামের নামে, দুর্ভাগ্যের বিষয়, পাকিস্তান অর্জিত হওয়ার পর এমন সব লোক রাষ্ট্র-ক্ষমতা কেড়ে নেয় যারা একদিকে ইসলাম, অন্যদিকে গণতন্ত্রের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে। তিনি "মৌলিক গণতন্ত্রের"ও সমালোচনা করেন। তিনি দাবি করেন যে–

১। দেশের জীবন বিধান হতে হবে আস্ কুরআন ও আল-সুন্নাহ ভিত্তিক জীবন বিধান।

২। কোন শ্রেণী নয়, জনগণ হবে ক্ষমতার মালিক।

৩। সরকার গঠন করবেন জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিরা।

৪। অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে যাঁরা নির্বাচিত হবেন তাঁরাই জনগণের প্রতিনিধি বলে গণ্য হবেন।

৫। সকল ব্যক্তি ও দলের মত প্রকাশের স্বাধীনতা থাকতে হবে।

৬। সরকার রেডিও, টেলিভিশন ও অন্যান্য গণমাধ্যম এক তরফাভাবে ব্যবহার করবেন না।

৫৪. তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানে তৃতীয় সফর

১৯৬২ সনের নভেম্বর মাসে সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী তৃতীয়বার তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তান সফর করেন। এবার তিনি সফরে ছিলেন আঠার দিন। তিনি মহানগরী ও গুরুত্বপূর্ণ জিলাকেন্দ্রগুলোতে যান, জামায়াতে ইসলামীর সাংগঠনিক রিপোর্ট শুনেন ও প্রয়োজনীয় হিদায়াত দেন। বিভিন্ন জনসভাতেও তিনি বক্তব্য

রাখেন। এই সব জনসভায় তিনি শাসনতন্ত্রের গণতন্ত্রায়ন, অর্থনৈতিক বৈষম্য দূরকরণ, তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি অর্থনৈতিক অবিচারের প্রতিকার এবং প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা জোরদার করার দাবিতে বক্তব্য রাখেন।

৫৫. ১৯৬৩ সনের কেন্দ্রীয় সম্মেলনের অর্জন

সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী '১৯৬২ সনের শাসনতন্ত্রের অ-গণতান্ত্রিক ধারাগুলোর সমালোচনা করেন। মুসলিম্ পারিবারিক আইনের ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক বিধানগুলো প্রত্যাহারের জোর দাবি জানান। এই সব কারণে একনায়কতান্ত্রিক সরকারের কয়েকজন মন্ত্রী তাঁর ও জামায়াতে ইসলামীর বিরুদ্ধে বিষোদগার করতে থাকেন।

এই নাজুক পরিস্থিতিতেই সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী লাহোরে জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় সম্মেলন আহ্বান করেন।

ইকবাল পার্কে সম্মেলন অনুষ্ঠানের অনুমতি চাওয়া হয়। অনুমতি দেয়া হয়নি। আরো কয়েকটি বিকল্প স্থানে অনুমতি চাওয়া হয়। এই অজুহাত সেই অজুহাতে অনুমতি দেয়া হয়নি। অবশেষে ভাটি গেটের সন্নিকটে একটি লম্বা ও অ-প্রশস্ত স্থানে সম্মেলন অনুষ্ঠানের অনুমতি দেয়া হয়। এবড়ো খেবড়ো স্থান। মাটি ফেলে এটিকে সমতল করে নিতে হয়। ডেলিগেটদের থাকার স্থান, সালাতের স্থান, খাবারের স্থান, গোসলের স্থান, টয়লেট, সভা অনুষ্ঠানের স্থান, বই-পুস্তকের স্টল ইত্যাদি তৈরি হয়ে গেলো। হাজার হাজার ডেলিগেট আসতে থাকে। কিন্তু এতো বড়ো সম্মেলন নিয়ন্ত্রণের জন্য মাইক ব্যবহারের অনুমতি দিলো না সরকার।

তিন দিনের জন্য ডাকা হয়েছিলো এই সম্মেলন। ১৯৬৩ সনের ২৫ অক্টোবর ছিলো উদ্বোধনের দিন। অনেক দূর বিস্তৃত শামিয়ানার নীচে বসে পড়েন হাজার হাজার মানুষ। যথাসময়ে মঞ্চে আসেন আমীরে জামায়াত সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী। মঞ্চে দাঁড়িয়ে তিনি লিখিত ভাষণ পড়তে শুরু করেন। শামিয়ানার নীচে কিছু দূরে দূরে রাখা ছিলো টেবিল। নির্দিষ্ট ব্যক্তিরা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদীর বক্তৃতার কপি হাতে নিয়ে টেবিলে উঠে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা পড়তে শুরু করেন। যদিও সাইয়েদ আবুল আ'লার কণ্ঠ সকলের শুনার সৌভাগ্য হলো না, কিন্তু তাঁর বক্তব্য মনোযোগ দিয়ে শুনছিলেন শ্রোতারা।

হঠাৎ শ্রোতাদের একাংশ থেকে কিছু সংখ্যক লোক দাঁড়িয়ে সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদীকে গালমন্দ শুরু করে। এই গুন্ডা দলটির দলপতি ছিলো গোলাম মুহাম্মাদ নামে এক ব্যক্তি। সে স্টেজের দিকে রিভলভার উঁচিয়ে ধরতে কয়েকজন জামায়াত কর্মী তাকে ধরে ফেলে। এই সময় লোকেরা বলতে থাকে, "মাওলানা আপনি

বসে পড় ন।" সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদীর কণ্ঠ থেকে ভেসে আসে দৃঢ় উচ্চারণ, "আমি যদি বসে পড়ি দাঁড়িয়ে থাকবে কে?"

গুন্ডাদল সভাস্থল ত্যাগ করে তাঁবুর রশিগুলো কাটতে শুরু করে। কয়েকজন বুক স্টলের দিকে এগিয়ে যায়। তারা তাফসীর তাফহীমুল কুরআনসহ অন্যান্য বই এদিক ওদিক ছুঁড়ে ফেলে। এরপর তারা মহিলাদের তাঁবুর দিকে অগ্রসর হয়। প্রবেশ পথে যাঁরা কর্তব্যরত ছিলেন তাঁদের একজন ছিলেন আল্লাহ বকস। গোলাম মুহাম্মাদের গুলির আঘাতে তিনি মাটিতে লুটিয়ে পড়েন ও শাহাদাত লাভ করেন।

জামায়াতে ইসলামীর স্বেচ্ছাসেবকেরা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসে। প্রায় ত্রিশ মিনিট সময় চলে যায়। পরিস্থিতি শান্ত হলে সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী তাঁর অসমাপ্ত উদ্বোধনী ভাষণ আবার শুরু করেন। এই ভাষণে তিনি বলেন, "যারা আল্লাহর পথে আন্দোলনে নিবেদিত তাদেরকে অবশ্যই দুইটি গুণের অধিকারী হতে হবে। এইগুলি হচ্ছে ছবর ও হিকমাহ্। ছবরের দাবি হচ্ছে, চলার পথে প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হলে উত্তেজিত না হওয়া, মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে না ফেলা এবং হতাশ হয়ে নিজেদের মিশন পরিত্যাগ না করা। যেই কোন সংকটেই সংকল্পের দৃঢ়তা হারিয়ে ফেলা উচিত নয়। হিকমাহ্র দাবি হচ্ছে একটি মাত্র কর্ম পদ্ধতিতে আটকে না যাওয়া। একটি পথ বন্ধ হয়ে গেলে নতুন আরেকটি পথ খোলার যোগ্য হওয়া।"

সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী পরিস্থিতির শিকার হয়ে কোন কথা বলতেন না, কোন পদক্ষেপও নিতেন না। তিনি আবেগতাড়িত হওয়ার মতো ব্যক্তি ছিলেন না। এতো বড়ো ঘটনা ঘটে গেলো। কিন্তু তাঁর বক্তৃতায় তার কোন প্রতিফলন ঘটেনি। তিনি যা বলার সিদ্ধান্ত নিয়ে এসেছিলেন, তা-ই বলে গেলেন। ঘটনা নিয়ে তিনি মাতামাতি করলেন না। রাতে মাজলিসে শূরার বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয় পরদিন সকালেই সম্মেলনে উপস্থিত ডেলিগেটরা গ্রুপ গ্রুপ হয়ে লাহোর বাসীদের বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে জামায়াতে ইসলামীর আহ্বান পৌছাবে। কেউ কেউ পরিস্থিতির নাজুকতা তুলে ধরেন। কিন্তু দূরদর্শী সাইয়েদ আবুল আ'লা বুঝাতে সক্ষম হন যে এইটিই মানুষের কাছে যাওয়ার উত্তম সময়।

২৬শে অক্টোবর জামায়াতে ইসলামীর ডেলিগেটরা শহরে ছড়িয়ে পড়েন। তাঁরা ২৮,৮৭২ জন ব্যক্তির সাথে সাক্ষাত ও আলাপ করেন। তাঁদের আহ্বানে সাড়া দিয়ে ৫২৭৪ জন সহযোগী সদস্য ফরম পূরণ করেন। ২৭শে অক্টোবর সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী সম্মেলনের সমাপনী ভাষণে বলেন, "আমি জানি কে এই

গুন্ডাদেরকে ভাড়া করে এনেছে। সরকারের উদ্দেশ্য ছিলো জামায়াতে ইসলামীর কর্মীদেরকে উসকিয়ে সহিংস পথে নিয়ে যাওয়া যাতে করে বাহানা বানিয়ে সম্মেলনের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা যায়। আল্লাহর শুকরিয়া যে জামায়াতে ইসলামী এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে। জামায়াত কর্মীরা ছবর ও হিকমাহ অবলম্বন করেছেন। এর ফলে তাঁরা যে কেবল বিরুদ্ধবাদীদের চক্রান্ত নস্যাত করতে পেরেছেন তাই নয়, আশাতীতভাবে তাঁরা সম্মেলনের উদ্দশ্যও পূরণ করতে পেরেছেন।"

সাইদেয় আবুল আ'লা মওদূদী জামায়াতে ইসলামীর জনশক্তিকে বলেন যে বাইরে থেকে যেই সব বিপদ আসে সেইগুলোর তোয়াক্কা না করে তাদের উচিত ভিতরের বিপদ তথা তাদের নিজেদের দুর্বলতার ওপর বিজয় লাভ করা।

৫৬. তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানে চতুর্থ সফর

১৯৬৩ সনের নভেম্বর মাসে সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী চতুর্থবারের মতো তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তান সফরে আসেন। এই সফরের প্রধান উদ্দেশ্য ছিলো জামায়াতে ইসলামীর প্রাদেশিক সম্মেলনে যোগদান করা। এই সফর কালে ঢাকার পল্টন ময়দানে এক জনসভাতেও তিনি বক্তৃতা করেন।

৫৭. জামায়াতে ইসলামীকে বে-আইনী ঘোষণা ও সাইয়েদ আবুল আ'লার তৃতীয় গ্রেফতারী

প্রেসিডেন্ট মুহাম্মাদ আইউব খান দারুণ নাখোশ ছিলেন জামায়াতে ইসলামী ও সাইয়েদ আবুল আ'লার ওপর। জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় সম্মেলন বানচাল করার জন্য অনেক কিছুই তিনি করেছেন। কিন্তু সবই হলো বুমেরাং। এতে তাঁর আক্রোশ আরো বেড়ে যায়।

প্রেসিডেন্ট মুহাম্মাদ আইউব খানের নির্দেশে ১৯৬৪ সনের ৬ই জানুয়ারি তদানীন্তন পশ্চিম পাকিস্তান ও পূর্ব পাকিস্তান সরকার জামায়াতে ইসলামীকে বে-আইনী ঘোষণা করে। সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদীসহ জামায়াতে ইসলামীর ৬০ জন নেতাকে গ্রেফতার করা হয়।

জামায়াতে ইসলামীর জনশক্তি আবারো পরীক্ষার সম্মুখীন হন। কিন্তু লাহোর সম্মেলনে প্রদত্ত সাইয়েদ আবুল আ'লার দিক-নির্দেশনা তাঁদের মনে তখনো তাজা। এই বিপদের মুকাবিলা করতে হবে ছবর ও হিকমাহর সাথে।

সরকার অভিযোগ করে যে জামায়াতে ইসলামী পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার বিরোধিতা

করেছে, কাশ্মীর জিহাদকে না-জায়েয মনে করে, সেনাবাহিনীতে অসন্তোষ সৃষ্টির চেষ্টা চালায়, সরকারী কর্মচারীদের আনুগত্যশীলতা বিনষ্ট করে, ছাত্রদের মাঝে অসন্তোষ সৃষ্টি করে এবং বিদেশ থেকে আর্থিক সাহায্য গ্রহণ করে।

জামায়াতে ইসলামী সরকারের বানোয়াট অভিযোগ ও বে-আইনী পদক্ষেপের বিরুদ্ধে আইনী লড়াই চালানোর সিদ্ধান্ত নেয়। মিঃ এ.কে. ব্রোহীর নেতৃত্বে গঠিত একটি টীমের ওপর মামলা পরিচালনার দায়িত্ব অর্পিত হয়। পশ্চিম পাকিস্তান ও পূর্ব পাকিস্তান হাইকোর্টে রীট পিটিশান দাখিল করা হয়। পশ্চিম পাকিস্তান হাইকোর্ট রীট পিটিশান খারিজ করে দেয়, আর পূর্ব পাকিস্তান হাইকোর্ট সরকারের অর্ডার বাতিল ঘোষণা করে। পশ্চিম পাকিস্তান থেকে জামায়াতে ইসলামী ও পূর্ব পাকিস্তান থেকে সরকার সুপ্রীম কোর্টে আপীল পেশ করে। আল্লাহর শুকরিয়া, সুপ্রীম কোর্ট জামায়াতে ইসলামীর পক্ষে রায় দেয়। ১৯৬৪ সনের ৯ অক্টোবর জামায়াতে ইসলামীর নেতৃবৃন্দ জেল থেকে মুক্তি পান।

৫৮. প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে মিস ফাতিমা জিন্নাহর প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন

প্রেসিডেন্ট মুহাম্মাদ আইউব খানের অ-গণতান্ত্রিক শাসনে দেশের মানুষের নাভিশ্বাস অবস্থা দেখা দেয়।

১৯৬৫ সনের গোড়ার দিকে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন অনুষ্ঠানের কথা। আশি হাজার মৌলিক গণতন্ত্রীরা ভোটার। এমতাবস্থায় অন্য কারো নির্বাচনে পাস করার সম্ভাবনা ছিলো ক্ষীণ। কিন্তু বিনা চ্যালেঞ্জে প্রেসিডেন্ট আইউব খানকে আবারো প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হতে দেয়া যায় না। এই বিষয়ে ১৯৬৪ সনে বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে মত বিনিময় হয়। ঢাকার নওয়াব পরিবারের সন্তান খাজা নাজিমুদ্দীন এই ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। 'কম্বাইন্ড অপোজিশান পার্টিজ' নামে সরকার বিরোধী একটি রাজনৈতিক ঐক্যজোট গড়ে উঠে।

১৯৬৪ সনের সেপ্টেম্বর মাসে 'কম্বাইন্ড অপোজিশান পার্টিজ' পাকিস্তানের স্থপতি মুহাম্মাদ আলী জিন্নাহর বোন মিস ফাতিমা জিন্নাহকে প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী মনোনীত করে। এই সময় জামায়াতে ইসলামী ছিলো নিষিদ্ধ। সাইয়েদ আবুল আ'লা সহ জামায়াতে ইসলামীর নেতৃবৃন্দ ছিলেন বন্দি।

জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় মাজলিসে শূরার যেই সব সদস্য জেলের বাইরে ছিলেন তাঁরা ১৯৬৪ সনের ২রা অক্টোবর মিটিংয়ে একত্রিত হন। মিস ফাতিমা জিন্নাহকে সমর্থন করা বা না করা সম্পর্কে আলোচনা হয়। আলোচনান্তে

মাজলিসে শূরা অভিমত ব্যক্ত করে যে স্বাভাবিক অবস্থায় একজন মহিলাকে রাষ্ট্র প্রধান করা সমীচীন নয়, কিন্তু দেশে চলছে এক অস্বাভাবিক অবস্থা, স্বৈরশাসক মুহাম্মাদ আইউব খানের বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার ক্ষেত্রে মিস ফাতিমা জিন্নাহর কোন বিকল্প নেই। এমতাবস্থায় সার্বিক অবস্থার নিরিখে জামায়াতে ইসলামী প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে মিস ফাতিমা জিন্নাহকেই সমর্থন করবে।

জামায়াতে ইসলামীর পক্ষে সুপ্রীম কোর্টের রায় ঘোষিত হবার পর ১৯৬৪ সনের ৯ই অক্টোবর সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী জেল থেকে বেরিয়ে আসেন। তিনি জামায়াতে ইসলামীর মাজলিসে শূরার সিদ্ধান্তের সাথে একমত হন।

উল্লেখ্য যে ১৯৬৪ সনের ২২ অক্টোবর খাজা নাজিমুদ্দীন ইন্তিকাল করেন।

এই সময় প্রেসিডেন্ট আইউব খান কয়েকজন উলামা মাশায়েখ থেকে ফাতওয়া হাছিল করেন যে, একজন মহিলা ইসলামী রাষ্ট্রের প্রধান হতে পারেন না। জামায়াতে ইসলামীর সদস্যদের মধ্যেও এইসময় কিছুটা বিভ্রান্তি দেখা দেয়। লাহোরের আমীর কাউসার নিয়াযী বলেন যে, খোদ সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী তাঁর বিভিন্ন বইতে লিখেছেন যে একজন মহিলা ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্র প্রধান হতে পারেন না, এখন কিনা তিনিই একজন মহিলাকে প্রেসিডেন্ট বানাতে চাইছেন। কাউসার নিয়াযী জামায়াতের সদস্যপদ থেকে ইস্তফা দেন।

উলামা মাশায়েখ প্রদত্ত ফাতওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী বলেন, "যাঁরা অভিযোগ করেন যে আমি সুবিধা মতো আমার মত পরিবর্তন করি তাঁদের প্রতি আমার জিজ্ঞাসাঃ ইসলাম কি একজন মহিলাকে মন্ত্রী ও রাষ্ট্রদূত বানাবার অনুমতি দেয়? ইসলাম কি সহশিক্ষার অনুমতি দেয়? ইসলাম কি পুরুষ ও মহিলাদেরকে একই অফিসে পাশাপাশি বসে কাজ করার অনুমতি দেয়? ইসলাম কি মহিলাদেরকে এয়ার হোস্টেস হয়ে পুরুষদের মদ- পরিবেশন করার অনুমতি দেয়? এইগুলো যদি নিষিদ্ধ হয় তাহলে এতোকাল এইসব বিষয়ে আপনারা কথা বলেন কি কেন? আপনারা শুধু একজন মহিলার রাষ্ট্র প্রধান পদপ্রার্থী হওয়ার বিষয়ে ইসলামের ব্যাপারে জাগলেন কেন?" সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী আরো বলেন যে, এটি সু-প্রতিষ্ঠিত যে শারীয়াহর নিরিখে রাষ্ট্র-পরিচালনার দায়িত্ব মহিলাদের নেই, কাজের এই ক্ষেত্রটি পুরুষদেরই। বর্তমান মুহূর্তে একজন মহিলা রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করতে পারেন কি পারেন না- তা বিবেচ্য বিষয় নয়। প্রশ্ন হচ্ছে কিভাবে এমন এক ব্যক্তির ডিকটেটরিয়াল শাসন থেকে জাতিকে মুক্ত করা যায় যিনি ইসলামী মূল্যবোধের অবনতির জন্য দায়ী। আইউব খানের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য আমাদের প্রয়োজন এমন এক

ব্যক্তিকে পাওয়া যিনি জাতির শ্রদ্ধাভাজন। এই প্রেক্ষাপটে আমরা জাতির স্থপতির বোন মিস ফাতিমা জিন্নাহর চেয়ে উত্তম ও অধিক প্রিয় আর কোন ব্যক্তি দেখছি না। আমরা যদি মিস ফাতিমা জিন্নাহর পক্ষে না দাঁড়াই তার অর্থ হয় আইউব খানকে সমর্থন করা। আমাদেরকে দুইটি মন্দের একটি গ্রহণ করতে হবে : হয় আমাদেরকে একজন মহিলাকে সমর্থন করতে হবে, নয়তো সমর্থন করতে হবে একজন অত্যাচারীকে। একজন অত্যাচারীকে সমর্থন করার চেয়ে একজন মহিলাকে সমর্থন করা কম মন্দ। বর্তমান মুহূর্তের বিশেষ অবস্থায় (in the special circumstances) প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে একজন মহিলাকে সমর্থন করা ইসলামের বিরুদ্ধে যাওয়া নয়।'

দ্রষ্টব্য : সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী এন্ড হিজ থট, প্রফেসর মাসুদুল হাসান, ২য় খন্ড পৃষ্ঠা-১৭৯

৫৯. তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানে চতুর্থ সফর

জেল থেকে বেরিয়ে আসার পর সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী তদানীন্তন পশ্চিম পাকিস্তানের করাচী, লাহোর, পেশাওয়ার, সারগোদা প্রভৃতি স্থানে অনুষ্ঠিত জনসভায় ভাষণ দেন। ১৯৬৪ সনের নভেম্বর মাসের শেষের দিকে তিনি ঢাকা আসেন। তিনি ২৭শে নভেম্বর ঢাকার পল্টন ময়দানে অনুষ্ঠিত জনসভায় বক্তব্য রাখেন। তিনি ২রা ডিসেম্বর নোয়াখালীর বেগমগঞ্জ ও ৪ঠা ডিসেম্বর চট্টগ্রামে অনুষ্ঠিত জনসভায় বক্তৃতা করেন।

৬০. ১৯৬৫ সনের প্রেসিডেন্ট নির্বাচন

১৯৬৫ সনের ২রা জানুয়ারী প্রেসিডেন্ট নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। আশি হাজার মৌলিক গণতন্ত্রী ছিলো ভোটার। মিস ফাতিমা জিন্নাহ নির্বাচনে বিজয়ী হলে মৌলিক গণতন্ত্র বিলুপ্ত হবে তা জেনে মৌলিক গণতন্ত্রীদের তাঁকে ভোট দেয়া সহজ ব্যাপার ছিল না। যারা গণতান্ত্রিক মূল্যবোধে বিশ্বাসী, বিবেকবান ও সাহসী কেবলমাত্র তাঁদের পক্ষেই 'কম্বাইন্ড অপোজিশন পার্টিজ'-এর নমিনিকে ভোট দেয়া সম্ভব ছিলো।

এই নির্বাচনে আইউব খান পান ৪৯,৬৪৭ ভোট। মিস ফাতিমা জিন্নাহ পান ২৮,৩৪৫ ভোট। দোর্দন্ড প্রতাপশালী প্রেসিডেন্ট মুহাম্মাদ আইউব খানের নানামুখী চাপ ও চোখ রাঙানী উপেক্ষা করে আটাশ হাজারেরও বেশি মৌলিক গণতন্ত্রী মিস ফাতিমা জিন্নাহকে ভোট দেয়ায় স্পষ্ট বুঝা যাচ্ছিলো দেশের রাজনৈতিক হাওয়া কোন দিকে বইছে। স্বৈরশাসক আইউব খানের বিরুদ্ধে

জনমত সৃষ্টির ক্ষেত্রে সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী ও জামায়াতে ইসলামীর ভূমিকা ছিলো খুবই বলিষ্ঠ।

৬১. ১৯৬৫ সনের যুদ্ধকালে সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদীর ভূমিকা

১৯৬৫ সনের অগাস্ট মাসে ভারত-অধিকৃত জম্মু ও কাশ্মীরের মুক্তি পাগল মানুষেরা ভারতীয় আধিপত্য রুখে দাঁড়ায়। ভারতীয় সৈন্যদের সাথে তারা সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে। আযাদ কাশ্মীর থেকে কিছু সংখ্যক মুজাহিদ জম্মু ও কাশ্মীরের মুক্তিযোদ্ধাদের সাহায্যের জন্য অগ্রসর হয়। এতে ভারতীয় সেনাবাহিনী ভীত হয়ে পড়ে এবং পাকিস্তানের একটি গ্রামে গোলা বর্ষণ করে। ফলে পাকিস্তানের সৈন্যরা আযাদ কাশ্মীরের মুজাহিদদেরকে সাহায্য করার জন্য এগিয়ে যায়।

এই প্রেক্ষাপটে ৬ই সেপ্টেম্বর ভারত যুদ্ধের ঘোষণা না দিয়েই আন্তর্জাতিক সীমানা অতিক্রম করে তিন দিক থেকে লাহোর আক্রমণ করে বসে। ভারতীয় সৈন্যদেরকে মুকাবিলা করার জন্য পাকিস্তানী সৈন্যরা দ্রুত রণাংগনে উপস্থিত হয়। দুই তিন দিনের মধ্যে শিয়ালকোট সেকটার ও সিনধের হায়দারাবাদ সেকটারও ভারতীয় আগ্রাসনের শিকার হয়।

৬ই সেপ্টেম্বর সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী রাওয়ালপিন্ডি ছিলেন। যুদ্ধ শুরু হওয়ার খবর শুনে তিনি লাহোরের পথে রওয়ানা হন। মাঝামাঝি পথে তিনি খবর পান যে প্রেসিডেন্ট মুহাম্মাদ আইউব খান চান সাইয়েদ আবুল আ'লা রাওয়ালপিন্ডিতে ফিরে এসে তাঁর সাথে সাক্ষাত করুন। বিরোধী দলের অন্যান্য যাঁদেরকে প্রেসিডেন্ট ডেকেছিলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন চৌধুরী মুহাম্মাদ আলী, চৌধুরী গোলাম আব্বাস ও নওয়াবজাদা নাসরুল্লাহ্ খান।

প্রেসিডেন্ট যুদ্ধ তৎপরতায় বিরোধী দলগুলোর সহযোগিতা কামনা করেন। চৌধুরী মুহাম্মাদ আলী সর্বাত্মক সহযোগিতার আশ্বাস দেন। চৌধুরী গোলাম আব্বাস কাশ্মীরীদের পক্ষে ভূমিকা রাখায় সরকারের প্রতি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী এই যুদ্ধকে 'জিহাদ' বলে উল্লেখ করেন। তিনি আরো বলেন যে দুশমন বাহিনীকে পরাজিত করার জন্য সরকারের সাথে সহযোগিতা করা পাকিস্তানের প্রতিটি মুসলিমের অবশ্য কর্তব্য। সাইয়েদ আবুল আ'লার বক্তব্যে প্রেসিডেন্ট মুহাম্মাদ আইউব খান খুবই খুশী হন এবং রেডিও পাকিস্তান থেকে 'আল-জিহাদ' সম্পর্কে কয়েকটি বক্তৃতা করার জন্য তাঁকে অনুরোধ জানান।

প্রেসিডেন্ট আইউব খান সাইয়েদ আবুল আ'লার প্রতি দারুণ বিদ্বেষ পোষণ

করতেন। তিনি ও তাঁর মন্ত্রীরা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদীর বিরুদ্ধে মিথ্যা প্রচারণা চালিয়ে ছিলেন। আইউব খানের নির্দেশেই দুইটি প্রাদেশিক সরকার জামায়াতে ইসলামীকে বে-আইনী ঘোষণা করেছিলো। সরকার সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী ও অন্যান্য নেতাকে অন্যায়ভাবে নয় মাস বন্দী জীবন যাপন করতে বাধ্য করেছিলো। কিন্তু জাতির দুর্যোগ মুহূর্তে প্রেসিডেন্ট আইউব খান সহযোগিতার অনুরোধ জানালে সাইয়েদ আবুল আ'লা জাতীয় স্বার্থকে সামনে রেখে অকাতরে সরকারের প্রতি সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেন। জিহাদের জন্য জাতিকে উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে তিনি ১৪, ১৬ ও ১৮ই সেপ্টেম্বর রেডিও পাকিস্তান থেকে ভাষণ দেন।

ভারতের সৈন্য ছিলো পাকিস্তানের সৈন্য সংখ্যার ছয়গুণ বেশি। কিন্তু যুদ্ধে ভারতীয় সৈন্যরা পাকিস্তানের যেই পরিমাণ ভূমি দখল করেছিলো তার চারগুণ বেশি ভারত ভূমি দখল করেছিলো পাকিস্তানী সৈন্যরা। পাকিস্তানী সৈন্যরা চার শত ভারতীয় ট্যাংক ধ্বংস করতে সক্ষম হয়। তারা ভারতের একশত দশটি জংগী বিমান ভূপাতিত করে। পক্ষান্তরে পাকিস্তানের মাত্র ষোলটি জংগী বিমান ধ্বংস হয়। পাকিস্তান নৌ-বাহিনী ভারতীয় নৌ-ঘাঁটি দ্বারকা-তে আক্রমণ চালিয়ে একটি যুদ্ধ জাহাজ ধ্বংস করে। পক্ষান্তরে ভারতীয় নৌ-বাহিনী পাকিস্তানের কোন নৌ-ঘাঁটির কাছে ঘেঁষতে পারেনি।

যুদ্ধকালে পাকিস্তানে এক নীরব সামাজিক বিপ্লব ঘটে যায়। 'আল্লাহু আকবার' ধ্বনিতে পাকিস্তানের আকাশ-বাতাস মুখরিত হয়ে উঠে। একটি ইসলামী প্রেরণা গোটা জাতিকে আলোড়িত করে। মাসজিদে মুছাল্লীর সংখ্যা ব্যাপকহারে বেড়ে যায়। অ-সামাজিক কার্যকলাপ বন্ধ হয়ে যায়। চুরি-ডাকাতি অবিশ্বাস্য রকমের হারে হ্রাস পায়। খুন খারাবী বন্ধ হয়ে যায়। দ্রব্যমূল্য স্থিতিশীল থাকে। জনগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে সৈন্যদেরকে সাহায্য সহযোগিতা করতে থাকে। সরকারী কর্মচারীরা ছুটির দিনেও অফিসে কাজ করে বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন করে।

সন্দেহ নেই, এই নীরব সামাজিক বিপ্লব সৃষ্টির পেছনে সাইয়েদ আবুল আ'লার অবদান ছিলো উল্লেখযোগ্য।

৬২. আযাদ কাশ্মীর সফর

১৯৬৫ সনের নভেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী আযাদ কাশ্মীর সফর করেন। আযাদ কাশ্মীরে এটাই ছিলো তাঁর প্রথম সফর।

২৬শে নভেম্বর আযাদ কাশ্মীরের রাজধানী মুজাফফারাবাদে অবস্থিত

মুজাফ্‌ফারাবাদ কলেজ ময়দানে অনুষ্ঠিত জনসভায় তিনি বক্তৃতা করেন। ২৭শে নভেম্বর তিনি রেডিও মুজাফ্‌ফারাবাদ থেকে কাশ্‌মীরবাসীদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দেন। তিনি ভারত কর্তৃক ন্যায়-নীতি ও আন্তর্জাতিক আইন লংঘনের সমালোচনা করেন। কাশ্‌মীরে গণভোট অনুষ্ঠানের পথে অন্তরায় সৃষ্টি করে আঞ্চলিক শান্তির পথ রুদ্ধ করায় ভারতের তীব্র সমালোচনা করেন।

আযাদ কাশ্‌মীরে অবস্থানকালে যুদ্ধে আহত সৈনিকদের সেবা এবং অধিকৃত জম্মু ও কাশ্‌মীর থেকে আগত হাজার হাজার মুহাজিরের বিভিন্ন প্রয়োজন পূরণের জন্য জামায়াতে ইসলামীর করণীয় নির্ণয় করেন। আযাদ কাশ্‌মীরের দুইটি জিলায় আটটি মেডিকেল সেন্টার কায়েমের ব্যবস্থা করেন। মুহাজিরদের মধ্যে সকল প্রকারের ত্রাণ সামগ্রী পৌঁছাবার পদক্ষেপ গ্রহণ করেন।

৬৩. পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতি বিষয়ে বক্তৃতা

১৯৬৫ সনের ১৭ই ডিসেম্বর ইসলামের অর্থনীতির ওপর বক্তৃতা করার জন্য সাইয়েদ আবুল আ'লা আমন্ত্রিত হন। এই আলোচনা সভায় বিদগ্ধ ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন। সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী ইসলামের দৃষ্টিতে অর্থনীতির বিভিন্ন দিক এমন বিশদভাবে বিশ্লেষণ করেন যে শ্রোতারা বিস্মিত ও মুগ্ধ হন। এই বক্তৃতায় তিনি ইসলামী অর্থনীতির স্বরূপ, যাকাত ব্যবস্থা, সুদবিহীন ব্যাংক, দ্বীনী-অর্থনৈতিক-সামাজিক-রাজনৈতিক সম্পর্ক, ভূমি ব্যবস্থা, শ্রম-পুঁজি-ব্যবস্থাপনার সম্পর্ক, ব্যক্তি মালিকানা, অর্থ-সম্পদ বিনিময়, অর্থ-সম্পদ বন্টন, একচেটিয়া ব্যবসা, মওজুদদারী, একব্যক্তির অর্থ সম্পদে অন্যদের অধিকার ইত্যাদি স্বচ্ছ ও সাবলীলভাবে উপস্থাপন করেন। তাঁর জ্ঞানগর্ভ আলোচনা ইসলামের অর্থনীতি সম্পর্কে শ্রোতাদেরকে সুস্পষ্ট ধারণা দান করে।

৬৪. তাসখন্দ চুক্তির বিরোধিতা

১৯৬৫ সনের পাক-ভারত যুদ্ধ চলেছিলো সতর দিন। রণাংগনে ভারতের দুরবস্থা দেখে ভারতের মিত্ররা সারা দুনিয়ায় তোলপাড় শুরু করে দেয়। পাকিস্তানের ওপর যুদ্ধ বিরতির প্রস্তাব চাপিয়ে দেয়। যুদ্ধ থেমে যায়। জোর কূটনৈতিক তৎপরতা চলতে থাকে ভারতের হৃতগৌরব পুনরুদ্ধারের জন্য।

ভারতের মিত্র রাশিয়ার প্রধানমন্ত্রী এলেকসী কোসিগিনের আহ্বানে ভারতের প্রধানমন্ত্রী লালবাহাদুর শাস্ত্রী ও পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট মুহাম্মদ আইউব খান সংগী-সাথীদের নিয়ে গেলেন তাসখন্দ। ১৯৬৬ সনের ১০ই জানুয়ারী তাঁরা একটি শান্তি চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন।

চুক্তিতে ছিলো, উভয় পক্ষ সু-প্রতিবেশীসুলভ সম্পর্ক গড়ার প্রচেষ্টা চালাবে, পারস্পরিক বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য শক্তি প্রয়োগ করা থেকে বিরত থাকবে, উভয় পক্ষ অধিকৃত এলাকা থেকে সৈন্য সরিয়ে নেবে, একে অপরের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করবে না, একে পক্ষ অপর পক্ষের বিরুদ্ধে প্রচারাভিযান চালাবে না, উভয় দেশের মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্য-যোগাযোগ-সাংস্কৃতিক আদান-প্রদান চালু হবে, যুদ্ধবন্দী বিনিময় হবে, শরণার্থী সমস্যা ও বেআইনী অভিবাসীদের বিষয়ে আলাপ-আলোচনা চালানো হবে ও পারস্পরিক স্বার্থ বিবেচনার জন্য বিভিন্ন যুক্ত কমিটি গঠিত হবে।

সবই ছিলো সেই চুক্তিতে। ছিলো না শুধু কাশ্‌মীর প্রসংগ যাকে কেন্দ্র করে সংঘটিত হলো এতো বড়ো যুদ্ধ। যুদ্ধের ময়দানে জয়লাভ করেও কূটনীতির ময়দানে হেরে গেলো পাকিস্তান। ১৯৬৬ সনের ১৬ই জানুয়ারী জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে একত্রিত হন সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী, চৌধুরী মুহাম্মাদ আলী, নওয়াবজাদা নাসরুল্লাহ খান, চৌধুরী মুহাম্মাদ হুসাইন চাত্তা, মালিক গোলাম জিলানী প্রমুখ বিরোধী দলীয় নেতৃবৃন্দ।

আলোচনান্তে তাঁরা একটি যুক্ত বিবৃতি তৈরি ও প্রকাশ করেন। তাঁরা বলেন যে তাসখন্দ চুক্তিতে কাশ্‌মীর সমস্যার উল্লেখ নেই, কাশ্‌মীর যে একটি বিরোধ-পূর্ণ অঞ্চল তার স্বীকৃতি পর্যন্ত নেই। অথচ স্বাক্ষরিত চুক্তি প্রকৃতপক্ষে একটি যুদ্ধ নয় চুক্তি। তারা এই চুক্তির নিন্দা করেন।

১৯৬৬ সনের ৫ ও ৬ই ফেব্রুয়ারী লাহোরে বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোর বড়ো আকারের একটি কনভেনশান অনুষ্ঠিত হয়। এই কনভেনশানে সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী একটি প্রস্তাব পেশ করেন। এই প্রস্তাবে তাসখন্দ চুক্তির নিন্দা করা হয়, এই চুক্তিকে কাশ্‌মীরের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা বলা হয় এবং বলা হয় জাতি এই চুক্তি প্রত্যাখ্যান করেছে। প্রস্তাবে আরো বলা হয় যে পাকিস্তানের জনগণ কাশ্‌মীরীদের আত্ম-নিয়ন্ত্রণাধিকার আদায়ের সংগ্রাম চালিয়ে যাবে। এই প্রস্তাব সর্ব-সম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

৬৫. তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানে পঞ্চম সফর

সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী ১৯৬৬ সনের ফেব্রুয়ারী মাসের তৃতীয় সপ্তাহে পূর্ব পাকিস্তান সফরে আসেন। এটি ছিলো এই অঞ্চলে তাঁর পঞ্চম সফর। তিনি প্রাদেশিক জামায়াতে ইসলামীর সম্মেলনে যোগদান করেন। তাছাড়া ঢাকা, চট্টগ্রাম, দিনাজপুর, খুলনা প্রভৃতি স্থানে জনসভায় বক্তৃতা করেন। ঢাকা ও চট্টগ্রামে তিনি প্রেস কনফারেন্সেও বক্তব্য রাখেন।

৬৬. প্রায় তিন বছর পর আবার সাউদী আরব সফর

১৯৬৪ সনের ৬ই জানুয়ারী সরকার কর্তৃক জামায়াতে ইসলামী বে-আইনী ঘোষিত হবার আগেই সরকার সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদীর আন্তর্জাতিক পাসপোর্ট বাজেয়াপ্ত করে। ফলে বেশ কয়েক বছর ধরে তিনি রাবিতাতুল আলম আল-ইসলামীর সম্মেলনে অংশ নেবার জন্য মাক্কায় ও মাদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের মিটিংয়ে অংশ নেবার জন্য মাদীনায় যেতে পারেন নি। ১৯৬৫ সনের যুদ্ধ শেষ হবার পর তাঁর পাসপোর্ট ফেরত দেয়া হয়।

১৯৬৬ সনের মার্চের তৃতীয় সপ্তাহে তিনি হাজ পালনের জন্য মাক্কায় আসেন। সাথে নিয়ে আসেন কাশ্মীর সমস্যার ওপর ইংরেজী ও আরবীতে ছাপানো পঞ্চাশ হাজার পুস্তিকা। এই পুস্তিকা দুনিয়ার সকল দেশ থেকে আগত শিক্ষিত ব্যক্তিদের মধ্যে বিতরণ করা হয়।

তিনি রাবিতাতুল আলম-আল ইসলামী কর্তৃক আমন্ত্রিত দুনিয়ার বিভিন্ন দেশ থেকে আগত প্রায় আটশত বিশিষ্ট ব্যক্তির এক সমাবেশে বক্তব্য রাখেন। মাক্কা ও মাদীনায় কর্মমুখর সময় কাটিয়ে তিনি দেশে ফিরেন।

৬৭. অনন্য গ্রন্থ "খিলাফাত ও রাজতন্ত্র" রচনা

১৯৬৬ সনে সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী তাঁর অনবদ্য গ্রন্থ "খিলাফাত ও রাজতন্ত্র" রচনা করেন। এই গ্রন্থে তিনি বিশ্ব প্রকৃতি সম্পর্কে ইসলামের ধারণা, আল্লাহর সার্বভৌমত্ব, আল্লাহর রাসূলের (সা) মর্যাদা, খিলাফাতের তাৎপর্য, রাষ্ট্রের আনুগত্যের সীমা, শূরার গুরুত্ব, উলুল আমরের গুণাবলী, শাসনতন্ত্রের মৌলনীতি, মৌলিক অধিকার, নাগরিকদের ওপর সরকারের অধিকার, ইসলামী রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য, আদল— সকল মানুষের প্রতি সুবিচার, সরকারের কর্তব্য ও জওয়াবদিহিতা, নেতৃত্ব-পদপ্রার্থী হওয়ার নিষিদ্ধতা, গণ-সমর্থনপুষ্ট সরকার, শূরা ভিত্তিক শাসন, বাইতুল মাল একটি আমানাত, আইনের শাসন, খিলাফাতে রাশেদার বৈশিষ্ট, খিলাফাত থেকে রাজতন্ত্রে পরিবর্তন, খিলাফাত ও রাজতন্ত্রের পার্থক্য প্রভৃতি বিষয় অত্যন্ত সুন্দরভাবে উপস্থাপন করেছেন। এই গ্রন্থ ইসলামের রাষ্ট্র-নীতি ও রাজনীতি সম্পর্কে নানাবিধ প্রশ্নের জওয়াব সরবরাহ করেছে। আর দূর করেছে অনেক অনেক অস্পষ্টতা। ইসলামী রাষ্ট্র-চিন্তার ইতিহাসে এই গ্রন্থ একটি মাইলস্টোন।

৬৮. সাইয়েদ আবুল আ'লার চতুর্থ গ্রেফতারী

১৯৬৭ সনের ১১ই জানুয়ারী ছিলো ২৯শে রমাদান। ঐদিন আকাশ ছিলো পরিষ্কার। চাঁদ উঠলে সকল স্থান থেকেই তা দেখা যাবার কথা। কোথাও চাঁদ দেখা যায়নি। ফলে সকলে ত্রিশতম রোযা রাখার জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুতি নেয়। রাতে রেডিও থেকে ঘোষণা হলো যে সীমান্ত প্রদেশের কোন কোন স্থানে চাঁদ দেখা গেছে। অতএব আগামী কাল ঈদ।

সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী বিশিষ্ট কয়েকজন আলেমের সাথে মত বিনিময় করেন। তাঁরা একমত হন যে সীমান্তের কোথাও যদি চাঁদ দেখা গিয়ে থাকে সেখানকার লোক ঈদ করতে পারে কিন্তু অন্যান্য অঞ্চলে আকাশ সম্পূর্ণ মেঘমুক্ত থাকায় ও চাঁদ দেখা না যাওয়ায় এই সব অঞ্চলের লোকেরা ঈদ করতে পারেনা। একদিকে সরকারী ঘোষণা, অন্য দিকে বিশিষ্ট আলিমদের অভিমত। ফলে জনগণের একাংশ ঈদ করেন ১২ই জানুয়ারী ও অপরাংশ করেন ১৩ই জানুয়ারী।

সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী ১৩ই জানুয়ারী লাহোরের গুলবাগে অনুষ্ঠিত ঈদের খুতবায় সরকারের ঘোষণার সমালোচনা করেন। সরকারী ঘোষণা সত্ত্বেও দুই দিন ঈদ হওয়ায় প্রেসিডেন্ট মুহাম্মাদ আইউব খান খুবই বিব্রত বোধ করেন।

সরকারের তল্পীবাহক ডঃ ফজলুর রহমান ঘোষণা করেন যে ঈদ সম্পর্কে সরকারের সিদ্ধান্ত মানা সকল মুসলিমের ওপর বাধ্যতামূলক এবং সরকারী ঘোষণা সত্ত্বেও যারা ঈদ পালন করেন নি তাঁদের শাস্তি হওয়া উচিত। একদল মৌলিক গণতন্ত্রীও প্রেসিডেন্ট মুহাম্মাদ আইউব খানের সাথে সাক্ষাত করে সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদীর বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানায়।

১৯৬৭ সনের ২৯শে জানুয়ারী সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদীকে গ্রেফতার করে পুলিশ ভ্যানে করে বান্নুতে নিয়ে গিয়ে একটি বাংলোতে আটক করে রাখা হয়। এই ইস্যুতে আরো যেই সব বিশিষ্ট আলিম বন্দী হন তাদের মধ্যে ছিলেন মাওলানা ইহতিশামুল হক থানবী, মুফতী মুহাম্মাদ হুসাইন নায়িমী, মাওলানা আযহার হুসাইন যায়িদী ও মাওলানা গোলাম গাউস হাজরাবী।

১৯৬৭ সনের ৩রা মার্চ সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদীর পক্ষে মিঃ এ.কে. ব্রোহী, মিঃ আনোয়ার ও মিঃ জাবিদ ইকবাল হাইকোর্টে রীট পিটিশান দায়ের করেন। স্পষ্টত প্রতীয়মান হচ্ছিলো যে মামলার রায় সরকারের বিপক্ষে যাবে। ফলে ১৫ই মার্চ পুলিস ভ্যানে করে সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদীকে বান্নু থেকে লাহোরে এনে ছেড়ে দেয়া হয়। সাইয়েদ আবুল আ'লা অর্জন করেন আরেকটি নৈতিক বিজয়।

৬৯. 'পাকিস্তান ডিমোক্রেটিক মুভমেন্ট'

তাসখন্দ চুক্তি স্বাক্ষরের পর প্রেসিডেন্ট মুহাম্মাদ আইউব খান ও বিরোধী দলগুলোর মধ্যে আবার দূরত্ব সৃষ্টি হয়। প্রেসিডেন্ট মুহাম্মাদ আইউব খান শাসনতন্ত্র গণতন্ত্রায়নের পথে এগুলেন না। তাঁর শাসনকালের গৌরব-গাঁথা মানুষকে গেলাবার জন্য "উন্নয়ন দশক" পালন করলেন। লাভ কিছুই হলো না। গণ মানুষকে বোকা বানানো গেলোনা। শাসক ও শাসিতের ব্যবধান আরো বেড়ে গেলো।

১৯৬৬ সনের ৬ই ফেব্রুয়ারী লাহোরে বিরোধী দলের নেতৃবৃন্দের সম্মেলনে শেখ মুজীবুর রহমান তাঁর "ছয় দফার" কপি বিতরণ করেন। তিনি নেতৃবৃন্দের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে ব্যর্থ হন। তবে তিনি তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানে "ছয় দফার" প্রতি জন সমর্থন আদায়ের চেষ্টা চালাতে থাকেন।

১৯৬৭ সনের ৩০শে এপ্রিল ঢাকাতে জনাব আতাউর রহমান খানের বাসভবনে জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের জনাব নূরুল আমীন, হামিদুল হক চৌধুরী, আতাউর রহমান খান, মুসলিম লীগের মুমতাজ দওলাতানা, তোফাজ্জল আলী, খাজা খায়ের উদ্দীন, জামায়াতে ইসলামীর মিয়া তুফাইল মুহাম্মাদ, মাওলানা আবদুর রহীম, অধ্যাপক গোলাম আযম, আওয়ামী লীগের নওয়াবজাদা নাসরুল্লাহ খান, আবদুস সালাম খান, গোলাম মুহাম্মাদ খান লুন্দখোর এবং নেজামে ইসলাম পার্টির চৌধুরী মুহাম্মাদ আলী, মৌলভী ফরিদ আহমদ, ও এম আর খান সূচনা করেন "পাকিস্তান ডিমোক্রেটিক মুভমেন্ট"।

উল্লেখ্য যে "পাকিস্তান ডিমোক্রেটিক মুভমেন্ট" (পিডিএম) গঠন প্রশ্নে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়।

মাওলানা আবদুর রশীদ তর্কবাগীশ ও রাজশাহীর মুজীবুর রহমান পরিচালিত আওয়ামী লীগ 'পাকিস্তান ডিমোক্রেটিক মুভমেন্টের' অন্তর্ভুক্ত থাকে। আর শেখ মুজীবুর রহমান ও রাজশাহীর কামারুজ্জামান পরিচালিত আওয়ামী লীগ আলাদাভাবে 'ছয় দফা' ভিত্তিক আন্দোলন চালাতে থাকে।

৭০. তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানে সাইয়েদ মওদূদীর ষষ্ঠ সফর

আইউব খান বিরোধী আন্দোলনকে তীব্রতর করার জন্য পিডিএম নেতৃবৃন্দ সারা দেশ সফর করেন। ১৯৬৭ সনের ২৪শে নভেম্বর অন্যান্য নেতাদের সাথে সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী ঢাকা আসেন। তাঁরা ঢাকা ও চট্টগ্রামের জনসভায় পিডিএম এর আট দফা দাবি ব্যাখ্যা করে বক্তব্য রাখেন।

৭১. তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানে সাইয়েদ মওদূদীর সপ্তম সফর

১৯৬৮ সনের ২১শে ফেব্রুয়ারী সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী ঢাকা আসেন। অতপর তিনি চৌমুহনী সফর করেন ও এক জনসভায় ভাষণ দেন। ২৬শে ফেব্রুয়ারী তিনি ঢাকার ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউটে অনুষ্ঠিত এক সুধী সমাবেশে বক্তব্য রাখেন। ১লা মার্চ তিনি ইসলামী ছাত্র সংঘের সম্মেলনে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা রাখেন।

৭২. সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদীর লন্ডন সফর

বহু বছর আগ থেকেই সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী কিডনীর যন্ত্রণায় ভুগছিলেন। স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটায় তিনি চিকিৎসার জন্য লন্ডন যাবার সিদ্ধান্ত নেন। ১৯৬৮ সনের ২৪শে অগাস্ট তিনি করাচী থেকে লন্ডনের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন ও ২৫শে অগাস্ট লন্ডন পৌঁছেন।

২রা সেপ্টেম্বর তিনি ইউ.কে ইসলামিক মিশনের বার্ষিক সম্মেলনে যোগদান করেন ও দিক-নির্দেশনামূলক বক্তব্য রাখেন।

অতপর তিনি ডাক্তার বেইড নক-এর ক্লিনিকে ভর্তি হন। আনুসঙ্গিক চেক-আপের পর তাঁর মূত্রথলিতে অপারেশন করা হয় ৯ই সেপ্টেম্বর। ২২শে সেপ্টেম্বর বাম কিডনির অপারেশন সম্পন্ন হয়। তিন সপ্তাহ তিনি ক্লিনিকে থাকেন। বেশ কয়েক সপ্তাহ তাঁকে থাকতে হয় লন্ডনে। এই সময় দেশ-বিদেশের বহু ইসলামী ব্যক্তিত্ব তাঁর সাথে সাক্ষাত ও আলাপ করেন। অতপর তিনি দেশে ফিরে আসেন।

৭৩. গণ-বিস্ফোরণের মুখে আইউব খানের নতি স্বীকার ও সাইয়েদ আবুল আ'লার দিক নির্দেশনামূলক ভাষণ

বছরের পর বছর ধরে বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো আইউব খানের স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছিলো।

১৯৬৮ সনের নভেম্বর মাসে পশ্চিম পাকিস্তানে ছাত্ররা ব্যাপকহারে মাঠে নেমে পড়ে। পশ্চিম পাকিস্তানের ছাত্র আন্দোলনের ঢেউ লাগে পূর্ব পাকিস্তানেও।

১৯৬৯ সনের ৭ই জানুয়ারী ঢাকার সকল স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা বিক্ষোভ মিছিল বের করে।

১৯৬৯ সনের ৭ ও ৮ই জানুয়ারী ঢাকাতে অনুষ্ঠিত মিটিংয়ের পর নেজামে ইসলাম পার্টির সভাপতি চৌধুরী মুহাম্মাদ আলী, পাকিস্তান আওয়ামী লীগের (৮ দফা পন্থী) সভাপতি নওয়াবজাদা নাসরুল্লাহ খান, জামায়াতে ইসলামীর ভারপ্রাপ্ত আমীর মিয়া তুফাইল মুহাম্মাদ, ন্যাশনাল ডিমোক্রেটিক ফ্রন্টের সভাপতি নূরুল

আমীন, মুসলিম লীগের সভাপতি মুমতাজ মুহাম্মাদ খান দাওলাতানা, পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের (৬ দফা পন্থী) ভারপ্রাপ্ত সভাপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম, জমিয়তে উলামায়ে ইসলামের সেক্রেটারী জেনারেল মুফতী মাহমুদ ও ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির ভারপ্রাপ্ত সভাপতি আমীর হুসাইন শাহ নিম্নোক্ত আট দফা দাবি আদায়ের লক্ষ্যে গঠন করেন 'ডিমোক্রেটিক এ্যাকশান কমিটি (DAC)

আট দফা—

১. ফেডারেল পার্লামেন্টারী সরকার,

২. প্রাপ্ত বয়স্কদের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে প্রত্যক্ষ নির্বাচন,

৩. অবিলম্বে জরুরী অবস্থা প্রত্যাহার,

৪. নাগরিক স্বাধীনতা পুনর্বহাল ও সকল কালাকানুন বাতিল, বিশেষ করে বিনা বিচারে আটকের আইন ও বিশ্ববিদ্যালয় অর্ডিন্যান্স বাতিল,

৫. শেখ মুজীবুর রহমান, খান আবদুল ওয়ালী খান, জুলফিকার আলী ভুট্টোসহ সকল রাজনৈতিক বন্দী, ছাত্র-শ্রমিক-সাংবাদিক বন্দীদের মুক্তি এবং কোর্ট ও ট্রাইবুনালে দায়েরকৃত মামলা সংক্রান্ত গ্রেফতারী পরোয়ানা প্রত্যাহার,

৬. ১৪৪ ধারার সকল আদেশ প্রত্যাহার,

৭. শ্রমিকদের ধর্মঘট করার অধিকার বহাল,

৮. নতুন ডিক্লারেশনসহ সংবাদপত্রের উপর আরোপিত সকল নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার এবং বাজেয়াপ্ত সকল প্রেস, পত্রিকা ও সাময়িকীর পুনর্বহাল।

৯ই জানুয়ারী লাহোরের ছাত্ররা গণ-মিছিল বের করে। মুলতানের ছাত্রদের ওপর পুলিস হামলা চালায়। ১০ই জানুয়ারী মুলতানের মহিলা কলেজের ছাত্রীরা মিছিলে যোগ দেয়। ১১ই জানুয়ারী রাওয়ালপিন্ডিতে মহিলাদের মিছিল বের হয়।

১২ই জানুয়ারী 'ডিমোক্রেটিক এ্যাকশান কমিটির' ডাকে সারাদেশে হরতাল পালিত হয়। ঐদিনই অবসরপ্রাপ্ত লেঃ জেনারেল মুহাম্মাদ আযম খান শাসনতন্ত্রের গণতন্ত্রায়নের জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানান। ১৩ই জানুয়ারী অবসরপ্রাপ্ত এয়ার মার্শাল আসগার খান বিবৃতি দিয়ে বলেন যে, আইউব সরকারের আর দেশ পরিচালনার অধিকার নেই। ১৭ই জানুয়ারী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পুলিস হামলা চালায়। ১৭ ও ১৮ই জানুয়ারী ঢাকা মহানগরী ছাত্রদের মিছিলের নগরীতে পরিণত হয়। ২০শে জানুয়ারী সরকারী বাহিনীর গুলিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের ছাত্র আসাদুজ্জামান নিহত হয়। ঢাকায় এক বিশাল গণ-মিছিল বের হয়। ২২শে জানুয়ারী রাওয়ালপিন্ডি ও হায়দারাবাদে জনতার ওপর পুলিস

লাঠি চার্জ করে। সেই দিন ঢাকায় প্রায় দশ হাজার ছাত্রের বিক্ষোভ মিছিল বের হয়। ২৭শে জানুয়ারী লাহোর ও করাচীতে সেনাবাহিনী নামিয়ে কারফিউ দেয়া হয়। ২৮শে জানুয়ারী পেশাওয়ার শহর তুলে দেয়া হয় সেনাবাহিনীর হাতে। ৩১শে জানুয়ারী 'ডিমোক্রেটিক এ্যাকশান কমিটির' আহ্বানে সারাদেশে শোক দিবস পালিত হয়।

এইভাবে একের পর এক ঘটতে থাকে ঘটনা। কিছু উগ্রপন্থী গ্রুপ সহিংস কর্মকান্ডও সংঘটিত করে। সরকার দেশের ওপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে। লৌহ-মানব আইউব খান সুস্পষ্ট ভাবে দেখতে পেলেন দেয়ালের লিখন।

১৯৬৯ সনের ১৪ই ফেব্রুয়ারী জুলফিকার আলী ভুট্টোকে মুক্তি দেয়া হয়।

১৯৬৯ সনের ২১শে ফেব্রুয়ারী প্রেসিডেন্ট মুহাম্মাদ আইউব খান জাতির উদ্দেশে এক রেডিও ভাষণ দেন। ভাষণে তিনি বলেন যে তিনি যেই রাজনৈতিক পদ্ধতি চালু করেছিলেন তার উদ্দেশ্য ছিলো দেশের স্থিতিশীলতা ও জনগণের সমৃদ্ধি অর্জন। নিজের ক্ষমতা স্থায়ী করার জন্য তিনি এটি করেন নি। যেহেতু জনগণ সর্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচন চায়, তিনি বিষয়টি নিয়ে সকল রাজনৈতিক দলের সাথে আলোচনা করতে চান। আর, ভুল বুঝাবুঝির অবসানের জন্য তিনি ঘোষণা করেন যে পরবর্তী নির্বাচনে তিনি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন না।
১৯৬৯ সনের ২২শে জানুয়ারী ১৯৬৮ সনের জানুয়ারী মাস থেকে শেখ মুজিবুর রহমানসহ পঁয়ত্রিশ ব্যক্তির বিরুদ্ধে পরিচালিত 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা' প্রত্যাহার করে নেয়া হয়।

১৯৬৯ সনের ২২ ফেব্রুয়ারী রাওয়ালপিন্ডিতে এক ছাত্র-সমাবেশে সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রাখেন। বক্তৃতায় তিনি বলেন যে সামরিক শক্তি বলে ক্ষমতা দখলকারী কোন ব্যক্তিকে নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের মাধ্যমে ক্ষমতাচ্যুত করা কঠিন। পাকিস্তানের জনগণকে আল্লাহ মহা বিজয় দান করেছেন। এদের কর্তব্য আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করা। প্রেসিডেন্ট ঘোষণা করেছেন তিনি আর নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন না। ফলে এখন জনগণের ওপর এক বিরাট দায়িত্ব পড়েছে। এখন তাদের কর্তব্য দেশে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনা। দেশের নেতৃত্ব প্রাপ্ত বয়স্কদের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে পরিবর্তন করা ও একটি দায়িত্বশীল পার্লামেন্ট গঠন করা।

ঐ দিন সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী রাওয়ালপিন্ডিতে জামায়াতে ইসলামীর এক কর্মী সমাবেশেও বক্তব্য রাখেন। বক্তৃতায় তিনি বলেন "দুনিয়াবাসীকে আমরা জানিয়ে দিতে চাই যে পাকিস্তান ইসলামের দুর্গ। এখানে ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা

প্রতিষ্ঠিত হতে হবে। আমরা যেমন একনায়কতন্ত্র বরদাশত করবো না, তেমনি বরদাশত করবো না ভিন্ন কোন মতবাদ।"

৭৪. 'রাউন্ড টেবিল কনফারেন্সে' সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী

১৯৬৯ সনের ২৬শে ফেব্রুয়ারী রাওয়ালপিন্ডিতে 'রাউন্ড টেবিল কনফারেন্স' শুরু হয়। এই কনফারেন্সে প্রেসিডেন্ট মুহাম্মাদ আইউব খানের নেতৃত্বে পনর ব্যক্তি, 'ডিমোক্রেটিক এ্যাকশান কমিটির' পক্ষ থেকে নওয়াবজাদা নাসরুল্লাহ খান, চৌধুরী মুহাম্মাদ আলী, সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী, অধ্যাপক গোলাম আযম, নূরুল আমীন, মুমতাজ মুহাম্মাদ খান দাওলাতানা, খাজা খায়েরুদ্দিন, মুফতী মাহমুদ, পীর মুহসিনুদ্দিন, আবদুস সালাম খান, মৌলভী ফরিদ আহমদ, খান আবদুল ওয়ালী খান, অধ্যাপক মুজাফফর আহমদ, হামিদুল হক চৌধুরী, মাহমুদ আলী, শেখ মুজিবুর রহমান, সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দীন আহমদ এবং নির্দলীয় অবসরপ্রাপ্ত এয়ার মার্শাল আসগার খান ও বিচারপতি এস.এম. মোরশেদ যোগদান করেন। অবসর প্রাপ্ত লেঃ জেঃ মুহাম্মদ আযম খান আমন্ত্রিত ছিলেন। রাওয়ালপিন্ডিতে থাকা সত্বেও তিনি কনফারেন্সে যোগ দেন নি।

পিপলস পার্টির প্রধান জুলফিকার আলী ভুট্টো ও পিকিংপন্থী ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি প্রধান মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করেন।

২৬শে ফেব্রুয়ারী 'রাউন্ড টেবিল কনফারেন্স' শুরু হলেও ঈদুল আযহার জন্য ১০ই মার্চ পর্যন্ত মুলতবী হয়ে যায়। অতপর ১০ই মার্চ থেকে ১৩ই মার্চ পর্যন্ত বৈঠক চলে।

'ডিমোক্রেটিক এ্যাকশান কমিটির' আহ্বায়ক নওয়াবজাদা নাসরুল্লাহ খান আঞ্চলিক স্বায়ত্বশাসন, ফেডারেল পার্লামেন্টারী সরকার পদ্ধতির প্রবর্তন ও প্রাপ্ত বয়স্কদের প্রত্যক্ষ ভোটে আইন পরিষদের নির্বাচনের দাবি জানিয়ে বক্তব্য রাখেন। শেখ মুজিবুর রহমান আঞ্চলিক স্বায়ত্ব শাসন, দুই মুদ্রা প্রবর্তন অথবা একই মুদ্রা রেখে প্রত্যেক অঞ্চলে আলাদা রিজার্ভ ব্যাংক স্থাপন, দেশের পররাষ্ট্রনীতির নিরিখে বৈদেশিক বাণিজ্য ও বৈদেশিক সাহায্য নিগোশিয়েট করার ক্ষমতা আঞ্চলিক সরকারগুলোর হাতে অর্পণ, কর ধার্য ও আদায় করার ক্ষমতা আঞ্চলিক সরকারগুলোর হাতে প্রদান ও কেন্দ্রীয় সরকারকে আঞ্চলিক সরকারগুলোর নিকট থেকে কর আদায়ের ক্ষমতা দান, পশ্চিম পাকিস্তানের এক ইউনিট বাতিল ও সাব-ফেডারেশান গঠন ইত্যাদি বিষয় বিশ্লেষণ করে বক্তব্য রাখেন।

সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী তাঁর বক্তৃতায় বলেন যে, "পাকিস্তান অর্জিত হয়েছিলো ইসলামের নামে, অথচ ইসলামী জীবন বিধান কায়েম করা হয়নি, ফলে

এই দেশ অসংখ্য সমস্যার দেশে পরিণত হয়েছে। জন-প্রতিনিধিরা যদি প্রথমে মুসলিম ও পরে অন্য কিছু হতেন তাহলে সংখ্যা সাম্য, আঞ্চলিক স্বায়ত্বশাসন ও আনুষঙ্গিক অন্য সব বিষয়ের উদ্ভব ঘটতো না। এমন কি ফেডারেল সরকার পদ্ধতিরও প্রয়োজন হতো না। ইসলামের জীবন পদ্ধতি কায়েম হলে সামন্তবাদ ও পুঁজিবাদ সৃষ্ট সকল অন্যায় অবিচার বিদূরিত হতো। শাসনতন্ত্রের কয়েকটি সংশোধনী আমাদেরকে বেশিদূর নিয়ে যেতে পারবে না। প্রয়োজন আইনগত, নৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক সামগ্রিক সংস্কার। এই লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার জন্যই আমরা প্রথমে গণতন্ত্রে উত্তরণ চাই। গণতান্ত্রিক পরিবেশ ও বাক-স্বাধীনতা না থাকলে জনগণকে ইসলামের আলোকে শিক্ষাদান করা কঠিন। যেই সব সমস্যা সমাজকে জর্জরিত করছে তার সমাধান একদিনে সম্ভব নয়। এর জন্য যথেষ্ট সময়ের প্রয়োজন। এই জন্য প্রথমে চাই প্রাপ্ত বয়স্কদের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে সরাসরি নির্বাচন ও ফেডারেল পার্লামেন্টারী সরকার পদ্ধতির প্রবর্তন।"

প্রেসিডেন্ট মুহাম্মাদ আইউব খান ১৩ই মার্চ 'রাউন্ড টেবিল কনফারেন্সের' সমাপ্তি কালে প্রাপ্ত বয়স্কদের ভোটে জনপ্রতিনিধিদের নির্বাচন ও ফেডারেল পার্লামেন্টারী সরকার প্রবর্তনের দাবি মেনে নেয়ার ঘোষণা দেন।

'রাউন্ড টেবিল কনফারেন্সের' পর 'ডিমোক্রেটিক এ্যাকশান কমিটি' প্রেসিডেন্টের ঘোষণা বিবেচনা করার জন্য মিটিং করে। শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর ছয় দফা সমর্থন না করায় পূর্বাহ্নেই 'ডিমোক্রেটিক এ্যাকশান কমিটির' সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেন। মস্কোপন্থী ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির প্রতিনিধি 'ডিমোক্রেটিক এ্যাকশান কমিটির' মিটিংয়ে যোগ দেননি।

আন্দোলনের লক্ষ্য অর্জিত হওয়ায় 'ডিমোক্রেটিক এ্যাকশান কমিটির' বিলুপ্তি ঘোষণা করা হয়।

৭৫. উগ্রপন্থীদের অপ-রাজনীতি

একতান্ত্রিক শাসন থেকে গণতান্ত্রিক শাসনের দিকে অগ্রসর হচ্ছিলো দেশ। উগ্রপন্থীরা এই উজ্জ্বল সম্ভাবনা বিনাশ করে দেয়।

দেশের সর্বত্র ঘেরাও আন্দোলন চলতে থাকে। চলতে থাকে জ্বালাও পোড়াও অভিযান। হত্যা, আগুন লাগানো, নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। সেক্রেটারিয়েটে হরতাল, ছাত্রদের হরতাল, শিক্ষকদের হরতাল ও শ্রমিকদের হরতাল চলতে থাকে। ভিন্ন মতাবলম্বী রাজনীতিবিদদের ওপর হামলা চালানো হয়। আইন শৃঙ্খলার চরম অবনতি ঘটে। প্রশাসন ভেংগে পড়ে। সর্বত্র ত্রাস ও আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। দেশে কোন সরকার আছে বলে মনে হচ্ছিলো না।

৭৬. আবার অ-সাংবিধানিক শাসনের কবলে পাকিস্তান

এই নাজুক অবস্থায় প্রেসিডেন্ট মুহাম্মাদ আইউব খান দেশে সামরিক শাসন জারি করতে চান। সেনা প্রধান জেনারেল আগা মুহাম্মাদ ইয়াহইয়া খান তাঁকে জানিয়ে দেন যে সামরিক শাসন জারি করতে হলে তা করবে সেনাবাহিনী। এই কথার অর্থ বুঝতে প্রেসিডেন্টের কষ্ট হয়নি। ১৯৬৯ সনের ২৪শে মার্চ প্রেসিডেন্ট মুহাম্মাদ আইউব খান এক চিঠির মাধ্যমে সেনা প্রধানকে দেশ পরিচালনার দায়িত্ব ভার গ্রহণ করার অনুরোধ জানান।

১৯৬৯ সনের ২৫শে মার্চ সন্ধা সোয়া সাতটায় জেনারেল আগা মুহাম্মাদ ইয়াহইয়া খান দেশে সামরিক শাসন জারি করেন। তিনি শাসনতন্ত্র বাতিল করেন। জাতীয় পরিষদ ও প্রাদেশিক পরিষদগুলো ভেংগে দেন। প্রকাশ্য রাজনৈতিক তৎপরতার ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপিত হয়। ৩১শে মার্চের এক ঘোষণা অনুযায়ী চীফ মার্শাল ল এডমিনিষ্ট্রেটর জেনারেল আগা মুহাম্মাদ ইয়াহইয়া খান ২৫শে মার্চ সন্ধা সোয়া সাতটা থেকে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্টের দায়িত্বভারও হাতে তুলে নেন। এইভাবে তিনি হন পাকিস্তানের তৃতীয় প্রেসিডেন্ট।

৭৭. সাইয়েদ আবুল আ'লার তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানে অষ্টম সফর

১৯৬৯ সনের ১৪ই জুন সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী ঢাকা আসেন। ১৫ই জুন ঢাকায় ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউটে অনুষ্ঠিত এক সীরাত সম্মেলনে তিনি বক্তব্য রাখেন। দুই সপ্তাহ সফর করে তিনি লাহোর ফিরেন।

৭৮. মরক্কোতে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক শিক্ষা সম্মেলনে যোগদান

১৯৬৯ সনের ১৩ই সেপ্টেম্বর দিবাগত রাতে এয়ার ফ্রান্সের প্লেনে চড়ে সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী প্যারিস রওয়ানা হন। প্যারিস থেকে মরক্কো এয়ার লাইনসের প্লেনে করে তিনি ১৪ই সেপ্টেম্বর রাবাত পৌঁছেন। রাতে রাবাতে অবস্থান করে তিনি ১৫ই সেপ্টেম্বর ফাস পৌঁছেন। এখানেই অনুষ্ঠিত হয় আন্তর্জাতিক শিক্ষা সম্মেলন।

সাইয়েদ আবুল আ'লা খুবই অসুস্থ ছিলেন। তিনি এই সম্মেলনে যেতে চাননি। কিন্তু মরক্কোর শিক্ষামন্ত্রী তাঁকে অনুরোধ জানান। অগত্যা তিনি সফরের প্রস্তুতি নেন। তাঁর সফরসংগী ছিলেন খলীল আহমাদ হামিদী।

আন্তর্জাতিক শিক্ষা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হচ্ছিলো কাইরোয়ান বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে। এই কাইরোয়ান বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো নবম শতাব্দীতে।

অর্থাৎ এগার শত বছর আগে।

এই সম্মেলনে ২০টি দেশের বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদরা যোগদান করেন। সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য পেশ করেন। বক্তৃতায় তিনি বলেন যে, জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতিটি শাখায় উন্নত মানের স্কলার তৈরি করতে হবে যারা হবে মূলত নিষ্ঠাবান মুসলিম। জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাথে ইসলামের নৈতিক মূল্যবোধ সম্পৃক্ত করতে হবে, বিদ্বেষবশত পশ্চিমের প্রাচ্যবিদরা ইসলামের যেই বিকৃত রূপ পেশ করেছে তার মুকাবিলায় ইসলামের আসল রূপ তুলে ধরতে হবে এবং উচ্চ শিক্ষার জন্য মুসলিম দেশগুলো থেকে যেই সব ছাত্র পশ্চিমের দেশগুলোতে যায় তাদেরকে ইসলামবিরোধী চিন্তাধারা থেকে বাঁচিয়ে রাখার ব্যবস্থা করতে হবে।

৭৯. প্রথম ইসলামী শীর্ষ সম্মেলনে যোগদান

১৯৬৯ সনের ২২শে সেপ্টেম্বর মরক্কোর রাজধানী রাবাতে দুনিয়ার মুসলিম দেশগুলোর রাষ্ট্র প্রধান/সরকার প্রধানদের প্রথম শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সন্দেহ নেই, এটি ছিলো বিশ শতকের মুসলিম উম্মাহর জন্য অতীব গুরুত্বপূর্ণ একটি পদক্ষেপ। ইরাক ও সিরিয়া ছাড়া বাকি মুসলিম দেশগুলো এই সম্মেলনে অংশ নেয়।

আন্তর্জাতিক শিক্ষা সম্মেলনে যোগদানের জন্য বিশটি দেশের যেই সব প্রখ্যাত ব্যক্তি মরক্কো এসেছিলেন শীর্ষ সম্মেলনে তাঁদেরকেও আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিলো। সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদীও এই সম্মান লাভ করেন। তবে স্বাস্থ্যের অবনতির কারণে তিনি শীর্ষ সম্মেলনের উদ্বোধনী অধিবেশন ছাড়া আর কোন অধিবেশনে থাকতে পারেননি।

মরক্কো থেকে তিনি লন্ডন পৌছেন ২৩শে সেপ্টেম্বর। ২৪শে সেপ্টেম্বর তিনি ইস্ট লন্ডন মাসজিদে সমবেত মুছাল্লীদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখেন।

লন্ডনে অবস্থানকালে তাঁর মেডিকেল চেক-আপ সম্পন্ন হয়। তিনি ২৭শে সেপ্টেম্বর লন্ডন থেকে রওয়ানা হয়ে ২৮শে সেপ্টেম্বর করাচী পৌছেন। সেখান থেকে রাতে পৌছেন লাহোর।

২৯শে সেপ্টেম্বর তিনি লাহোরে একটি প্রেস কনফারেন্সে বক্তব্য রাখেন। এতে তিনি আন্তর্জাতিক শিক্ষা সম্মেলনের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেন এবং বলেন যে শিক্ষা সম্মেলনের প্রধান প্রস্তাবে মুসলিম দেশগুলোতে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

ইসলামী শীর্ষ সম্মেলন সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে তিনি বলেন যে যদি নিয়মিতভাবে এই শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হতে থাকে তাহলে এক সময় তা 'মুসলিম ইউনাইটেড নেশানসে' পরিণত হতে পারে।

৮০. সাউদী আরবে সর্বশেষ সফর

১৯৬৯ সনের অকটোবর মাসে সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী রাবিতাতুল-আলম-আল ইসলামীর মিটিংয়ে যোগদান করার জন্য সাউদী আরব আসেন। মিটিংয়ে যোগদান, বিভিন্ন ব্যক্তিদের সাথে সাক্ষাত, মাক্কা ও মাদীনায় পালনীয় কাজগুলো সম্পন্ন করে তিনি দেশে ফিরেন ৩১শে অকটোবর।

৮১. তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানে সাইয়েদ আবুল আ'লার নবম সফর

ইতিমধ্যে প্রেসিডেন্ট আগা মুহাম্মাদ ইয়াহইয়া খান ঘোষণা করেন যে ১৯৭০ সনের অকটোবর মাসে দেশে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। ১৯৭০ সনের পহেলা জানুয়ারী প্রকাশ্য রাজনৈতিক তৎপরতা চালানোর ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেয়া হয়। ৪ঠা জানুয়ারী এক বিবৃতির মাধ্যমে সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী সরকারের এই সিদ্ধান্তকে অভিনন্দিত করেন।

১৯৭০ সনের ১৭ই জানুয়ারী সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী ঢাকা পৌছেন। ১৮ই জানুয়ারী পল্টন ময়দানে তাঁর বক্তৃতা করার কথা। যথাসময়ে জামায়াতে ইসলামীর স্থানীয় নেতৃবৃন্দ জনসভার কাজ শুরু করেন। ইসলাম' বিদ্বেষী একটি রাজনৈতিক দল এই জনসভা পন্ড করার সিদ্ধান্ত নেয়। লাঠি হাতে ও ইট পাটকেল নিয়ে গ্রুপে গ্রুপে সেই দলের কর্মীরা বিভিন্ন দিক থেকে পল্টন ময়দানে ঢুকে জনসভার ওপর হামলা চালায়। জামায়াতে ইসলামীর কর্মীরা এই হামলা ঠেকাবার চেষ্টা করে। দীর্ঘ সময় ধরে চলে ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া। একের পর এক আহত হতে থাকে জামায়াতে ইসলামীর কর্মীরা। আহতের সংখ্যা পাঁচশত ছাড়িয়ে যায়। দুইজন ছাত্র শাহাদাতবরণ করেন। ঢাকার জিলা প্রশাসক ছিলেন একজন কাদিয়ানী। তিনি পুলিস পাঠালেন বটে। তারা ঠায় দাঁড়িয়ে থাকে। লাঠিধারীরা জনসভা ভেংগে দিতে সক্ষম হওয়ার পর পুলিসকে সক্রিয় হতে দেখা গেছে। নির্দিষ্ট সময়ে সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী পল্টন ময়দানের গেটে পৌছেন। অবস্থার নাজুকতা লক্ষ্য করে ড্রাইভার তাঁকে তাঁর অবস্থান স্থলে ফিরিয়ে নিয়ে যায়। ২১শে জানুয়ারী তিনি করাচী পৌছেন।

৮২. তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানে সাইয়েদ আবুল আ'লার দশম ও সর্বশেষ সফর

১৯৭০ সনের ২৮শে জুন সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী দশম বারের মতো তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তান সফর করেন। এটাই ছিলো পূর্ব পাকিস্তানে তাঁর সর্বশেষ

সফর। এই সফরে এসে আসন্ন নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য নমিনি তালিকা চূড়ান্ত করতে তিনি পার্লামেন্টারী বোর্ডের মিটিংয়ে যোগ দেন। ঢাকার এক কর্মী সমাবেশেও তিনি বক্তব্য রাখেন। ৩রা জুলাই তিনি লাহোর ফিরে যান।

৮৩. সাইয়েদ মওদূদীকে হত্যার উদ্যোগ

সারগোদা জিলার জাওহারাবাদে সমাজতান্ত্রিক মনোভাবাপন্ন কয়েকজন আলিম এক জনসভায় সাইয়েদ আবুল আ'লার বিরুদ্ধে বিষোদগার করে বক্তৃতা করেন। তাঁরা তাঁকে সাহাবীদের শান বিনষ্টকারী হিসেবে আখ্যায়িত করে শ্রোতাদেরকে তাঁর প্রতি বিরূপ মনোভাবাপন্ন করে তোলার চেষ্টা চালান। তাঁদের বক্তব্য সত্য মনে করে জাওহারাবাদের এক যুবক খুবই বিক্ষুব্ধ হয়। সে সিদ্ধান্ত নেয় যে সাইয়েদ আবুল আ'লাকে হত্যা করতে হবে।

সেই যুবকের নাম ছিলো জাহিদ ইকবাল। দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে সে জাওহারাবাদ থেকে লাহোর আসে। সে সাথে নিয়ে আসে একটি ধারালো ছোরা। সে যখন ৫-এ যাইলদার পার্কে পৌঁছে তখন ছালাতুল আছরের সময় হয়ে গেছে। সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী বাসা থেকে বেরিয়ে এসে ছালাতুল আছরের ইমামত করেন। জাহিদ ইকবালও জামায়াতে শরিক হয়। ছালাতুল আছরের পর সাইয়েদ আবুল আ'লা বাড়ির চত্বরে সাজানো অনেকগুলো চেয়ারের একটিতে বসে পড়েন। অন্যরা চেয়ার নিয়ে তাঁকে ঘিরে বসে পড়ে।

জাহিদ ইকবাল সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদীর পেছনে দাঁড়িয়ে তার লুক্কায়িত ছোরার বাঁট চেপে ধরে। এমন সময় তার দৃষ্টি পড়ে সাইয়েদের পূর্ণ চেহারার ওপর। তার মনে খানিকটা ভাবান্তর সৃষ্টি হয়। সে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার সিদ্ধান্ত নেয়। শ্রোতাদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করলো, "সমাজতন্ত্রী গ্রুপের আলিমরা আপনাকে গালমন্দ করে, আপনি কেন তাদের জওয়াব দেন না?" সাইয়েদ আবুল আ'লা উত্তর দেন, "শেষাবধি সত্যই বিজয়ী হয়, আমি যা লিখেছি তার পক্ষে যুক্তি প্রমাণও পেশ করেছি। গালির বদলে পালি দেয়া ইসলামের বিধান নয়। এবং জনগণ তাদের বিবেক ব্যবহার করে দেখবে সত্য কোথায় অবস্থান করছে।" এই সব কথা শুনার পর জাহিদ ইকবালের বিবেক জেগে উঠে। সে অনুভব করতে শুরু করে যে সত্য তো এখানে। তাঁকে যারা গালমন্দ করছে তাঁরাই মিথ্যাচারী।

হঠাৎ জাহিদ ইকবাল বসে পড়ে সাইয়েদ আবুল আ'লার পা জড়িয়ে ধরে। সাইয়েদ মওদূদী তাকে টেনে তুলে সে এমনটি করছে কেন জানতে চান। জাহিদ ইকবাল বললো, "আপনি আমাকে ক্ষমা করুন, আমি আপনাকে হত্যা করতে

এসেছিলাম।" সাইয়েদ মওদূদী বললেন, "এই তো আমি, তুমি তোমার কর্তব্য পালন করতে পার।"

কয়েকজন লোক ছুটে আসেন জাহিদ ইকবালকে পাকড়াও করতে। সাইয়েদ আবুল আ'লা তাঁদেরকে থামিয়ে দেন। জাহিদ ইকবালের বিমর্ষ চেহারার দিকে তাকিয়ে সাইয়েদ আবুল আ'লা বললেন, "মনে হচ্ছে তুমি দুপুরের খাওয়া খাওনি।" তার জন্য খাবারের ব্যবস্থা করা হলো। জাহিদ ইকবাল এসেছিলো সাইয়েদ আবুল আ'লাকে হত্যা করতে। সত্যের সাথে পরিচিতি হয়ে সে শামিল হয় সাইয়েদ আবুল আ'লার সহকর্মীদের কাতারে।

৮৪. ১৯৭০ সনের নির্বাচনী মেনিফেস্টো ঘোষণা

১৯৭০ সনের সাধারণ নির্বাচনের আগে শেখ মুজীবুর রহমান তাঁর ছয় দফার প্রতি সমর্থন আদায়ের জন্য পূর্ব পাকিস্তান চষে বেড়াতে থাকেন। মস্কোপন্থী ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির খান আবদুল ওয়ালী খান ও অধ্যাপক মুযাফফর আহমাদ 'সমাজতন্ত্রের' পক্ষে জনমত সৃষ্টির চেষ্টা চালাতে থাকেন। পশ্চিম পাকিস্তানে পিপলস পার্টির নেতা জুলফিকার আলী ভুট্টো জোরেসোরে বলতে লাগলেন যে পাকিস্তানে 'ইসলামী সমাজতন্ত্র' কায়েম করতে হবে। পিকিং পন্থী ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির নেতা মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীও আওয়াজ তুললেন যে পাকিস্তানে 'ইসলামী সমাজতন্ত্র' কায়েম করতে হবে। মাওলানা ভাসানী নির্বাচন বয়কট করে জনগণের উদ্দেশ্যে আহ্বান জানালেন, "তোমরা যদি বাঁচতে চাও হাতিয়ার হাতে তুলে নাও।" সরদার আবদুল কাইউম খান, মিয়া মুমতাজ মুহাম্মাদ খান দাওলাতানা প্রমুখ মুসলিম জাতীয়তাবাদের পতাকাবাহী রূপে প্রচার কাজ চালাতে থাকেন। সাইয়েদ আবুল আ'লার নেতৃত্বে জামায়াতে ইসলামী পাকিস্তানকে ইসলামী কল্যাণ রাষ্ট্রে পরিণত করার লক্ষ্যে জনসমর্থন আদায়ের চেষ্টা চালাতে থাকে। নির্বাচনের পূর্বে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতাকে রেডিও ও টেলিভিশনে বক্তৃতা করার সুযোগ দেয়া হয়। ১৯৭০ সনের ৩রা নভেম্বর সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী রেডিও ও টেলিভিশনের মাধ্যমে জামায়াতে ইসলামীর নির্বাচনী মেনিফেস্টো জনগণের সামনে পেশ করেন।

৮৫. তাফসীর তাফহীমুল কুরআন সমাপ্তকরণ

লেখার জগতে সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদীর শ্রেষ্ঠ অবদান তাফসীর তাফহীমুল কুরআন। তিনি ইসলামী দাওয়াতের গাইড বুক আল কুরআনের তাফসীর প্রাঞ্জল ভাষায় তথ্য সমৃদ্ধ ও আকর্ষণীয় রূপে উপস্থাপন করেন। তাফসীর তাফহীমুল

কুরআন তাঁর ত্রিশ বছরের অধ্যয়ন ও গবেষণার ফসল। প্রধানত ভবিষ্যত জেনারেশানকে সামনে নিয়েই তিনি এই তাফসীর লেখেন। তিনি বলতেন, "তাফহীমুল কুরআন লেখার কাজ আমার ওপর ভবিষ্যত প্রজন্মের হক বলে মনে করি।"

তিনি ১৯৪২ সনের ফেব্রুয়ারী মাসে এই তাফসীর লেখার কাজ শুরু করেন। শেষ করেন ১৯৭২ সনের জুন মাসে।

৮৬. আমীর পদ থেকে অব্যাহতি গ্রহণ

সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদীর স্বাস্থ্যের অবস্থা ক্রমশই অবনতির দিকে যেতে থাকে। আমীর হিসেবে বহুমুখী কার্যক্রমে অংশ নেয়া তাঁর পক্ষে কঠিন হয়ে পড়ে। ১৯৭২ সনে তিনি আমীর পদ থেকে অব্যাহতি নেন। ১৯৭২ সনের ২রা নভেম্বর মিয়া তুফাইল মুহাম্মাদ জামায়াতে ইসলামী পাকিস্তানের আমীর নির্বাচিত হন।

৮৭. দ্বিতীয় ইসলামী শীর্ষ সম্মেলনে মেমোরেন্ডাম পেশ

১৯৭১ সনে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের অভ্যুদয় হওয়ার পর পাকিস্তানের তৃতীয় প্রেসিডেন্ট আগা মুহাম্মাদ ইয়াহইয়া খান পদত্যাগ করেন এবং পাকিস্তানের চতুর্থ প্রেসিডেন্ট হন জুলফিকার আলী ভুট্টো।

১৯৭৩ সনে পাকিস্তানের শাসনতন্ত্রে বড়ো রকমের পরিবর্তন আনা হয়। এর অধীনে চৌধুরী ফজলে ইলাহী পাকিস্তানের পঞ্চম প্রেসিডেন্ট ও জুলফিকার আলী ভুট্টো প্রধানমন্ত্রী হন।

১৯৭৪ সনের ফেব্রুয়ারী মাসে পাকিস্তানের লাহোরে অনুষ্ঠিত হয় দ্বিতীয় ইসলামী শীর্ষ সম্মেলন। মুসলিম দেশগুলোর রাষ্ট্রপ্রধান / সরকার প্রধানগণ এই সম্মেলনে যোগ দান করেন। এই শীর্ষ সম্মেলনে সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী একটি মেমোরেন্ডাম পেশ করেন। এই মেমোরেন্ডামে তিনি যেইসব বিষয়ের প্রতি দুনিয়ার মুসলিম নেতৃবৃন্দের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন সেইগুলো হচ্ছে–

১. মুসলিম দেশগুলোর সম্মিলিতভাবে ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা উদ্ভাবন।
২. মুসলিম দেশগুলোতে আরবী ভাষাকে কমন আন্তর্জাতিক ভাষা হিসেবে গ্রহণ।
৩. সমরাস্ত্র উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন।
৪. মুসলিম দেশগুলোর পারস্পরিক বিরোধ নিজেরাই মেটানো।
৫. মুসলিম দেশগুলো মিলে একটি কমন নিউজ এজেন্সী গঠন।

৬. মুসলিম দেশগুলোতে মুসলিমদের সহজ গমনাগমনের জন্য ভিসার কড়াকড়ি কমানো।
৭. আফ্রিকার মুসলিমদের খৃস্টানদের কর্তৃত্বমুক্ত হওয়ার প্রয়াসের প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন।
৮. অ-মুসলিম দেশগুলোর মুসলিম নাগরিকদের অধিকার সংরক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ।
৯. পশ্চিমা দেশগুলোতে অধ্যয়নরত মুসলিম ছাত্রদের জন্য নিজস্ব ছাত্রাবাসের ব্যবস্থা করণ।
১০. শক্তিশালী রেডিও ষ্টেশান স্থাপন করে মুসলিম স্বার্থ সংশ্লিষ্ট প্রোগ্রাম উপস্থাপন।
১১. মুসলিমদের একটি আন্তর্জাতিক ব্যাংক প্রতিষ্ঠা।
১২. ফিলিস্তিন ও কাশ্মীরের মুসলিমদের প্রতি বলিষ্ঠ সমর্থন প্রদান।

এই মেমোরেন্ডাম সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদীর গভীর চিন্তা, সূক্ষ্ম দৃষ্টি ও দূরদৃষ্টির সাক্ষ্য বহন করে।

৮৮. ইউনাইটেড ষ্টেটস অব আমেরিকাতে প্রথম সফর

সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদীর দ্বিতীয় ছেলে ডাঃ আহমাদ ফারুক মওদূদী ইউনাইটেড ষ্টেটস অব আমেরিকার বাফেলো সিটিতে কর্মরত ছিলেন। তাঁর অনুরোধে চিকিৎসার জন্য সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী সেখানে যেতে সম্মত হন।

১৯৭৪ সনের এপ্রিল মাসে তিনি সস্ত্রীক বাফেলো পৌছেন। চিকিৎসার ফাঁকে ফাঁকে বিভিন্ন ইসলামী ব্যক্তিদের সাথে তাঁর ব্যক্তিগত ও গ্রুপ ভিত্তিক সাক্ষাত ও আলাপ চলতে থাকে। কানাডার টরোন্টোতেও তাঁকে যেতে হয়। সেখানে মুসলিমদের একটি সম্মেলনে তিনি বক্তব্য রাখেন। কয়েক মাস ইউনাইটেড ষ্টেটস অব আমেরিকাতে অবস্থানের পর তিনি দেশে ফিরেন।

৮৯. পাকিস্তানের রাজনৈতিক মঞ্চে জেনারেল মুহাম্মাদ জিয়াউল হকের আগমন

গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত হলেও প্রধানমন্ত্রী জুলফিকার আলী ভুট্টোর সরকার জনগণের ওপর ডিকটেটোরিয়াল শাসন চালাতে থাকে। এতে জনগণ বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো জোটবদ্ধ হয়ে ভুট্টো সরকারের

বিরোধিতা করতে থাকে। গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সাথে সমঝোতা না করে মিঃ ভুট্টো দমন নীতি চালাতে থাকেন। দেশ দারুণভাবে অশান্ত হয়ে উঠে।

এই প্রেক্ষাপটে ১৯৭৭ সনের ৪ঠা জুলাই সেনাপ্রধান জেনারেল মুহাম্মাদ জিয়াউল হক ক্ষমতা দখল করেন। ১৯৭৭ সনের ১৬ই সেপ্টেম্বর প্রেসিডেন্ট চৌধুরী ফজলে ইলাহী পদত্যাগ করেন। পাকিস্তানের ষষ্ঠ প্রেসিডেন্ট হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন জেনারেল মুহাম্মাদ জিয়াউল হক। তিনি ঘোষণা করেন যে পাকিস্তান ইসলামের নামে অর্জিত হয়েছে, অতএব তিনি ইসলামী বিধান প্রবর্তনের পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন।

৯০. সাইয়েদ আবুল আ'লার কিং ফায়সাল এওয়ার্ড লাভ

১৯৭৯ সনে সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী কিং ফায়সাল এওয়ার্ডে ভূষিত হন। এটি ছিলো তাঁকে প্রদত্ত অনন্য সম্মান। পুরস্কার হিসেবে প্রাপ্ত সমুদয় অর্থ তিনি ইসলামী গবেষণা কাজে ব্যয় করার জন্য দান করে দেন।

৯১. ইন্তিকাল

সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী হাঁটু ও কোমরের ব্যথায় ভুগছিলেন। আরো ভুগছিলেন পেটের ব্যথায়।

১৯৭৯ সনের মধ্যভাগে ডাঃ আহমাদ ফারুক মওদূদী দেশে এসে তাঁর আব্বাকে চিকিৎসার জন্য ইউনাইটেড স্টেটস অব আমেরিকাতে যেতে পীড়াপীড়ি করতে থাকেন। অবশেষে সাইয়েদ আবুল আ'লা তাঁর স্ত্রীসহ ছেলের সাথে আমেরিকা পৌঁছেন। ২০শে অগাস্ট বাফেলোর একটি হাসপাতালে তাঁর মেডিকেল চেক আপ শুরু হয়। ৪ঠা সেপ্টেম্বর তাঁর পেটের আলসার অপারেশান করা হয়। তিনি বেশ সুস্থ হয়ে উঠছিলেন।

৬ই সেপ্টেম্বর হঠাৎ তাঁর হার্ট এটাক হয়। তাঁকে মিলার ফ্লাওয়ার হসপিটালে স্থানান্তরিত করা হয়। পরবর্তী দুই সপ্তাহে তিনি বেশ কয়েকবার হার্ট এটাকের সম্মুখীন হন। ক্রমশ তাঁর জীবনী শক্তি নিঃশেষ হয়ে আসে।

১৯৭৯ সনের ২২শে সেপ্টেম্বর সকালে তিনি ইন্তিকাল করেন। ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিলো ৭৬ বছর।

তাঁর ইন্তিকালের খবর পৃথিবীর বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে পড়ে। দুনিয়ার ইসলামী আন্দোলনের নেতা ও কর্মীরা তাঁদের মনের গভীরে দারুণ শূন্যতা অনুভব করেন। প্রাণ ভরে তাঁরা তাঁর জন্য দুআ করতে থাকেন আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের সমীপে।

বাফেলোতে তিনবার জানাযার নামায অনুষ্ঠিত হয়। একটি চার্টার্ড বিমানে করে তাঁর লাশ আনা হয় নিউইয়র্ক। কেনেডী আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে জানাযার নামায অনুষ্ঠিত হয়। প্যান এমেরিকান এয়ার লাইনসের বিমানে করে নিউইয়র্ক থেকে লাশ লন্ডনের হিথ্রো এয়ারপোর্টে আনা হয়। এখানেও অনুষ্ঠিত হয় জানাযার নামায। অতপর ২৬শে সেপ্টেম্বর পাকিস্তান ইন্টারন্যাশনাল এয়ার লাইনসের একটি বিমানে করে তাঁর লাশ আনা হয় পাকিস্তানের করাচী এয়ারপোর্টে। এখানেও জানাযার নামায অনুষ্ঠিত হয়। ঐ দিনই বিকেলে লাশ পৌঁছে লাহোর। সাত মাইল লম্বা মিছিলের সাথে লাশ পৌঁছে গন্তব্যস্থলে।

২৬শে সেপ্টেম্বর সকাল ১০টায় পাকিস্তানের বৃহত্তম ষ্টেডিয়াম লাহোরের গাদাফী ষ্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হয় সর্বশেষ জানাযা। জানাযার নামাযে শরীক হওয়ার জন্য পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জেনারেল মুহাম্মাদ জিয়াউল হক বিমানযোগে রাওয়ালপিন্ডি থেকে লাহোর পৌঁছেন। মাক্কার মাসজিদুল হারামের ইমাম শায়খ মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ বিন সুবাইল গাদাফী ষ্টেডিয়ামে জানাযার নামাযে ইমামত করার কথা ছিলো। অনিবার্যকারণে তাঁর যাত্রা বিলম্বিত হয়। ফলে কাতার বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ ইউসুফ আবদুল্লাহ আল কারদাভী ইমামত করেন। পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জেনারেল মুহাম্মাদ জিয়াউল হক ছাড়াও জানাযায় অংশগ্রহণকারী বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে ছিলেন সাউদী আরবের রাষ্ট্রদূত, জর্দানের রাষ্ট্রদূত, ইরানের স্বরাষ্ট্র সচিব, ওয়ার্ল্ড এসেম্বলী অব মুসলিম ইয়ুথ-এর অন্যতম নেতা ডঃ আহমাদ তুতুনজী, সিরিয়ার সেরা ইসলামী চিন্তাবিদ শায়খ সাঈদ হাওয়া ও শায়খ আদনান সা'দুদ্দীন, কুয়েতের শায়খ আবদুল্লাহ আল আকীল, শায়খ মুবারাক ও শায়খ আবদুল আযীয আলী আল মুতাওয়া, মিসরের ডঃ কামাল ও শায়খ হাসানুল বান্নার পুত্র সাঈফুল ইসলাম, জামায়াতে ইসলামী হিন্দের আমীর মাওলানা ইউসুফ, পাকিস্তানের বিশিষ্ট আলিম মুফতী মাহমুদ, রাজনীতিবিদ নওয়াবজাদা নাসরুল্লাহ খান, সরদার শাওকাত হায়াত খান, চৌধুরী জহুর ইলাহী, খাজা খাইরুদ্দীন, আল্লামা ইহসান ইলাহী জহীর প্রমুখ, আযাদ কাশ্মীরের সাবেক প্রেসিডেন্ট সরদার আবদুল কাইউম খান এবং জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ-এর ভারপ্রাপ্ত আমীর আব্বাস আলী খান। প্রায় তিন লাখ লোক জানাযায় শরীক হন।

৫-এ যাইলদার পার্কে সাইয়েদ আবুল আ'লার বাসগৃহের সম্মুখস্থ সবুজ চত্বরের একটি কোণে তাঁকে দাফন করা হয়।

বিভিন্ন বিষয়ে
সাইয়েদ মওদূদীর অভিমত

বিষয়সমূহ

১। আল কুরআন

সূক্ষ্মদর্শী সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (রহ) আলকুরআনকে ইসলামী আন্দোলনের গাইড বুক হিসেবে উপস্থাপন করেছেন। বস্তুত এটাই হচ্ছে আলকুরআনের প্রধান পরিচয়।

"কুম ফা আনযির ওয়া রাব্বাকা ফাকাব্বির"– উঠ, লোকদেরকে সাবধান কর এবং তোমার রবের বড়ত্ব-শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ ও প্রতিষ্ঠা কর– এই নির্দেশের মাধ্যমে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহকে (সা) আন্দোলনে নামিয়ে দেন। এই আন্দোলন সামনে এগুতে থাকে। উদ্ভব ঘটতে থাকে নতুন নতুন পরিস্থিতির। এই সব পরিস্থিতিতে প্রয়োজনীয় বক্তব্যসহ অংশ অংশ করে নাযিল হতে থাকে আলকুরআন।

সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী বলেন :

"একটি দাওয়াতের বাণী নিয়ে আলকুরআন নাযিল হওয়া শুরু হয়। দাওয়াত শুরু হওয়ার পর থেকে তার পূর্ণতার চূড়ান্ত মানযিলে পৌঁছা পর্যন্ত পূর্ণ তেইশ বছরে তাকে যেইসব পর্যায় ও স্তর অতিক্রম করতে হয় সেইগুলোর বিভিন্ন ও বিচিত্র প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে আলকুরআনের বিভিন্ন অংশ নাযিল হতে থাকে।"

দ্রষ্টব্য : ভূমিকা, তাফহীমুল কুরআন, সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী, পৃষ্ঠা-২৪

তিনি আরো বলেন :

"যেই কাজ করার বিধান ও নির্দেশ নিয়ে আলকুরআন এসেছে কার্যত ও বাস্তবে তা না করা পর্যন্ত কেউ আলকুরআনের প্রাণসত্তার সাথে পুরোপুরি পরিচিত হতে পারে না। এটি নিছক কোন মতবাদ ও চিন্তাধারার বই নয়। কাজেই আরাম-কেদারায় বসে এই বই পড়লে এর সব কথা বুঝতে পারার কথা নয়।

দুনিয়ার প্রচলিত ধর্ম-চিন্তা অনুযায়ী এটি নিছক একটি ধর্মগ্রন্থও নয়। ...এটি একটি দাওয়াত ও আন্দোলনের কিতাব। এটি এসেই একজন নীরব প্রকৃতির সৎ ও সত্যনিষ্ঠ মানুষকে নিঃসঙ্গ ও নির্জন জীবন-ক্ষেত্র থেকে বের করে এনে আল্লাহ-বিরোধী দুনিয়ার মুকাবিলায় দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। তাঁর কণ্ঠে যুগিয়েছে বাতিলের বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিবাদের ধ্বনি। যুগের কুফর, ফিসক ও ভ্রষ্টতার পতাকাবাহীদের বিরুদ্ধে তাঁকে প্রচণ্ড সংঘাতে লিপ্ত করেছে। সচ্চরিত্রসম্পন্ন সত্যনিষ্ঠ লোকদেরকে প্রতিটি গৃহাভ্যন্তর থেকে খুঁজে বের করে এনে সত্যের

আহ্বায়কের পতাকাতলে সমবেত করেছে। দেশের প্রতিটি এলাকার ফিতনাবাজ ও বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদেরকে বিক্ষুব্ধ ও উত্তেজিত করে সত্যানুসারীদের সাথে তাদের যুদ্ধ বাঁধিয়ে দিয়েছে। এক ব্যক্তির আহ্বানের মাধ্যমে নিজের কাজ শুরু করে হুকুমাতে ইলাহীয়ার প্রতিষ্ঠা পর্যন্ত পূর্ণ তেইশ বছর ধরে এই কিতাবটি এই বিরাট ও মহান ইসলামী আন্দোলনের নেতৃত্ব দান করেছে। হক ও বাতিলের এই সুদীর্ঘ ও প্রাণান্তকর সংঘর্ষকালে প্রতিটি মানযিল ও প্রতিটি পর্যায়েই এটি একদিকে ভাঙ্গার পদ্ধতি শিখিয়েছে, অন্যদিকে পেশ করেছে গড়ার নকশা। এখন বলুন, আপনি যদি ইসলাম ও জাহিলিয়াত এবং দীন ও কুফরের সংগ্রামে অংশ গ্রহণই না করেন, যদি এই দ্বন্দ্ব ও সংঘাতের মানযিল অতিক্রম করার সুযোগই আপনার না হয়, তাহলে শুধু আলকুরআনের শব্দগুলো পাঠ করলেই তার পুরো তত্ত্ব আপনার নিকট কেমন করে উদ্‌ঘাটিত হবে? আলকুরআনকে পুরোপুরি অনুধাবন করা তখনই সম্ভব, যখন আপনি নিজেই আলকুরআনের দাওয়াত নিয়ে উঠবেন, মানুষকে আল্লাহর দিকে আহ্বান করার কাজ শুরু করবেন এবং এই কিতাব যেইভাবে পথ দেখায় সেইভাবেই পদক্ষেপ নেবেন। একমাত্র তখনই আলকুরআন নাযিলের সমকালীন অভিজ্ঞতা আপনি লাভ করতে সক্ষম হবেন। মাক্কা, হাবশাহ ও তায়েফের মানযিলও আপনি দেখবেন। বদর, উহুদ থেকে শুরু করে হুনাইন ও তাবুকের মানযিলও আপনার সামনে এসে যাবে। আপনি আবু জাহাল ও আবু লাহাবের মুখোমুখি হবেন। মুনাফিক ও ইহুদীদের সাক্ষাতও পাবেন। ইসলামের প্রথম যুগের নিবেদিতপ্রাণ মুমিন থেকে নিয়ে দুর্বল হৃদয়ের মুমিন পর্যন্ত সবার সাথেই আপনার দেখা হবে। এটি এক ধরনের সাধনা। একে আমি বলি কুরআনী সাধনা। এই সাধন-পথে ফুটে উঠে এক অভিনব দৃশ্য। এর যতোগুলো মানযিল আপনি অতিক্রম করতে থাকবেন প্রতিটি মানযিলে আলকুরআনের কিছু আয়াত ও সূরা আপনা আপনি আপনার সামনে এসে যাবে। তারা আপনাকে বলতে থাকবে এই মানযিলে তারা অবতীর্ণ হয়েছিলো এবং এই এই বিধান নিয়ে এসেছিলো।"

দ্রষ্টব্য : ভূমিকা, তাফহীমুল কুরআন, সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী, পৃষ্ঠা-৩১ ও ৩২।

২। আস্ সুন্নাহ

ইসলামী জীবন ব্যবস্থায় আস্‌সুন্নাহ বা সুন্নাতে রাসূলের মর্যাদা সম্পর্কে একদল মানুষ ছিলো বিভ্রান্তির শিকার। তাদেরকে বিভ্রান্তিমুক্ত করার লক্ষ্যে সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (রহ) বলেন,

"মুহাম্মাদ (সা) শুধুমাত্র আল্লাহর পত্রবাহকই ছিলেন না যে তাঁর কিতাব পৌঁছে দেয়া ছাড়া আর কোন দায়িত্ব ছিলো না, বরং তিনি আল্লাহ কর্তৃক নিযুক্ত পথ-প্রদর্শক, আইন প্রণেতা ও শিক্ষকও ছিলেন। তাঁর দায়িত্ব ছিলো নিজের কথা ও কাজের মাধ্যমে কানুনে ইলাহীর ব্যাখ্যা প্রদান করা, তার সঠিক উদ্দেশ্য বুঝিয়ে দেয়া, তার উদ্দেশ্য অনুযায়ী লোকদেরকে প্রশিক্ষণ দেয়া। অতঃপর প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত লোকদের সমন্বয়ে একটি সুসংগঠিত জামায়াতের রূপ দান করে সমাজের সংশোধন ও সংস্কারের প্রচেষ্টা চালানো, অতঃপর এই সংশোধিত সমাজকে একটি সৎ ও সংশোধনকারী রাষ্ট্রের রূপ দান করে দেখিয়ে দেয়া যে ইসলামের আদর্শ ও নীতিমালার ওপর একটি পূর্ণাংগ সভ্যতা কিভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। মহানবীর (সা) এই সব কাজই হচ্ছে আস্‌সুন্নাহ যা তিনি তেইশ বছরের নবুওয়াতী জীবনে আঞ্জাম দিয়েছেন। তাঁর এই সুন্নাহ আলকুরআনের সাথে মিলিত হয়ে সর্বোচ্চ আইন প্রণেতার উচ্চতর আইনের রূপায়ণ ও পূর্ণতা বিধান করে। আর ইসলামী পরিভাষায় এই উচ্চতর আইনের নাম শারীয়া।"

দ্রষ্টব্য : সুন্নাতে রাসূলের (সা) আইনগত মর্যাদা, সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী, পৃষ্ঠা-৩২

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন রাসূলুল্লাহ (সা) সম্পর্কে বলেন,

"সে লোকদেরকে মা'রূফ কাজেরই নির্দেশ দেয়, মুনকার কাজ থেকে বিরত রাখে, তাদের জন্য পাক জিনিসগুলো হালাল ও নাপাক জিনিসগুলো হারাম করে, আর তাদের ওপর যেইসব বোঝা চাপানো ছিলো সেইগুলো সরিয়ে দেয় এবং সেইসব বন্ধনগুলো খুলে দেয় যাতে তারা বন্দী ছিলো।"

– সূরা আল আ'রাফ ॥ ১৫৭

এই আয়াতের বক্তব্য সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করে যে আল্লাহ তা'লা মহানবীকে (সা) আইন প্রণয়নের ক্ষমতা দিয়েছেন। আল্লাহর পক্ষ থেকে আদেশ-নিষেধ, হালাল-হারাম শুধু আলকুরআনে বর্ণিতগুলোই নয়, বরং এর সাথে মহানবী (সা) যা কিছু হালাল অথবা হারাম ঘোষণা করেছেন, অথবা যেইসব জিনিসের হুকুম দিয়েছেন কিংবা নিষেধ করেছেন তাও আল্লাহ প্রদত্ত ক্ষমতার অন্তর্ভুক্ত। তাই এইগুলোও আল্লাহর বিধানের একটি অংশ।"

দ্রষ্টব্য : সুন্নাতে রাসূলের আইনগত মর্যাদা, সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী, পৃষ্ঠা-৭০

"মুহাম্মাদ (সা) শুধুমাত্র পত্রবাহক ছিলেন না, বরং আল্লাহর পক্ষ থেকে নিযুক্ত পথপ্রদর্শক, আইন প্রণেতা ও শিক্ষকও ছিলেন যাঁর আনুগত্য ও অনুসরণ

মুমিনদের জন্য বাধ্যতামূলক এবং যাঁর জিন্দিগীকে গোটা মুমিন সম্প্রদায়ের জন্য আদর্শ সাব্যস্ত করা হয়েছে। বিবেক বুদ্ধি এই কথা মেনে নিতে পারে না যে একজন নবী শুধুমাত্র আল্লাহর কালাম পড়ে শুনিয়ে দেয়ার সীমা পর্যন্তই নবী এবং তারপর তিনি একজন সাধারণ মুসলিমের চেয়ে বেশি কিছু নন। ইসলামের সূচনা থেকে আজ পর্যন্ত সকল মুসলিম ঐক্যবদ্ধভাবে প্রতিটি যুগে ও গোটা পৃথিবীতে মুহাম্মাদকে (সা) অপরিহার্যরূপে অনুসরণীয় আদর্শ ও তাঁর আদেশ-নিষেধকে বাধ্যতামূলক বলে মেনে নিয়েছে। এমনকি কোন অ-মুসলিম পণ্ডিতও এই বাস্তব বিষয়টি অস্বীকার করতে পারেননি যে মুসলিমগণ সর্বদা মুহাম্মাদের (সা) এই মর্যাদাই স্বীকার করে নিয়েছে। আর ইসলামের আইন ব্যবস্থায় আলকুরআনের পাশাপাশি আস্‌সুন্নাহকে আইনের দ্বিতীয় উৎস হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছে।"

দ্রষ্টব্য : সুন্নাতে রাসূলের আইনগত মর্যাদা, সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী, পৃষ্ঠা-৩৩

৩। ইসলামী জীবন বিধান

খুলাফায়ে রাশিদীনের সোনালী যুগ অতিক্রান্ত হওয়ার পর মুসলিম উম্মাহ্ ক্রমশ ইসলামী মূল্যবোধের অনেক কিছু হারিয়ে ফেলে। জীবন বিধান হিসেবে ইসলামের যেই পরিচয় ছিলো তা বিস্মৃতির আড়ালে অদৃশ্য হয়ে যায়। সময়ের ব্যবধানে ইসলাম শুধুমাত্র কতগুলো ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের মধ্যে সীমিত হয়ে পড়ে। জীবন সমস্যার সুষ্ঠু সমাধানের জন্য ইসলামের দিকেই তাকাতে হবে- এই কথা খোদ মুসলিমরাই ভুলে যায়।

বিভিন্ন যুগে ইসলামের আসল রূপ আবার মানুষের সামনে তুলে ধরার জন্য অনেক মনীষী চেষ্টা করেছেন। বিংশ শতাব্দীতে যাঁরা এই মহৎ প্রচেষ্টায় আত্মনিয়োগ করেছেন তাঁদের মধ্যে সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদীর স্থান সকলের উর্ধ্বে। তিনি নতুন করে দুনিয়াবাসীকে শুনালেন, ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। আলকুরআন ও আলহাদীসের উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি দেখালেন যে ইসলামে রাজনীতি, অর্থনীতি, শিল্পনীতি, বাণিজ্যনীতি, ভূমিনীতি, শিক্ষানীতি, বিচারনীতি, শাসননীতি, যুদ্ধনীতি, সন্ধিনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্কনীতি- তথা ব্যক্তি ও সমাজ জীবনের সকল দিক ও বিভাগ সংক্রান্ত নীতি বিদ্যমান। মুসলিমদের কর্তব্য শুধুমাত্র আনুষ্ঠানিক ইবাদাতগুলো সম্পন্ন করা নয়। বরং সমগ্র জীবনের কর্মকাণ্ড আলকুরআন ও আস-সুন্নাহর নির্দেশনা ও নীতিমালার ভিত্তিতে সম্পন্ন করা।

তাঁর রচিত ইসলামী সাহিত্য পড়ে দিক-ভ্রান্ত মুসলিমদের একটি বিরাট অংশ ইসলামের আসল রূপের সাথে পরিচিত হয়ে ধন্য হয়েছে। জীবন ব্যবস্থা হিসেবে ইসলামের চর্চার অনুপস্থিতিতে বিভ্রান্ত হয়ে যারা ইউরো-আমেরিকান জীবন ব্যবস্থাকেই উত্তম জীবন ব্যবস্থা গণ্য করতো তাদের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ বস্তুবাদী পশ্চিমা সভ্যতার অসারতা এবং ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব ও সৌন্দর্য উপলব্ধি করে আবার ইসলামের দিকে ফিরে এসেছে। এই কালে যাঁরাই ইসলাম সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন তাঁদের মুখে অবশ্যম্ভাবী রূপে উচ্চারিত হয় ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান।

৪। ইসলামী জাতীয়তা

সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী লক্ষ্য করেন যে, জাতীয়তা প্রশ্নে মুসলিম জনগোষ্ঠী দারুণ বিভ্রান্তিতে নিমজ্জিত। তুর্কী জাতীয়তাবাদ, আরব জাতীয়তাবাদ, ভারতীয় জাতীয়তাবাদ ইত্যাদি শ্লোগান মুসলিমদের ওপর প্রভাব বিস্তার করে চলছে। এই উপ-মহাদেশের শীর্ষস্থানীয় আলিমদের বিরাট অংশ পর্যন্ত ভারতীয় জাতীয়তাবাদের স্রোতে ভেসে চলছিলো। এই নাজুক পরিস্থিতিতে সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী ইসলামের দৃষ্টিতে জাতীয়তার ভিত্তি বিশ্লেষণ করে এক ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেন। তাঁর এই বিশ্লেষণ চিন্তাশীল মুসলিমদেরকে তাত্ত্বিক খোরাক দান করে ও তাদেরকে সঠিক পথ বেছে নিতে সাহায্য করে।

সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী তাঁর রচিত "মাসালায়ে কাউমিয়াত" গ্রন্থে লিখেন-

"ইসলামী জাতীয়তায় মানুষে মানুষে পার্থক্য করা হয় বটে, কিন্তু জড়, বৈষয়িক ও বাহ্যিক কোন কারণে নয়। এটা করা হয় আধ্যাত্মিক, নৈতিক ও মানবিকতার দিক দিয়ে। মানুষের সামনে এক স্বাভাবিক সত্য বিধান পেশ করা হয়েছে যার নাম ইসলাম। আল্লাহর দাসত্ব-আনুগত্য, হৃদয়মনের পবিত্রতা-বিশুদ্ধতা, কর্মের অনাবিলতা-সততা ও দীন অনুসরণের দিকে গোটা মানব জাতিকে আহ্বান জানানো হয়েছে। তারপর বলা হয়েছে, যারা এই আহ্বান গ্রহণ করবে তারা এক জাতি হিসেবে গণ্য হবে। আর যারা তা অগ্রাহ্য করবে তারা ভিন্ন জাতির অন্ত র্ভুক্ত হবে। অর্থাৎ মানুষের একটি হচ্ছে ঈমান ও ইসলামের জাতি, তার ব্যক্তি সমষ্টি মিলে একটি উম্মাহ। মানুষের অন্যটি হচ্ছে কুফর ও ভ্রষ্টতার জাতি। তারা পারস্পরিক মতবিরোধ ও বৈষম্য সত্ত্বেও একই দল।"

"এই দুইটি জাতির মধ্যে বংশ ও গোত্রের দিক দিয়ে কোন পার্থক্য নেই।

পার্থক্য বিশ্বাস ও কর্মের। কাজেই একই আব্বা-আম্মার দুই সন্তান ইসলাম ও কুফরের উল্লেখিত পার্থক্যের কারণে স্বতন্ত্র দুই জাতির মধ্যে গণ্য হতে পারে এবং দুই নিঃসম্পর্ক ও অপরিচিত ব্যক্তি ইসলামে প্রবেশ করার কারণে এক জাতির অন্তর্ভুক্ত হতে পারে।"

"জন্মভূমির পার্থক্যও এই উভয় জাতির মধ্যে ব্যবধানের কারণ হতে পারে না। এখানে পার্থক্য করা হয় হক ও বাতিলের ভিত্তিতে। আর হক ও বাতিলের স্বদেশ বা জন্মভূমি বলতে কিছু নেই। একই শহর, একই মহল্লা ও একই ঘরের দুই ব্যক্তির জাতীয়তা ইসলাম ও কুফরের পার্থক্যের কারণে বিভিন্ন হতে পারে। একজন নিগ্রো ইসলামের সূত্রে একজন মরক্কোবাসীর ভাই হতে পারে।"

"বর্ণের পার্থক্যও এখানে জাতীয় পার্থক্যের কারণ নয়। বাহ্যিক চেহারার রঙ ইসলামে নগণ্য। এখানে একমাত্র আল্লাহর রঙেরই গুরুত্ব রয়েছে। আর এটাই হচ্ছে সবচে' উত্তম রঙ।"

"ভাষার বৈষম্যও ইসলাম ও কুফরের পার্থক্যের কারণ নয়। ইসলামে মুখের ভাষার নয়, মূল্য হচ্ছে হৃদয়ের ভাষাহীন কথার।"

"ইসলামী জাতীয়তা বৃত্তের কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছে কালেমা "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ"। বন্ধুতা আর শত্রুতা এই কালেমার ভিত্তিতেই হয়ে থাকে। এর স্বীকৃতি মানুষকে একীভূত করে, অস্বীকৃতি চূড়ান্ত বিচ্ছেদ ঘটায়। এই কালেমা যাকে বিচ্ছিন্ন করে তাকে রক্ত, মাটি, ভাষা, বর্ণ, অন্ন, শাসন-ব্যবস্থা প্রভৃতি কোন সূত্র ও কোন আত্মীয়তাই যুক্ত করতে পারে না। অনুরূপভাবে এই কালেমা যাদেরকে যুক্ত করে তাদেরকে কোন কিছুই বিচ্ছিন্ন করতে পারে না।"

"উল্লেখ্য যে, অ-মুসলিম জাতিগুলোর সাথে মুসলিম জাতির সম্পর্কের দুইটি দিক রয়েছে। প্রথমটি এই যে, মানুষ হিসেবে মুসলিম-অমুসলিম সকলেই সমান। আর দ্বিতীয়টি এই যে, ইসলাম ও কুফরের পার্থক্যের কারণে আমাদেরকে তাদের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা করে দেয়া হয়েছে। প্রথম সম্পর্কের দিক দিয়ে মুসলিমরা তাদের সাথে সহানুভূতি, ঔদার্য ও সৌজন্যমূলক ব্যবহার করবে। কারণ মানবতার নিরিখে এইরূপ ব্যবহারই তারা পেতে পারে। এমন কি তারা যদি ইসলামের দুশমন না হয়, তাহলে তাদের সাথে বন্ধুত্ব, সন্ধি ও মিলিত উদ্দেশ্যের (Common cause) জন্য সহযোগিতাও করা যেতে পারে। কিন্তু কোন প্রকার বস্তুগত ও বৈষয়িক সম্পর্ক তাদেরকে ও আমাদেরকে মিলিত করে 'এক জাতি' বানিয়ে দিতে পারেনা।"

দ্রষ্টব্য : ইসলাম ও জাতীয়তাবাদ, সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী, পৃষ্ঠা-২১-২৪

৫। ইসলামী সমাজ ও সভ্যতায় নারীর অবস্থান

সমাজ-সভ্যতায় নারীর সঠিক অবস্থান নির্ণয় করা চাট্টিখানি কথা নয়। বহু দার্শনিক এই বিষয়ে চর্চা করতে গিয়ে হোঁচট খেয়েছেন। প্রকৃতপক্ষে ইসলাম ছাড়া আর কোন জীবন ব্যবস্থাই এই বিষয়ে সঠিক সমাধান দিতে পারেনি।

বস্তুবাদী ইউরো-আমেরিকান সমাজ-ব্যবস্থার বক্তব্য হচ্ছে, "নারী ও পুরুষের মধ্যে সমতা ও সমানাধিকার থাকতে হবে। উভয়ের দায়িত্ব প্রায় একই রূপ হবে। উভয়ে একই কর্মক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা করবে। উভয়ে আপন আপন জীবিকা উপার্জন করবে ও স্বাবলম্বী হবে।"

দ্রষ্টব্য : পর্দা ও ইসলাম, সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী, পৃষ্ঠা-১৩

ইউরো-আমেরিকান সমাজ-ব্যবস্থা কার্যত নারীকে তার বিশেষ মর্যাদার আসন থেকে নামিয়ে এনে পুরুষের প্রতিযোগী বানিয়েছে। 'নারী মুক্তি' ও 'নারী অধিকারের' শ্রুতিমধুর শ্লোগান উচ্চারণ করে নারীকে ধাপে ধাপে এমন এক পর্যায়ে নিয়ে এসেছে যা নারীর জন্য অপমানকর ও সমাজের জন্য বিষতুল্য। নারীকে তার আসল কর্মক্ষেত্র থেকে টেনে ভিন্ন কর্মক্ষেত্রে আনার ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী বলেন,

"নারী তার (স্বাভাবিক) দৈনন্দিন কাজগুলোর প্রতি উদাসীন ও বিদ্রোহী হয়ে উঠে। অথচ এই সব প্রকৃতিগত কাজ সম্পাদনের ওপর নির্ভর করে সভ্যতা-সংস্কৃতি ও মানব বংশের ধারাবাহিকতা। অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও দলীয় প্রবণতা তার ব্যক্তিত্বকে আত্মকেন্দ্রিক করে তোলে। নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা, অফিস ও কলকারখানায় চাকুরী গ্রহণ, ব্যবসা ও শিল্প প্রতিষ্ঠানে পুরুষের সাথে প্রতিযোগিতা, খেলাধূলা, শারীরিক কসরত ও সমাজের চিত্তবিনোদনমূলক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ, ক্লাব-রঙমঞ্চ-নৃত্য-গীত ইত্যাদিতে সময় ক্ষেপণ এবং এই ধরনের বহুবিধ অকরণীয় কাজ তাদের মন-মস্তিষ্ককে এমনভাবে প্রভাবিত করে যে দাম্পত্য জীবনের গুরুদায়িত্ব, সন্তান প্রতিপালন, পারিবারিক সেবামূলক কাজ, গৃহের সুব্যবস্থা প্রভৃতি যাবতীয় করণীয় বিষয়গুলো তাদের কার্যসূচীর বহির্ভূত হয়ে পড়ে। তাদের প্রকৃতিগত কাজের প্রতি তাদের মনে ঘৃণার সৃষ্টি হয়। পারিবারিক শৃংখলা– যাকে সভ্যতা-সংস্কৃতির ভিত্তি প্রস্তর বলা হয়– ভংগুর হয়ে পড়ে। যেই পারিবারিক জীবনের সুখ-শান্তির ওপর মানুষের কর্মক্ষমতার পরিস্ফুটন নির্ভরশীল তা নিঃশেষ হতে থাকে। নারী-পুরুষের পারস্পরিক সাহায্য-সহযোগিতার সুষ্ঠু পন্থা হচ্ছে বৈবাহিক সম্পর্ক। তা মাকড়সার জালের চেয়েও ক্ষীণতর হয়ে পড়ে। জন্ম নিয়ন্ত্রণ, গর্ভ নিপাত ও প্রসূত হত্যার দ্বারা বংশ বৃদ্ধির পথ রুদ্ধ হতে থাকে।"

দ্রষ্টব্য : পর্দা ও ইসলাম, সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী, পৃষ্ঠা-১৩

"অর্থনৈতিক স্বাধীনতা নারীকে পুরুষ থেকে বেপরোয়া করে তোলে। পূর্বে পুরুষ উপার্জন করতো, নারী গৃহ শৃংখলা রক্ষা করতো। এখন তা পরিবর্তিত হয়ে গেলো। ... এখন একমাত্র যৌন-সম্পর্ক ছাড়া নারী-পুরুষের আর এমন কোন সম্পর্ক রইলো না যার জন্য একজন অপর জনের সাথে সংশ্লিষ্ট থাকতে বাধ্য হয়। যৌন প্রয়োজন পূরণের জন্য নারী-পুরুষকে অবশ্যই স্থায়ী বন্ধনে আবদ্ধ থাকতে হবে– এর কি প্রয়োজন আছে? যেই নারী নিজের জীবিকা উপার্জন করতে পারে, নিজের যাবতীয় প্রয়োজন মেটাতে পারে ও নিজের নিরাপত্তার জন্য অপরের সাহায্যের মুখাপেক্ষী নয়, সে শুধু যৌন-সম্ভোগের জন্য একজন পুরুষের অধীনতা স্বীকার করবে কেন? পরিবারের গুরুদায়িত্ব বহন করবে কেন? ... ধর্ম-বিতাড়নের সংগে পাপের ভয়ও দূর হয়ে গেছে। সমাজ তাকে আর অশ্লীলতার জন্য তিরস্কার করে না। ফলে সমাজের ভয়ও দূর হয়ে গেছে। বড়ো ভয় ছিলো অবৈধ সন্তানের। তা থেকে পরিত্রাণের জন্য গর্ভ রোধের ব্যবস্থা আছে। এরপরও যদি গর্ভ সঞ্চার হয়, গর্ভ নিপাতের ব্যবস্থা আছে। তাতেও বিফল হলে প্রসূতকে গোপনে হত্যা করা যেতে পারে। মাতৃত্ব যদি প্রসূতকে হত্যা করতে বাধা দেয় তাতেই বা কি ক্ষতি? কারণ, কুমারী মা ও জারজ সন্তানের পক্ষে এতো আন্দোলন হচ্ছে যে যেই ব্যক্তি তাদেরকে ঘৃণার চোখে দেখবে তাকেই কু-সংস্কারাচ্ছন্ন বলে অভিযুক্ত করা হবে। আজকাল লক্ষ লক্ষ নারী চিরকুমারী থেকেও কামাসক্ত জীবন যাপন করছে। আবার অসংখ্য নারী হঠাৎ প্রেম ফাঁদে পড়ে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধও হয়। কিন্তু যৌন-সম্পর্ক ছাড়া আর কোন আবশ্যকীয় যোগসূত্র নেই যা তাদের এই বিবাহ বন্ধনকে স্থায়িত্ব দিতে পারে। ... স্বামী-স্ত্রী কেউ কারো পরোয়া করে না। ... নিছক প্রেমানুরাগ অবিলম্বেই স্তিমিত হয়ে পড়ে। ফলে সামান্য মত-পার্থক্য, এমনকি অধিকাংশ ক্ষেত্রে শুধু উদাসীনতা তাদের বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দেয়। ... গর্ভ নিরোধ, গর্ভ নিপাত, ভ্রূণ হত্যা, প্রসূত হত্যা, জন্ম হারের ন্যূনতা ও জারজ সন্তানের আধিক্য বহুলাংশে উপরোক্ত কারণগুলোরই শেষ পরিণতি। কু-কর্ম, নির্লজ্জতা ও রতিজ দুষ্ট ব্যাধির প্রাদুর্ভাবও উপরোক্ত কারণেই হয়ে থাকে।"

দ্রষ্টব্য : পর্দা ও ইসলাম, সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী, পৃষ্ঠা-১৪, ১৫

নিরপেক্ষ মন নিয়ে বিশ্লেষণ করলে এই কথা স্বীকার করতেই হবে যে ইউরো-আমেরিকান জীবন ব্যবস্থা নারীকে চরম দুর্ভোগের শিকারে পরিণত করেছে, পারিবারিক ব্যবস্থাকে করেছে বিধ্বস্ত আর সমাজ-জীবনকে করেছে অসুস্থ। এই দুর্গতি থেকে নারীকে পরিত্রাণ দেয়া, সভ্যতার বুনিয়াদ পরিবার-ব্যবস্থাকে

পুনর্বিন্যস্ত করা ও অসুস্থতা থেকে সমাজকে মুক্ত করা একমাত্র ইসলামী জীবন বিধানের দিকে প্রত্যাবর্তনের ওপরই নির্ভর করছে। ইসলাম সমাজ-ব্যবস্থায় নারীর যেই অবস্থান নির্ধারণ করে দিয়েছে নারীর মর্যাদা ও সমাজের সুস্থতা সেই অবস্থানকে মেনে নেয়ার ওপরই নির্ভরশীল। ইসলাম নির্দেশিত অবস্থানই সঠিক ও কল্যাণকর। সমাজ-সভ্যতায় নারীর অবস্থানের ওপর আলোকপাত করতে গিয়ে দূরদর্শী চিন্তাবিদ সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী বলেন,

"মানুষ হিসেবে নারী ও পুরুষ সমান। তারা মানব জাতির দুইটি সমান অংশ। সমাজ-সংস্কৃতি গঠনে, সভ্যতা বিনির্মাণে ও মানবতার কল্যাণে সমান অংশীদার। মন-মস্তিষ্ক, বিবেক, অনুভূতি, প্রবৃত্তি ও মানবিক প্রয়োজন উভয়েরই আছে। সমাজ-সভ্যতার সংস্কার ও উন্নতি বিধানের জন্য উভয়েরই মানসিক উন্নতি, মস্তিষ্ক চর্চা, বিবেক ও চিন্তা শক্তির বিকাশ প্রয়োজন যাতে তামাদ্দুনিক সেবায় প্রত্যেকে আপন আপন ভূমিকা রাখতে পারে। এই দিক দিয়ে সমতার দাবি সম্পূর্ণ যুক্তিযুক্ত। পুরুষের মতো নারীকেও তার স্বাভাবিক শক্তি ও যোগ্যতা অনুসারে উন্নতি সাধনের সুযোগ দেয়া প্রয়োজন। জ্ঞানার্জন ও উচ্চ শিক্ষা লাভের সুযোগ তাকে দিতে হবে। পুরুষের মতো তাকেও তামাদ্দুনিক ও আর্থিক অধিকার দিতে হবে। সমাজে তাকে এমন মর্যাদা দিতে হবে যাতে তার মধ্যে আত্মসম্মানের অনুভূতি জাগ্রত হয় এবং ঐসব মানবীয় গুণের সঞ্চার হয় যা কেবল আত্মসম্মানের অনুভূতির দ্বারাই হতে পারে।"

দ্রষ্টব্য : পর্দা ও ইসলাম, সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদদূদী, পৃষ্ঠা-১৩৪

"সমতার আরেকটি দিক হচ্ছে এই যে নারী-পুরুষের উভয়ের কর্মক্ষেত্র এক হবে, উভয়ে একই ধরনের কাজ করবে, উভয়ের ওপর জীবনের সকল বিভাগের গুরুদায়িত্ব সমানভাবে অর্পিত হবে।" এই দাবির পরিপ্রেক্ষিতে সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী বলেন, "নারীকে পুরুষের কাজের জন্য প্রস্তুত করা প্রকৃতির দাবি ও রীতির পরিপন্থী। এটি মানবতা ও নারী কারো জন্যই কল্যাণকর নয়। যেহেতু শরীর বিজ্ঞান অনুযায়ী নারীকে সন্তান প্রসব ও সন্তান প্রতিপালনের জন্যই সৃষ্টি করা হয়েছে সেহেতু মনস্তাত্ত্বিক দিক দিয়েও তার মধ্যে প্রেম-ভালবাসা, সহানুভূতি, স্নেহ-মমতা, হৃদয়ের কোমলতা, তীক্ষ্ণ অনুভূতি, নমনীয় আবেগ-উচ্ছ্বাস প্রভৃতি গুণ গচ্ছিত রাখা হয়েছে যা তার প্রকৃতিগত দৈনন্দিন কাজের উপযোগী। ... যেই সব কাজে ও জীবনের যেই সব বিভাগে কঠোরতা, প্রভুত্ব-কর্তৃত্ব, প্রতিরোধ ও উপেক্ষা-অবহেলার প্রয়োজন, যাতে আবেগ-উচ্ছ্বাসের পরিবর্তে দৃঢ়-সংকল্প প্রয়োজন সেখানে নারী সাফল্য অর্জন করবে কিভাবে? সমাজের এই সব বিভাগে নারীকে টেনে আনার অর্থ নারীত্বকে ধ্বংস করা এবং

ঐসব বিভাগকেও ধ্বংস করা।"

"জীবনের কোন কোন দিকে নারী দুর্বল ও পুরুষ সবল। আবার কোন কোন দিকে পুরুষ দুর্বল ও নারী সবল। জীবনের এমন সব দিকে নারীকে পুরুষের সাথে প্রতিযোগিতায় নামানো হচ্ছে যেই সব দিকে সে দুর্বল। এর ফলে নারী সর্বদা পুরুষ থেকে নিকৃষ্ট প্রমাণিত হবে।"

"মানব সভ্যতার জন্য যেমন কঠোরতা-নির্মমতার প্রয়োজন, তেমনি প্রয়োজন কোমলতা-নমনীয়তা। যতোখানি প্রয়োজন আছে দক্ষ সেনাপতির, বিচক্ষণ পরামর্শক ও যোগ্য শাসকের, ততোখানি প্রয়োজন আছে উৎকৃষ্ট মাতা ও উৎকৃষ্ট সহধর্মিনীর। উভয় শ্রেণীর থেকে যাকেই বাদ দেয়া হোক না কেন সমাজ-সভ্যতা ক্ষতিগ্রস্ত হবেই।"

"এ এমন এক কর্ম-বন্টন যা প্রকৃতি উভয়ের মধ্যে করে দিয়েছে। জীব বিজ্ঞান, শরীর বিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান, সমাজ-বিজ্ঞান প্রভৃতি এই কর্ম বন্টনেরই ইংগিত বহন করে।"

"পরিবারের জন্য অর্থ উপার্জন করা, পরিবারের রক্ষণাবেক্ষণ করা এবং সমাজ-সভ্যতার শ্রমজনিত কাজ করা পুরুষের কর্তব্য। তার শিক্ষাও এমন হতে হবে যাতে সে এই সব কাজ আঞ্জাম দেয়ার উপযুক্ত হয়ে গড়ে উঠে।"

"সন্তান প্রতিপালন, গৃহাভ্যন্তরীণ কাজ আঞ্জাম দেয়া ও পারিবারিক জীবনকে মধুর করে গড়ে তোলা নারীর কর্তব্য। তার শিক্ষা এমন হতে হবে যাতে সে এই সব কাজ আঞ্জাম দেয়ার উপযুক্ত হয়ে গড়ে উঠে।"

দ্রষ্টব্য : পর্দা ও ইসলাম, সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী, পৃষ্ঠা-১৪২-১৪৫

সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী নারীর অবস্থান সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভংগি বিশ্লেষণ করে আরো বলেন, "নারীকে গৃহের রাণী করা হয়েছে। অর্থ উপার্জনের দায়িত্ব স্বামীর ও অর্জিত অর্থের দ্বারা গৃহের ব্যবস্থাপনা করা নারীর কাজ।"

"গৃহের বহির্ভূত কাজ থেকে তাকে মুক্ত করা হয়েছে। ছালাতুল জুমুআ তার জন্য ফারয করা হয়নি। তার ওপর যুদ্ধ ফারয নয়, প্রয়োজনবোধে অবশ্য মুজাহিদদের খিদমাতের জন্য সে (যুদ্ধের ময়দানে) যেতে পারে। জানাযায় অংশগ্রহণ করা থেকে তাকে বিরত রাখা হয়েছে। জামায়াতে ছালাত আদায় করা ও মাসজিদে হাজির হওয়া তার জন্য বাধ্যতামূলক করা হয়নি, যদিও কিছু নিয়ন্ত্রণসহকারে মাসজিদে যাওয়ার অনুমতি দেয়া হয়েছে। তাকে মুহাররাম পুরুষের সংগে ব্যতীত সফরের অনুমতি দেয়া হয়নি।"

মোটকথা, সকল দিক দিয়েই নারীর গৃহ থেকে বের হওয়া অপছন্দ করা হয়েছে।

দ্রষ্টব্য : পর্দা ও ইসলাম, সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী, পৃষ্ঠা-১৭৭, ১৭৮

জরুরী প্রয়োজনে ইসলামী শারীয়া নারীকে আলহিজাবসহ বাইরে যাবার যেই অনুমতি দিয়েছে সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী তাও উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন, "কোন কোন অবস্থায় নারীর বাড়ির বাইরে যাওয়া প্রয়োজন হয়ে পড়ে। হতে পারে তার কোন অভিভাবক নেই। এও হতে পারে তার পরিবার প্রধানের আর্থিক অসচ্ছলতা, বেকারত্ব, অসুস্থতা, অক্ষমতা কিংবা অনুরূপ কোন কারণে তাকে বাড়ির বাইরে কাজ করতে হবে।"

অবশ্য এটি যে সাধারণ নিয়ম নয়, "অবস্থা বিশেষে অনুমতি" সেই কথাও সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (রহ) উল্লেখ করতে ভুলেননি।

দ্রষ্টব্য : পর্দা ও ইসলাম, সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী, পৃষ্ঠা-১৭৯

নারী শিক্ষা ও গৃহাংগনের বাইরে গিয়ে নারীর কাজ করা সম্পর্কে সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী অন্যত্র বলেন,

"ইসলাম নারী শিক্ষায় বাধা দেয় না। যতো উচ্চ শিক্ষা সম্ভব তাদেরকে দেয়ার ব্যবস্থা থাকা উচিত। তবে কয়েকটি শর্ত আছে। প্রথমত তাদেরকে এমন শিক্ষা দিতে হবে যাতে তারা নিজেদের বিশেষ কর্মক্ষেত্রে কর্তব্য পালনের জন্য যথোপযুক্তভাবে গড়ে উঠে। দ্বিতীয়ত সহশিক্ষা চলবে না। নারীদের দ্বারা পরিচালিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তাদেরকে শিক্ষা দিতে হবে। ... তৃতীয়ত উচ্চ শিক্ষিত মহিলাদেরকে এমন সব প্রতিষ্ঠানে নিয়োগ করতে হবে যেইগুলো নারীদের জন্যই নির্দিষ্ট। যেমন, মহিলা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, মহিলা হাসপাতাল ইত্যাদি।"

দ্রষ্টব্য : ইসলামী রাষ্ট্র ও সংবিধান, সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী, পৃষ্ঠা-৩৪৪, ৩৪৫

সমাজের অর্ধাংশ নারী। কোন সমাজকে ইসলামী সমাজে রূপান্তরিত করতে হলে সেই সমাজের নারীদের অংশগ্রহণ অপরিহার্য। সেই জন্যই ইসলাম মুসলিম নারীদেরকে নারী মহলে ইসলামের জ্ঞান বিতরণের জন্য নির্দেশ দেয়। দাওয়াত ইলাল্লাহর কাজ নারী-পুরুষ সকলেরই অপরিহার্য কর্তব্য। এই ক্ষেত্রে ইসলামের আলোকে আলোকিত নারীদের কর্তব্য সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী বলেন,

"প্রচার ও সংশোধনের কাজে পরিবারের লোকজন, নিজের ভাই-বোন, ঘনিষ্ঠ আত্মীয়-স্বজনের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করতে হবে। আল্লাহ তা'য়ালা যেইসব মহিলাকে সন্তান দান করেছেন তাদেরকে তো ইতিমধ্যেই প্রশ্নপত্র দেয়া হয়ে গেছে। তাঁরা যদি পাসের উপযোগী নাম্বার না পান তাহলে অন্য কোন

জিনিস দিয়েই তার ক্ষতিপূরণ করতে পারবেন না। কাজেই তাঁদের সর্বাধিক গুরুত্ব পাওয়ার বস্তু তাঁদের সন্তান। এদেরকে দীন শেখানো ও দীনের আলোকে এদের চরিত্র গঠন করা তাঁদের কর্তব্য। তাঁদের আরেকটি কর্তব্য হচ্ছে স্বামীকে সৎপথ দেখানো এবং স্বামী যদি সৎপথের পথিক হন তাঁকে যথাসাধ্য সহযোগিতা করা। .....সাংসারিক কাজ-কর্ম সম্পন্ন করার পর যতোটুকু সময় পাবেন তা অন্য মহিলাদের কাছে দীনের দাওয়াত পৌঁছানোর কাজে ব্যয় করুন। আপনারা ছোট ছোট বালিকা ও অশিক্ষিত মহিলাদেরকে লেখাপড়া শেখান। শিক্ষিতা মহিলাদেরকে ইসলামী সাহিত্য পড়তে দিন। মহিলাদের জন্য নিয়মিত বৈঠকের আয়োজন করে তাদেরকে দীন শিক্ষা দিন। আপনাদের মধ্যে যাঁরা ভালো বক্তৃতা করতে পারেন না তাঁরা বইয়ের অংশবিশেষ পাঠ করে অন্যদেরকে শুনান।"

দ্রষ্টব্য : হেদায়াত, সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী, পৃষ্ঠা-৩৭

৬। ইসলামী রাষ্ট্র

বহু শতাব্দীর পুঞ্জিভূত আবর্জনার নীচে চাপা পড়েছিলো ইসলামী রাষ্ট্রের ধারণা। অ-মুসলিমরা তো বটেই মুসলিমরা পর্যন্ত ইসলামী রাষ্ট্রের ধারণার সাথে অপরিচিত হয়ে পড়ে। এই যুগ-সন্ধিক্ষণে আবুল আ'লা মওদূদী অত্যন্ত স্বচ্ছ ও পরিচ্ছন্নভাবে তুলে ধরেন ইসলামী রাষ্ট্রের পরিচয়। তিনি দুনিয়াবাসীকে জানালেন ইসলামী রাষ্ট্র হচ্ছে একটি আদর্শ-ভিত্তিক রাষ্ট্র (Ideological State), জাতি-ভিত্তিক রাষ্ট্র (Nation State) নয়।

তিনি বলেন,

"এই রাষ্ট্রের ইমারত আল্লাহর সার্বভৌমত্বের ধারণার ওপর প্রতিষ্ঠিত। এই ধারণার মূল কথা হচ্ছে বিশ্ব-সাম্রাজ্য আল্লাহর। তিনি বিশ্ব-জাহানের সার্বভৌম শাসক। কোন ব্যক্তি, বংশ, শ্রেণী, জাতি এমন কি গোটা মানব জাতিরও সার্বভৌমত্বের বিন্দুমাত্র অধিকার নেই। আইন প্রণয়ন ও নির্দেশ প্রদানের অধিকার একমাত্র আল্লাহর।"

দ্রষ্টব্য : ইসলামী বিপ্লবের পথ, সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী, পৃষ্ঠা-১৬

তিনি বলেন,

"একটি স্বাধীন জনগোষ্ঠী স্বেচ্ছা প্রণোদিত হয়ে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের

নিকট আত্ম-সমর্পণ করে আল্লাহর সার্বভৌমত্বের অধীনে খিলাফাতের (প্রতিনিধিত্বের) ভূমিকা গ্রহণ করে আলকুরআন ও আস্‌সুন্নাহর বিধি-বিধানগুলো কার্যকর করার ঘোষণা দিলে ইসলামী রাষ্ট্র অস্তিত্ব লাভ করে।"

দ্রষ্টব্য : খিলাফাত ও রাজতন্ত্র, সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী, পৃষ্ঠা-৪৯

"আল্লাহর নির্দেশ ও আল্লাহর রাসূলের (সা) নির্দেশ হচ্ছে এমন উর্ধতন আইন (Supreme Law) যার মুকাবিলায় মুমিন ব্যক্তি শুধু আনুগত্যের পন্থাই অবলম্বন করতে পারে। যেই সব বিষয়ে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সা) ফায়সালা দিয়েছেন সেই সব বিষয়ে কোন মুমিন নিজের পক্ষ থেকে কোন স্বাধীন ফায়সালা দেয়ার অধিকারী নয়।"

দ্রষ্টব্য : খিলাফাত ও রাজতন্ত্র, সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী, পৃষ্ঠা-২৩

"ইসলামী রাষ্ট্রে বসবাসকারী সকল মুমিনই আল্লাহর খিলাফাতের ধারকবাহক।"

দ্রষ্টব্য : খিলাফাত ও রাজতন্ত্র, সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী, পৃষ্ঠা-৪৯

"এই খিলাফাত পরিচালনার কাজে এমন সকল ব্যক্তিই অংশীদার হবে যারা এই আইন ও বিধানের প্রতি ঈমান আনবে এবং তা অনুসরণ ও কার্যকর করার জন্য প্রস্তুত থাকবে। তাদের এই রূপ স্থায়ী অনুভূতির সাথে এই মহান কাজ পরিচালনা করতে হবে যে সামষ্টিকভাবে আমাদের সকলকে ও ব্যক্তিগতভাবে আমাদের প্রত্যেককে এর জন্য সেই মহান আল্লাহ তা'য়ালার নিকট জওয়াবদিহি করতে হবে গোপন ও প্রকাশ্য সব কিছুই যার অবগতিতে রয়েছে, যার জ্ঞানের বাইরে কোন কিছুই গোপন থাকতে পারে না, মৃত্যুর পরও যার কর্তৃত্বের দাপট থেকে কোন মানুষ রেহাই পাবে না। এই চিন্তা প্রতিটি মুহূর্তে তাদের এই অনুভূতিকে জাগ্রত রাখবে যে মানুষের ওপর নিজেদের হুকুম ও কর্তৃত্ব চালানোর জন্য, জনগণকে নিজেদের গোলাম বানানোর জন্য, তাদেরকে নিজেদের সামনে মাথা নত করতে বাধ্য করার জন্য, তাদের থেকে ট্যাক্স আদায় করে বিলাসবহুল অট্টালিকা তৈরির জন্য, আর স্বেচ্ছাচারী ক্ষমতা প্রয়োগ করে বিলাসিতা, আত্মপূজা ও হঠকারিতার সামগ্রী পুঞ্জিভূত করার জন্য আমাদের ওপর খিলাফাতের এই মহান দায়িত্ব অর্পিত হয়নি। বরং এই বিরাট দায়িত্ব আমাদের ওপর অর্পিত হয়েছে যাতে আমরা আল্লাহর বান্দাদের ওপর তাঁরই দেয়া ন্যায় ভিত্তিক আইন ও বিধান কার্যকর করি এবং নিজেরাও নিজেদের জীবনে তা পুরোপুরি অনুসরণ ও কার্যকর করি। এই বিধানের অনুসরণ, অনুবর্তন ও তা

কার্যকর করার ব্যাপারে আমরা যদি বিন্দুমাত্র ত্রুটি করি, এই কাজে যদি অণু পরিমাণ স্বার্থপরতা, স্বেচ্ছাচারিতা, পক্ষপাতিত্ব কিংবা বিশ্বাসঘাতকতার অনুপ্রবেশ ঘটাই তাহলে আল্লাহর আদালতে আমাদেরকে অবশ্যই এর শাস্তি ভোগ করতে হবে।

দ্রষ্টব্য : ইসলামী বিপ্লবের পথ, সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী, পৃষ্ঠা-১৬, ১৭

ইসলামী রাষ্ট্রের শাসন নীতি বিশ্লেষণ করতে গিয়ে সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী আরো বলেন,

"একমাত্র আল্লাহই সার্বভৌমত্বের অধিকারী। মুমিনদের শাসন হচ্ছে মূলত খিলাফাত বা আল্লাহর প্রতিনিধিত্বশীল শাসন। কাজেই বলগাহীনভাবে কাজ করার অধিকার সরকারের নেই।

দ্রষ্টব্য : খিলাফাত ও রাজতন্ত্র, সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী, পৃষ্ঠা-৫৭

"ইসলামী রাষ্ট্রের দায়িত্বপূর্ণ পদের জন্য সেই ব্যক্তি সবচে' বেশি অযোগ্য যে সেই পদ লাভের অভিলাষী কিংবা সেই পদ পেতে সচেষ্ট।"

দ্রষ্টব্য : খিলাফাত ও রাজতন্ত্র, সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী, পৃষ্ঠা-৬৮

"মুমিনদের পরামর্শ ও সম্মতিক্রমে রাষ্ট্র-প্রধান নিযুক্ত হতে হবে। তাঁকে রাষ্ট্র পরিচালনা করতে হবে শূরা বা পরামর্শের ভিত্তিতে।"

দ্রষ্টব্য : খিলাফাত ও রাজতন্ত্র, সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী, পৃষ্ঠা-৬৩

"সরকারের কর্তব্য হচ্ছে কোন রকম পরিবর্তন পরিবর্ধন ছাড়াই সঠিকভাবে ইসলামী জীবন বিধান প্রতিষ্ঠা, ভালো ও সৎ গুণাবলীর বিকাশ সাধন এবং মন্দ ও অসৎ গুণাবলীর বিনাশ সাধন।"

দ্রষ্টব্য : খিলাফাত ও রাজতন্ত্র, সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী, পৃষ্ঠা-৬৯

"সকল মা'রূফ কাজে সরকারের আনুগত্য করা সকলের কর্তব্য। মা'সিয়াত বা পাপ কাজে সরকারের আনুগত্য করা যাবে না। বস্তুত মা'সিয়াত বা পাপ কাজের নির্দেশ দেয়ার কোন অধিকার সরকারের নেই।"

দ্রষ্টব্য : খিলাফাত ও রাজতন্ত্র, সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী, পৃষ্ঠা-৬৫

"সরকারের নির্বাহী বিভাগ এমন কোন নীতি গ্রহণ করতে পারে না ও এমন কোন নির্দেশ জারি করতে পারে না যা মা'সিয়াতের সংজ্ঞায় পড়ে।"

দ্রষ্টব্য : খিলাফাত ও রাজতন্ত্র, সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী, পৃষ্ঠা-৩৫

"যেই সব বিষয়ে উর্ধতন আইনে (Supreme Law) কেবল মূলনীতি ও সীমারেখা নির্ধারিত রয়েছে এবং যেই সব বিষয়ে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সা)

কোন সুস্পষ্ট নির্দেশ দেননি, সেই সব বিষয়ে আইন পরিষদ ব্যাখ্যা দেবে ও মূল নীতির নিরিখে প্রয়োজনে আইন তৈরি করবে।"

দ্রষ্টব্য : খিলাফাত ও রাজতন্ত্র, সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী, পৃষ্ঠা-৩৫

ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা সম্পর্কে তিনি আরো বলেন,

"এই ব্যবস্থায় ব্যক্তি ও রাষ্ট্রের মধ্যে এমন এক ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে যে রাষ্ট্র লাগামহীন ক্ষমতার অধিকারী হয়ে ব্যক্তিকে দাসে পরিণত করতে পারে না, আর ব্যক্তিও সীমাহীন স্বাধীনতা পেয়ে ঔদ্ধত্যপরায়ণ ও সমাজ-স্বার্থের দুশমন হতে পারে না। এই রাষ্ট্র ব্যবস্থায় একদিকে ব্যক্তিকে মৌলিক অধিকার দিয়ে এবং রাষ্ট্রকে ঊর্ধতন আইন ও শূরার অধীন করে ব্যক্তি সত্তার বিকাশের সকল সুযোগ-সুবিধা দান করা হয়েছে, ক্ষমতার অন্যায় হস্তক্ষেপ থেকে ব্যক্তিকে নিরাপদ করা হয়েছে। অপর দিকে, ব্যক্তিকে নৈতিক নীতিমালার ডোরে শক্তভাবে বেঁধে দেয়া হয়েছে। তার ওপর এই কর্তব্যও আরোপ করা হয়েছে যে রাষ্ট্র আল্লাহর বিধান অনুযায়ী কাজ করলে সে মনে-প্রাণে রাষ্ট্রের আনুগত্য করবে, ভালো কাজে সর্বাত্মকভাবে সহযোগিতা করবে, রাষ্ট্র শৃংখলায় ফাটল ধরানোর কাজ থেকে বিরত থাকবে এবং তার সংরক্ষণ কাজে যেই কোন ত্যাগ স্বীকার করতে বিন্দুমাত্রও কুণ্ঠিত হবে না।"

দ্রষ্টব্য : খিলাফাত ও রাজতন্ত্র, সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী, পৃষ্ঠা-৫১

৭। রাষ্ট্র পরিচালনায় নারী

রাষ্ট্র পরিচালনায় নারীর অংশগ্রহণ বিষয়ে সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেন,

"নারীর ব্যাপারে ইসলামের নীতি হলো, তারা সম্মান ও মর্যাদার দিক দিয়ে পুরুষের সমান, নৈতিক মানের বিচারেও সমান, আখিরাতে কর্মফলেও সমান, কিন্তু উভয়ের কর্মক্ষেত্র এক নয়। রাজনীতি, রাষ্ট্রীয় প্রশাসন, সামরিক কর্মকাণ্ড এবং এই জাতীয় অন্য যেইসব কাজ পুরুষের সেইসব কর্মক্ষেত্রে নারীকে টেনে আনার অনিবার্য পরিণাম এই হবে যে মুসলিমদের পারিবারিক জীবন ধ্বংস হয়ে যাবে যেখানে নারীর দায়িত্বই বেশি। তাছাড়া এতে নারীর ওপর দ্বিগুণ দায়িত্ব বর্তাবে। একদিকে তাকে তার প্রকৃতিগত দায়িত্ব পালন করতে হবে যাতে পুরুষ কোনক্রমেই অংশীদার হতে পারে না। তদুপরি পুরুষের দায়িত্বেরও অর্ধেক তার নিজের কাঁধে তুলে নিতে হবে। দ্বিগুণ দায়িত্ব পালন তো কার্যত সম্ভব নয়। কাজেই অনিবার্য রূপে প্রথম পরিণতিটাই দেখা দেবে।"

দ্রষ্টব্য : ইসলামী রাষ্ট্র ও সংবিধান, সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী, পৃষ্ঠা-৩৪৩

৮। ইসলামী রাষ্ট্রে অ-মুসলিম নাগরিক

ইসলামী রাষ্ট্রে অ-মুসলিমদের অধিকার সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী বলেন,

"অ-মুসলিম নাগরিকের রক্তের মূল্য মুসলিম নাগরিকের রক্তের মূল্যের সমান। কোন মুসলিম যদি কোন অ-মুসলিম নাগরিককে হত্যা করে, তাহলে একজন মুসলিম নাগরিককে হত্যা করলে যেমন তাকে মৃত্যু দণ্ড দেয়া হতো, ঠিক তেমনি মৃত্যুদণ্ড দেয়া হবে।"

দ্রষ্টব্য : ইসলামী রাষ্ট্র ও সংবিধান, সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী, পৃষ্ঠা-৩৯১

"ফৌজদারী দণ্ডবিধি মুসলিম অ-মুসলিম সকলের জন্য সমান। অপরাধের যেই সাজা মুসলিমকে দেয়া হবে, অ-মুসলিম নাগরিককেও সেই সাজাই দেয়া হবে। অ-মুসলিমের জিনিস যদি মুসলিম চুরি করে কিংবা মুসলিমের জিনিস যদি অ-মুসলিম চুরি করে, উভয় ক্ষেত্রেই চোরের হাত কেটে ফেলা হবে। কারো ওপর ব্যভিচারের অপবাদ আরোপ করা হলেও আরোপকারী মুসলিম হোক আর অ-মুসলিম হোক একই শাস্তি দেয়া হবে। ব্যভিচারের শাস্তিও মুসলিম ও অ-মুসলিমের জন্য একই রকম। তবে মদের বেলায় অ-মুসলিমদেরকে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে।"

দ্রষ্টব্য : ইসলামী রাষ্ট্র ও সংবিধান, সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী, পৃষ্ঠা-৩৯২

"দেওয়ানী আইনেও মুসলিম ও অ-মুসলিম সমান। "তাদের সম্পত্তি আমাদের সম্পত্তির মতো," আলী ইবনু আবি তালিবের (রা) এই উক্তির তাৎপর্য এই যে মুসলিমদের সম্পত্তি যেইভাবে হিফাজাত করা হয় অ-মুসলিমদের সম্পত্তিও সেইভাবে হিফাজাত করা হবে।... ব্যবসায়ের যেই সব পন্থা মুসলিমদের জন্য নিষিদ্ধ, সেইসব পন্থা তাদের জন্যও নিষিদ্ধ। তবে অ-মুসলিমরা শুকরের ব্যবসা ও মদের ব্যবসা করতে পারবে।"

দ্রষ্টব্য : ইসলামী রাষ্ট্র ও সংবিধান, সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী, পৃষ্ঠা-৩৯২

"কোন মুসলিমকে জিহ্বা বা হাত-পা দিয়ে কষ্ট দেয়া, গালি দেয়া, মারপিট করা বা গীবাত করা যেমন অ-বৈধ, তেমনি এই সব কাজ অ-মুসলিমদের বেলায়ও অ-বৈধ।

দ্রষ্টব্য : ইসলামী রাষ্ট্র ও সংবিধান, সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী, পৃষ্ঠা-৩৯২

"অ-মুসলিমদের ঘরোয়া কর্মকাণ্ড তাদের নিজস্ব পার্সোনাল ল অনুসারে স্থির করা হবে। তাদের ওপর ইসলামী আইন কার্যকর করা হবে না। মুসলিমদের ঘরোয়া

জীবনে যেইসব জিনিস অ-বৈধ তা যদি তাদের ধর্মীয় আইনে বৈধ হয় তাহলে ইসলামী আদালত তাদের আইন অনুসারেই ফায়সালা করবে।"

দ্রষ্টব্য : ইসলামী রাষ্ট্র ও সংবিধান, সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী, পৃষ্ঠা-৩৯৩

"অ-মুসলিম নাগরিকরা সামরিক দায়িত্বমুক্ত। শত্রুর আক্রমণ থেকে দেশকে রক্ষা করা শুধু মুসলিমদের দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত। কারণ একটি আদর্শভিত্তিক রাষ্ট্রের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কেবল তারাই উপযুক্ত বিবেচিত হতে পারে যারা ঐ আদর্শকে সঠিক বলে মেনে নেয়। তাছাড়া লড়াইতে নিজেদের আদর্শ ও মূলনীতি মেনে চলাও তাদের পক্ষেই সম্ভব। অন্যরা দেশ রক্ষার জন্য লড়াই করলে ভাড়াটে সৈন্যের মতো লড়বে এবং ইসলামের নির্ধারিত নৈতিক সীমা রক্ষা করে চলতে পারবে না। এই জন্য ইসলাম অ-মুসলিমদেরকে সামরিক দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দিয়েছে এবং কেবলমাত্র দেশ রক্ষার ব্যয় নির্বাহে নিজেদের অংশ প্রদানকে কর্তব্য বলে চিহ্নিত করেছে। এটাই জিয্ইয়ার আসল তাৎপর্য ও উদ্দেশ্য। এটা শুধু যে আনুগত্যের প্রতীক তা নয় বরং সামরিক কর্মকাণ্ড থেকে অব্যাহতি লাভ ও দেশ রক্ষার বিনিময়ও বটে। এই জন্য জিয্ইয়া শুধুমাত্র যুদ্ধ করতে সক্ষম পুরুষদের ওপরই আরোপ করা হয়। আর মুসলিমরা যদি কখনো অ-মুসলিমদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে অক্ষম হয়, তাহলে জিয্ইয়ার টাকা ফেরত দেয়া হয়।"

দ্রষ্টব্য : ইসলামী রাষ্ট্র ও সংবিধান, সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী, পৃষ্ঠা-৩৯৭, ৩৯৮

৯। ইসলামী অর্থনীতি

সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (রহ) লক্ষ্য করেন যে অর্থব্যবস্থার প্রশ্নে মুসলিমরা বিভ্রান্তির সাগরে হাবুডুবু খাচ্ছে। কেউ কেউ পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থাকেই ইসলামী অর্থব্যবস্থা গণ্য করতে থাকেন। কেউ বা আবার সমাজবাদী অর্থব্যবস্থাকেই ইসলামী অর্থব্যবস্থা বলা শুরু করেন। তদুপরি কোন কোন চিন্তাবিদ ইসলাম ও সমাজবাদী অর্থনীতির সংমিশ্রণে "ইসলামী সমাজতন্ত্র" নামে নতুন একটি মতবাদ চালু করার চেষ্টা করেন। এই নাজুক অবস্থায় আলকুরআন ও আলহাদীসের মূলনীতিগুলোকে সামনে নিয়ে এসে সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী দেখালেন যে ইসলামী অর্থব্যবস্থা পুঁজিবাদও নয়, সমাজবাদও নয়– এটি সম্পূর্ণরূপে স্বতন্ত্র এক অর্থব্যবস্থা। তাছাড়া তিনি ঐ দুইটি প্রান্তিক অর্থনৈতিক মতবাদের মুকাবিলায় অত্যন্ত সার্থকভাবে ইসলামী

অর্থব্যবস্থার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করে লোকদেরকে নতুন জ্ঞানের আলোকে আলোকিত করে তুললেন।

পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থা ও তার পরিণতি সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী বলেন,

"পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থার ভিত্তি যেই মতবাদের ওপর প্রতিষ্ঠিত তার মূল কথা হচ্ছে : প্রত্যেক ব্যক্তি একাই তার স্বোপার্জিত সম্পদের মালিক। তার উপার্জিত সম্পদে অন্য কারো কানাকড়ি অধিকার নেই। নিজের সম্পদকে সে যেইভাবে ইচ্ছা সেইভাবে ব্যয় করতে পারে। অর্থ-উপার্জনের যেইসব উপায়-উপকরণ তার আয়ত্তাধীন থাকে সেইগুলো কুক্ষিগত করে রাখার এবং ব্যক্তিগত স্বার্থ উদ্ধার ব্যতিরেকে তা ব্যবহার না করার অধিকার তার রয়েছে। প্রত্যেক মানুষের মধ্যে যেই স্বাভাবিক স্বার্থপরতা রয়েছে তা থেকেই পুঁজিবাদের জন্ম। এর পরিপূর্ণ রূপটি এমন মারাত্মক পর্যায়ে উপনীত হয় যা মানব সমাজের কল্যাণ ও উন্নতির জন্য অপরিহার্য গুণাবলীকে স্তিমিত ও নিষ্প্রভ করে দেয়। নৈতিক দৃষ্টিকোণ বাদ দিয়ে নিছক অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলেও দেখা যাবে যে এই মতবাদের অনিবার্য পরিণতিতে সম্পদ বণ্টনের ভারসাম্য বিপর্যস্ত হয়েছে। সম্পদ আহরণের উপায়-উপকরণগুলো ক্রমাগতভাবে একটি অধিকতর ভাগ্যবান বা অপেক্ষাকৃত বেশি সতর্ক মানবগোষ্ঠীর কুক্ষিগত হয়েছে। ফলে বাস্তবে সমাজ দুইটি শ্রেণীতে বিভক্ত হয়ে পড়েছে :

একটি হচ্ছে বিত্তশালী শ্রেণী ও অপরটি বিত্তহীন শ্রেণী। বিত্তশালী শ্রেণী সম্পদ আহরণের যাবতীয় উপায়-উপকরণ কুক্ষিগত করে কেবলমাত্র নিজের ব্যক্তিগত স্বার্থোদ্ধারে তা ব্যয় করে ও নিজের সম্পদ আরো বাড়াবার জন্য সমাজের সামগ্রিক স্বার্থ বিসর্জন দেয়। আর বিত্তহীন হতভাগ্যের দল ধন-সম্পদের যাবতীয় অংশ ও সুযোগ-সুবিধা থেকে চিরতরে বঞ্চিত হয়। বিত্তবানদের স্বার্থের ঘানি টানার জন্য জীবন পাত করে দিনান্তে নিজের পেটপূর্তির জন্য সামান্য উপাদান সংগ্রহ করা ছাড়া তাদের গত্যন্তর থাকে না। এই ধরনের অর্থব্যবস্থা এক দিকে সুদখোর মহাজন, কারখানা-মালিক ও অত্যাচারী জমিদার শ্রেণীর উদ্ভব ঘটায়, অন্যদিকে সৃষ্টি করে ঋণভারে জর্জরিত ও অধিকার বঞ্চিত শ্রমিক-মজুর-কৃষকদের এক সর্বহারা শ্রেণী।"

"এই অর্থব্যবস্থা যেই সমাজে প্রতিষ্ঠিত হয় সেই সমাজ থেকে স্বাভাবিকভাবেই দয়া-মায়া, সহৃদয়তা-সহানুভূতি ও পারস্পরিক সহযোগিতার মনোভাব বিলুপ্ত হয়ে যায়। সেই সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তিই সম্পূর্ণত নিজের ব্যক্তিগত আয়-

উপার্জনের উপর নির্ভর করে জীবন যাপন করতে বাধ্য হয়। সেখানে কেউ কারো সাহায্য করে না, কেউ কারো বন্ধু হয় না। অভাবী ও দরিদ্রের জীবন সংকীর্ণতর ও দুর্বিষহ হয়ে উঠে। সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তিই বেঁচে থাকার সংগ্রামে লিপ্ত হয়। একে অন্যের বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক ও প্রতিহিংসামূলক প্রচেষ্টা ও কর্মে অবতীর্ণ হয়। সর্বাধিক পরিমাণ অর্থ ও জীবন যাপনের সামগ্রী লাভ করার জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করে নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য সেইগুলো কুক্ষিগত করে রাখে এবং কেবলমাত্র সম্পদ বৃদ্ধির কাজে সেইগুলো ব্যবহার করে। আর যারা এই সম্পদ সঞ্চয় ও বৃদ্ধির অভিযানে ব্যর্থ হয় দুনিয়ার বুকে তাদের কোন সহায় থাকে না। তাদের জন্য ভিক্ষাও সহজলভ্য হয় না। তাদের জন্য কারো মনে করুণাও জাগে না। তাদের সাহায্যের জন্য একটি হাতও প্রসারিত হয় না। এরপর তাদের সামনে দুইটি মাত্র পথ খোলা থাকে : হয় আত্মহত্যা করা নয়তো অপরাধমূলক নিকৃষ্ট বৃত্তি অবলম্বন করে ক্ষুধার জ্বালা নিবারণ করা।"

দ্রষ্টব্য : সুদ ও আধুনিক ব্যাংকিং, সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী, পৃষ্ঠা-২

অতঃপর সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী সমাজবাদী অর্থব্যবস্থা ও তার পরিণতি সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন,

"এই অর্থব্যবস্থার মূল কথা হচ্ছে : অর্থ উৎপাদনের যাবতীয় উপায়-উপকরণ সমাজের সম্মিলিত মালিকানায় থাকবে। কোন বস্তুকে ব্যক্তিগত মালিকানার অন্ত র্ভুক্ত করে নিজের ইচ্ছামতো ব্যবহার করার ও তা থেকে ব্যক্তিগতভাবে মুনাফা অর্জন করার অধিকার কারো নেই। সমাজের সম্মিলিত স্বার্থে ব্যক্তি যেইসব কাজ করবে কেবলমাত্র সেই কাজগুলোর পারিশ্রমিক সে পাবে। তার জীবন যাপনের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ সরবরাহ করার দায়িত্ব গ্রহণ করবে সমাজ। আর তাকে সমাজের নির্দেশ মতো কাজ করে যেতে হবে।"

দ্রষ্টব্য : সুদ ও আধুনিক ব্যাংকিং, সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী, পৃষ্ঠা-৩

সমাজবাদ "ধন বন্টনের ক্ষেত্রে সমতা ও ভারসাম্য প্রতিষ্ঠিত করার জন্য যেই পদ্ধতি অবলম্বন করে তাকে 'মানব প্রকৃতির সাথে যুদ্ধ' বলা যায়। ব্যক্তি-মালিকানা অধিকার থেকে ব্যক্তিকে বঞ্চিত করে তাকে সম্পূর্ণরূপে সমাজের একজন কর্মচারী ও দাসে পরিণত করা শুধু অর্থব্যবস্থার ক্ষেত্রেই নয়, ব্যাপকার্থে মানুষের সমগ্র তামাদ্দুনিক জীবনের জন্য ক্ষতি ও ধ্বংসের বার্তাবহ। কারণ এর ফলে অর্থনৈতিক কাজ-কারবার ও তামাদ্দুনিক ব্যবস্থার প্রাণ-প্রবাহ ও তার প্রেরণা শক্তি নিঃশেষিত হয়ে যায়।"

"এই ব্যবস্থার বাস্তব দিক হচ্ছে এই যে সমাজের কয়েকজন ব্যক্তি পুঁজিপতিকে খতম করে একজন মাত্র বিরাট পুঁজিপতির উদ্ভব ঘটানো হয়। সেই পুঁজিপতি হচ্ছে কমিউনিস্ট (বা সমাজতান্ত্রিক) সরকার। অকমিউনিস্ট সরকারের পুঁজিপতিদের মধ্যে যেই সামান্য সুকোমল মানবিক বৃত্তি ও ভাবধারা দেখা যায় কমিউনিস্ট (বা সমাজতান্ত্রিক) সরকার রূপ এই পুঁজিপতির মধ্যে তার ছিটেফোঁটাও দেখা যায় না। এই বিরাট পুঁজিপতি একটি নিষ্প্রাণ যন্ত্রের মতো ব্যক্তির নিকট থেকে কাজ আদায় করে নেয়। আবার যন্ত্রের মতো একাধিপত্য ও স্বৈরতান্ত্রিক পদ্ধতিতে তাদের মধ্যে জীবন ধারণের উপকরণ বণ্টন করে। দুঃখ-বেদনার স্বাভাবিক মানবিক সমবেদনাটুকু বা যোগ্যতা, দক্ষতা ও আন্তরিকতার কোন কদর ও স্বীকৃতি নেই এখানে। এই বিরাট পুঁজিপতি মানুষকে মানুষের মতো নয়, যন্ত্রের কল-কব্জার মতো খাটায়। মানুষের চিন্তা ও কর্মের স্বাধীনতা কেড়ে নেয়। কঠোর নির্যাতন ও স্বৈরতন্ত্র ছাড়া সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হলেও টিকে থাকতে পারে না। কারণ এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে মানব-প্রকৃতি সর্বক্ষণ বিদ্রোহের জন্য প্রস্তুত থাকে।"

দ্রষ্টব্য : সুদ ও আধুনিক ব্যাংকিং, সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী, পৃষ্ঠা-৫ ও ৬

সংক্ষিপ্তাকারে পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থা ও সমাজবাদী অর্থব্যবস্থার পরিচয় তুলে ধরার পর সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (রহ) ইসলামী অর্থব্যবস্থার ওপর আলোকপাত করতে গিয়ে বলেন,

"এই দুইটি পরস্পর বিরোধী অর্থব্যবস্থার মাঝখানে ইসলাম একটি ভারসাম্যপূর্ণ ব্যবস্থা কায়েম করে। ইসলামী অর্থব্যবস্থার মূলনীতি হচ্ছে : ব্যক্তিকে অবশ্যই তার পরিপূর্ণ স্বাভাবিক ব্যক্তিগত অধিকার দান করতে হবে এবং এই সংগে এটাও নিশ্চিত করতে হবে যে ধন-বণ্টনের ভারসাম্যও বিনষ্ট হতে পারবে না। ইসলামী অর্থব্যবস্থা একদিকে ব্যক্তিকে মালিকানার অধিকার ও নিজের ধন-সম্পদ ব্যয় ব্যবহার করার অধিকার দেয়, অন্যদিকে এই অধিকারের ওপর কতগুলো নৈতিক বিধি-নিষেধ আরোপ করে। এর ফলে কোন স্থানে অর্থ-সম্পদ ও উৎপাদনের উপকরণ অস্বাভাবিকভাবে কেন্দ্রিভূত হবার আশংকা থাকে না। অর্থ-সম্পদ ও উৎপাদন উপকরণ হামেশা আবর্তিত হতে থাকে। এই আবর্তন এমনভাবে চলতে থাকে যে সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তি তা থেকে নিজের প্রয়োজনীয় অংশটুকু লাভ করতে পারে।"

দ্রষ্টব্য : সুদ ও আধুনিক ব্যাংকিং, সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী, পৃষ্ঠা-৬ ও ৭

"অর্থনৈতিক জীবনে ব্যক্তির ব্যক্তিগত স্বার্থ ও সকল ব্যক্তির সমষ্টিগত স্বার্থ পরস্পর গভীর সম্পর্কযুক্ত। তাই উভয়ের মধ্যে সংঘর্ষ ও বিরোধের পরিবর্তে সমঝোতা ও সহযোগিতা বর্তমান থাকা প্রয়োজন। ব্যক্তি যদি সামষ্টিক স্বার্থের বিরুদ্ধে প্রচেষ্টা চালিয়ে সমাজের সম্পদ নিজের নিকট কেন্দ্রিভূত করে ও তা ব্যয় করার ব্যাপারে নিছক নিজের স্বার্থের প্রতি দৃষ্টি রাখে তাহলে এর ফলে শুধু সমাজই ক্ষতিগ্রস্ত হবে না বরং শেষ পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিও এই ক্ষতির শিকার হবে। অনুরূপভাবে সমাজ ব্যবস্থা যদি এমনভাবে গঠিত হয় যেখানে সমাজের স্বার্থে ব্যক্তি স্বার্থকে বিসর্জন দিতে হয় তাহলে শুধু ব্যক্তিই ক্ষতিগ্রস্ত হবে না, বরং শেষ পর্যায়ে গিয়ে সমাজও ক্ষতিগ্রস্ত হবে। কাজেই ব্যক্তির সমৃদ্ধির মধ্যেই সমাজের কল্যাণ এবং সমাজের সমৃদ্ধির মধ্যেই ব্যক্তির কল্যাণ। ..... প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের ব্যক্তিগত লাভ ও স্বার্থ উদ্ধারের জন্য প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবে, কিন্তু এই প্রচেষ্টা এমনভাবে চালাতে হবে যাতে অন্যের ক্ষতি না হয়। প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের সামর্থ্য অনুযায়ী অর্থ সম্পদ উপার্জন করবে, কিন্তু তার উপার্জিত সম্পদে অন্যের অধিকারও থাকবে। প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের সম্পদের বিনিময়ে অন্যের নিকট থেকে মুনাফা অর্জন করবে এবং অন্যকেও তার নিকট থেকে মুনাফা অর্জনের সুযোগ দেবে। এই মুনাফা বণ্টন ও অর্থ আবর্তনের ধারাবাহিকতা জারি রাখার জন্য ব্যক্তিদের মাঝে কতিপয় নৈতিক গুণ সৃষ্টি করাই যথেষ্ট নয়, বরং এই সংগে সমাজে এমন আইন প্রতিষ্ঠিত করতে হবে যাতে অর্থ উপার্জন ও ব্যয় ব্যবস্থাকে ভারসাম্যপূর্ণভাবে পরিচালিত করা যায়। এর অধীনে কাউকে ক্ষতিকর উপায়ে অর্থ-উপার্জনের অধিকার দেয়া যাবে না। যেই অর্থ ও সম্পদ বৈধ উপায়ে অর্জিত হয়েছে তাও একস্থানে কেন্দ্রিভূত হয়ে থাকবে না বরং তা ব্যয়িত ও দ্রুত আবর্তিত হতে থাকবে।"

দ্রষ্টব্য : সুদ ও আধুনিক ব্যাংকিং, সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী, পৃষ্ঠা-৭, ৮

এই মৌলিক কথাগুলো উপস্থাপনের পর সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী "সুদ ও আধুনিক ব্যাংকিং" গ্রন্থে ইসলামী অর্থনীতির বিভিন্ন দিক বিশদভাবে তুলে ধরেন। অর্থনীতি সংক্রান্ত তাঁর গ্রন্থ পড়ার পর কোন ব্যক্তিরই বুঝার বাকি থাকে না যে ইসলামের অর্থব্যবস্থা একটি পূর্ণাঙ্গ অর্থব্যবস্থা, একটি নির্ভুল অর্থব্যবস্থা ও একটি ভারসাম্যপূর্ণ অর্থব্যবস্থা। ইসলামী অর্থব্যবস্থা সম্পর্কে অজ্ঞতার কারণে বহু সংখ্যক প্রতিভাবান যুবক সমাজবাদের খপ্পরে পড়ে দিক-ভ্রান্ত হয়েছে। সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদীর গ্রন্থ বিপুল সংখ্যক যুবককে ইসলামী অর্থব্যবস্থা সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা লাভ করতে ও এর শ্রেষ্ঠত্ব উপলব্ধি করতে সাহায্য করেছে।

সারা দুনিয়ায় অর্থনীতিকে ইসলামী ধাঁচে ঢেলে সাজানোর যেই প্রয়াস চলছে ও

ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠার আন্দোলন এগিয়ে চলছে এর পেছনে সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদীর অর্থ-চিন্তার বিরাট ভূমিকা রয়েছে।

১০। বাড়তি জনসংখ্যা

যুগে যুগে স্থূল বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিরা জনসংখ্যা বৃদ্ধিকে সমস্যা হিসাবে দেখেছেন। তাঁরা ভেবেছেন, এইভাবে মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকলে এক সময়ে এসে মানব সভ্যতা ধ্বংসের মুখোমুখি হবে।

পক্ষান্তরে সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (রহ) জনসংখ্যা বৃদ্ধির কল্যাণকর দিক অত্যন্ত সুন্দরভাবে, বলিষ্ঠভাবে, যুক্তিপূর্ণভাবে বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন, জনসংখ্যা আপদ নয়, সম্পদ।

তিনি বলেন, "ম্যালথাস ও ফ্রান্সিস প্লাস সংখ্যাতত্ত্ব বিশেষজ্ঞদের ন্যায় অত্যন্ত জোরের সাথে যেই জ্যামিতিক হারের কাহিনী প্রচার করছিলেন, ইতিহাসে মানুষের বংশধরদের এই হারে কখনও বাড়তে দেখা যায়নি। আর জনসংখ্যা ও খাদ্যোপকরণের মধ্যে যেই অনুপাতের হিসেব তাঁরা প্রকাশ করেছেন, সেই অনুপাতও আজ পর্যন্ত কোথাও সঠিক বলে প্রমাণিত হয়নি। যদি তাঁদের হিসেব ঠিক হতো তাহলে ধরাপৃষ্ঠ হতে বহু আগেই মানুষের বংশ নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতো। আর এই বিষয়ে আলোচনা করার জন্য আজ আমাদের একত্রিত হবার কোন সুযোগই ঘটতো না।

এটা একটা স্বীকৃত সত্য, আর স্বীকৃত বলেই সম্ভবত এই বিষয়ে কারো মনোযোগ আকৃষ্ট হয় না যে, মানুষ সেই পৃথিবীতেই বসবাস করছে যা মানুষের জন্মের বহু পূর্ব থেকেই বিদ্যমান ছিল এবং পূর্ব থেকেই মানুষের জীবন যাপন, স্থায়িত্ব, সভ্যতা ও সংস্কৃতির তরক্কীর জন্য জরুরী যাবতীয় উপায়-উপাদান প্রস্তুত করা হয়েছিল। মানুষ এসে কোন জিনিসই সৃষ্টি করেনি বরং এখানে পূর্ব থেকে যা মওজুদ ছিল তার সঙ্গে নিজেদের শ্রম ও বুদ্ধি যোগ করে এগুলো বিভিন্ন পদ্ধতিতে ব্যবহার করেছে মাত্র। মানুষের সর্বপ্রথম ব্যক্তি থেকে শুরু করে বর্তমান সময়ের বিশাল মানব গোষ্ঠীর প্রয়োজন পূরণ করার উপযোগী কোন একটি বস্তুও এমন নয় যা পূর্ব থেকে মওজুদ ছিল না। আর একথাও সম্ভবত কেউ অস্বীকার করতে পারছে না যে, মানুষের ভবিষ্যৎ প্রয়োজন পূরণ করার যাবতীয় উপকরণও মহাশূন্য, ভূপৃষ্ঠ, ভূগর্ভ, সাগরতল, কোথাও না কোথাও নিশ্চয়ই মওজুদ রয়েছে। মানুষ এসব বস্তু সৃষ্টি করতেও পারে না এবং এদের অবস্থান, পরিমাণ ও আবিষ্কৃত হয়ে ব্যবহারে আসার সময় নির্ধারণ করার

ব্যাপারেও মানুষের কোন হাত নেই। যেই কোন ব্যক্তি খোদার অস্তিত্বে অথবা 'প্রকৃতি' নামীয় অন্ধ ক্ষমতায় বিশ্বাসী হোক না কেন তাকেই বাস্তব সত্য স্বীকার করে নিতেই হবে যে, পৃথিবীর বুকে মানুষের আবির্ভাব হয়েছে যার পরিকল্পনা, তিনি মানুষের সঠিক প্রয়োজন হিসেব করে সকল দ্রব্যসামগ্রী পূর্ব থেকেই সরবরাহ করেছেন।

এসব দ্রব্যসামগ্রী সর্বকালে ও সর্বযুগে মানুষের চোখের সামনে ছিল না। প্রথমে মানুষ যখন এখানে এসেছিল তখন মাটি, পাথর, গাছপালা ও বন্য পশু ছাড়া অর্থনৈতিক অন্য কোন উপাদান তারা দেখতে পায়নি। কিন্তু যেদিন এদের সংখ্যা বাড়তে শুরু করে এবং বাঁচার তাকিদে মানুষ অধিকতর পরিশ্রম করতে বাধ্য হয়, অমনি বিপুল সম্পদের ভাণ্ডার উত্তরোত্তর তাদের হস্তগত হতে থাকে। প্রয়োজনের তাকিদেই মানুষ নূতন নূতন উপকরণ খুঁজে বের করেছে এবং পুরাতন দ্রব্যাদির নূতন নূতন ব্যবহার-প্রণালী আবিষ্কার করেছে। মানব জাতির সমগ্র ইতিহাসে এমন একটি মুহূর্তের সন্ধান পাওয়া যায় না যখন মানুষের বংশ বিস্তার লাভ করেছে অথচ জীবন যাপনের উপায়-উপাদান বাড়েনি। মানুষ বার বার এই ভুল ধারণা করেছে যে, বিশ্বে যাবতীয় সম্পদ তাদের হস্তগত হয়ে গেছে এবং বর্তমানে চোখের সামনে যেই উপায়-উপকরণ দেখা যাচ্ছে শুধু এগুলোর উপর নির্ভর করেই মানব জাতির পরবর্তী বংশধরদের দিন গুজরান করতে হবে। কিন্তু একবার নয়, শত শত বার মানুষের এই অভিজ্ঞতা লাভের সুযোগ ঘটেছে যে, মানুষের বংশ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এমন সব স্থান থেকে বিপুল সম্পদের ভাণ্ডার বের হয়ে এসেছে যে, মানুষ পূর্বে এই সম্পর্কে কোন ধারণাই করতে পারেনি।

হযরত ঈসার (আ) জন্মের হাজার বছর পূর্ব থেকে মানুষ চুলার উপর বসানো হাড়ির মুখ থেকে বাষ্প বের হতে দেখেছে। কিন্তু হযরত ঈসার (আ) আবির্ভাবের সতেরোশ' বছর পর পর্যন্তও মানুষ কল্পনা করতে পারেনি যে আঠারো শতকের মাঝামাঝি এ বাষ্প থেকেই রিযকের অসংখ্য উৎস আবিষ্কৃত হবে।

সভ্যতার সূচনা থেকেই মানুষ জ্বালানী তৈল ও দাহিকা শক্তি সম্পর্কে অবগত ছিল, কিন্তু উনিশ শতকের মধ্যভাগে কেউ একথা জানতো না যে, অবিচরেই পৃথিবীর বুক চিরে পেট্রোলের প্রস্রবণ বের হয়ে আসবে এবং এর সঙ্গে সঙ্গে মোটর, বিমান, শিল্প ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এক নয়া মোড় পরিবর্তন করে দেবে। স্মরণাতীত কাল থেকে মানুষ ঘর্ষণের ফলে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ সৃষ্টি হতে দেখেছে কিন্তু হাজার হাজার বছর পর ইতিহাসের বিশেষ পর্যায়ে এসে বিদ্যুতের রহস্য

মানুষের কাছে ধরা পড়েছে এবং এর ফলে শক্তির এক বিপুল ভাণ্ডার মানুষের হস্তগত হয়েছে। বর্তমান দুনিয়ায় অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যেভাবে এর ব্যবহার হচ্ছে মাত্র দেড়শত বছর আগে মানুষ তা কল্পনাও করতে পারেনি। আবার অণু (Atom) বিশ্লেষণযোগ্য কিনা এই বিষয়ে দার্শনিকদের মধ্যে হযরত ঈসার (আ) জন্মের বহু বছর পূর্ব থেকেই বিতর্ক চলে আসছিল। কিন্তু কে জানতো যে, বিংশ শতকে এসে এই ক্ষুদ্রাতি-ক্ষুদ্র অণু বিস্ফোরিত হবে এবং এর গর্ভ থেকে এত বিপুল শক্তি বের হয়ে আসবে যে, এই পর্যন্ত মানুষের জ্ঞাত সকল শক্তি এর তুলনায় নগণ্য মনে হবে।

অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ও এর উপকরণাদির মধ্যে উপরোল্লেখিত পরিবর্তন সাধিত হয়েছে গত দু'শো বছরের মধ্যে এবং এসব পরিবর্তনের ফলে পৃথিবীতে জীবন যাপনের বস্তুসামগ্রী ও উপকরণাদি এত বেড়ে গেছে যে, মানুষ খৃস্টীয় আঠারো শতকে স্বপ্নেও তা ধারণা করতে পারতো না। এসব আবিষ্কারের পূর্বেই যদি কেউ তৎকালীন দুনিয়ার-উপায়-উপকরণের হিসেব করে জনসংখ্যাকে তদনুসারে নিয়ন্ত্রিত করার পরিকল্পনা করতো তা হলে সেটা যে কত বড় মূর্খতার কাজ হতো তা চিন্তা করে দেখা উচিত।

এই ধরনের হিসেব যারা করে, তারা শুধু যে বর্তমান সময়ের সীমাবদ্ধ জ্ঞানকে ভবিষ্যতের জন্যও যথেষ্ট মনে করার ভ্রান্তিতে নিমগ্ন হয় তাই নয় বরং তারা একথাও ভুলে যায় যে, জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে খাদ্য গ্রহণকারীর সংখ্যাই বেড়ে যায় না বরং সঙ্গে সঙ্গে উৎপাদন ও উপার্জনকারীর সংখ্যাও বাড়ে। অর্থনীতির নিয়মানুসারে তিনটি বিষয়কে উৎপাদনের উৎস মনে করা হয়। এই তিনটি হচ্ছে জমি, পুঁজি এবং জনশক্তি। এ তিনটির মধ্যে আসল ও সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে জনবল। কিন্তু অতিরিক্ত জনসংখ্যার দুশ্চিন্তায় যারা দিশে হারিয়ে ফেলেন তারা মানুষকে উৎপাদনকারীর পরিবর্তে নিছক সম্পদ ব্যবহারকারী হিসেবেই গণ্য করেন এবং সম্পদ উৎপাদনকারী হিসাবে জনশক্তির ভূমিকাকে পুরোপুরি উপেক্ষা করে থাকেন। তারা একথা চিন্তাও করেন না যে, মানব জাতি অতিরিক্ত জনসংখ্যাসহ বরং তার বদৌলতেই এই পর্যন্তকার যাবতীয় উন্নতি সাধনে সক্ষম হয়েছে। বর্ধিত জনসংখ্যা শুধু যে নয়া নয়া কর্মক্ষেত্রের দ্বার খুলে দেয় তাই নয় বরং কাজের তাকিদ সৃষ্টি করে থাকে। প্রতিদিন বাড়তি জনসংখ্যার খাদ্য, পোশাক, আশ্রয় ও অন্যান্য প্রয়োজন পূরণের ব্যবস্থা করতে বাধ্য হওয়াই হচ্ছে বর্তমান উপায়-উপকরণের সম্প্রসারণ, নয়া উপায়-উপকরণ অনুসন্ধান এবং জীবনের সকল ক্ষেত্রে চিন্তা-গবেষণা করার কঠোর তাকিদ। এই তাকিদের

দরুনই পতিত জমিতে চাষাবাদ করতে হয়। বালিয়াড়ি, ঝোঁপঝাড় ও সমুদ্রের তলদেশ থেকে কৃষিযোগ্য জমি বের করা হয়, চাষাবাদের নয়া নয়া পদ্ধতি আবিষ্কার করতে হয়, মাটি খুঁড়ে সম্পদ বের করা হয়। মোটকথা, বাড়তি জনসংখ্যার চাপেই মানুষ জলে, স্থলে ও অন্তরীক্ষে নিজেদের চেষ্টা সাধনা চালিয়ে যায়– জীবন যাপনের উপকরণ অনুসন্ধানের কাজে দ্রুত গতিতে অগ্রসর হয়। এই তাকিদের অবর্তমানে অলসতা ও নিষ্ক্রিয়তা এবং উপস্থিত ও বর্তমানের উপর সন্তুষ্ট থাকা ছাড়া আর কি বা হাসিল হতে পারে? সন্তানের বাড়তি সংখ্যাইতো একদিকে মানুষকে বেশী বেশী কাজ করতে বাধ্য করে এবং অপরদিকের কর্মক্ষেত্রে নূতন নূতন কর্মী আমদানী করে থাকে।"

দ্রষ্টব্য : ইসলামের দৃষ্টিতে জন্মনিয়ন্ত্রণ, সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী, পৃষ্ঠা ১৭

১১। মানব বংশবৃদ্ধি ও সভ্যতার অগ্রগতি

মানববংশ বৃদ্ধির সাথে সভ্যতার অগ্রগতির সম্পর্ক বিশদভাবে আলোচনা করতে গিয়ে সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী বলেন, "দুনিয়ার বিরাট কারখানা পরিচালনার জন্যে আল্লাহতায়ালা এক সর্বব্যাপী শক্তিশালী ব্যবস্থা করে রেখেছেন। এর মধ্যে একটি হচ্ছে খাদ্য বিষয়ক আর অপরটি বংশ বিস্তার। খাদ্য বিষয়ক ব্যবস্থার অর্থ হচ্ছে এই যে, বর্তমানে যেসব সৃষ্টির অস্তিত্ব আছে তাদেরকে এক নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত জীবিত থেকে কারখানার কাজ পরিচালনা করতে হবে। এ জন্যে মহান প্রতিপালক প্রভু প্রচুর খাদ্য সরবরাহ করেছেন। দেহের অভ্যন্তরস্থ অংশগুলোতে খাদ্য হজম করা এবং সেগুলোকে দেহের অংশে পরিণত করার ক্ষমতা দিয়েছেন। উপরন্তু এই উদ্দেশ্যেই খাদ্যের প্রতি সৃষ্টির একটা স্বাভাবিক আকর্ষণ সৃষ্টি করে দিয়েছেন। আর এর ফলেই তাদের প্রত্যেকে খাদ্য গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। এ ব্যবস্থার অভাবে প্রত্যেক দেহধারী (উদ্ভিদ জন্তু অথবা মানুষ) ধ্বংস হয়ে যেতো এবং সৃষ্টির এই বিরাট কারখানা শ্রী-হীন হয়ে পড়তো। কিন্তু স্রষ্টার নিকট সৃষ্টজীবের জীবন রক্ষার চাইতেও বংশবৃদ্ধির ব্যবস্থা বহাল রাখার গুরুত্ব বেশী। কেননা, ব্যক্তির জীবনকাল অত্যন্ত সীমাবদ্ধ এবং এ সীমাবদ্ধ আয়ু শেষ হবার আগেই দুনিয়ার কারখানাকে সচল রাখার জন্যে তার স্থান দখলকারী তৈরী হওয়া অত্যন্ত জরুরী। এই দ্বিতীয় ও মহান উদ্দেশ্য পূর্ণ করার জন্যেই স্রষ্টা সন্তানাদি জন্মের ব্যবস্থা করেছেন। সৃষ্টিকে পিতৃ ও মাতৃ শক্তিতে বিভক্ত করা, উভয়ের দৈহিক কাঠামোতে পার্থক্য রাখা, উভয়ের পরস্পরের প্রতি আকর্ষণ এবং দাম্পত্য জীবন কায়েম করার জন্য উভয় পক্ষের

মনে প্রবল আকাঙ্ক্ষা দান ইত্যাদি ব্যবস্থা থেকে একথা স্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে, উভয়ে যুক্ত হয়ে তাদের মরণের পূর্বেই খোদার সৃষ্ট দুনিয়াকে সচল ও সক্রিয় রাখার উপযুক্ত কর্মী তৈরী করার জন্যে সতত আগ্রহশীল। এ না হলে পিতৃ ও মাতৃ শক্তির পৃথক-পৃথক সৃষ্টিরই কোন প্রয়োজন হতো না।

পুনরায় লক্ষ্যণীয় যে, যেই জীবের সন্তান অনেক বেশী সংখ্যক হয় তাদের মধ্যে স্রষ্টা সন্তান লালন-পালন ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্যে খুব বেশী আগ্রহ ও স্নেহ-মমতা দান করেননি। কারণ এ সৃষ্ট জীবেরা শুধু বিপুল পরিমাণ সন্তান জন্মের কারণেই বংশ টিকিয়ে রাখে। কিন্তু যেসব জীবের সন্তান কম হয় তাদের মনে স্রষ্টা এত সন্তান বাৎসল্য দান করেছেন যে, মাতা-পিতা সন্তান বয়ঃপ্রাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত তাদের রক্ষণাবেক্ষণ করতে বাধ্য হয়। মানব সন্তান সকল সৃষ্ট জীবের তুলনায় দুর্বলতম হয়ে জন্মায় এবং তাকে দীর্ঘকাল মাতা-পিতার তত্ত্বাবধানে জীবন যাপন করতে হয়।

পক্ষান্তরে পশুদের যৌনক্ষুধা ঋতুভিত্তিক অথবা প্রকৃতিগত চাহিদার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। কিন্তু মানুষের যৌনক্ষুধা ঋতুভিত্তিক অথবা প্রকৃতিগত চাহিদার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না। এজন্যেই মানব জাতির মধ্যে নর ও নারী পরস্পরের সঙ্গে স্থায়ীভাবে প্রেম-প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ হতে বাধ্য হয়। এই দুটি জিনিসই মানুষকে সামাজিক জীবে পরিণত করে। আর এখান থেকেই পারিবারিক জীবনের বুনিয়াদ রচিত হয়। পরিবার থেকে বংশ আর বংশ থেকে গোত্র হয়। আর এভাবেই সভ্যতার বিশাল প্রাসাদ নির্মিত হয়ে থাকে।

এবার মানুষের গঠন বৈচিত্র্য দেখা যাক। জীব-বিজ্ঞান অধ্যয়নে জানা যায় যে, মানুষের দেহ গঠনে ব্যক্তিগত স্বার্থের চাইতে বংশধরের স্বার্থকে অধিক গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। আর মানুষের দেহে যত উপকরণ আছে, তার মধ্যে দেহের নিজস্ব কল্যাণের চাইতে ভবিষ্যৎ বংশধরদের কল্যাণের প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়েছে অনেক বেশী। মানব দেহের যৌন গ্রন্থিগুলো এ ব্যাপারে বিশেষ দায়িত্ব পালনে ব্যস্ত। এই গ্রন্থিগুলো একদিকে মানব দেহে 'হরমোন' (Hormon) বা জীবন রস সঞ্চার করে এবং এর ফলে দেহে একদিকে সৌন্দর্য, সুষমা, কমনীয়তা, সজীবতা, বুদ্ধিমত্তা, চলৎশক্তি, বলিষ্ঠতা ও কর্মশক্তি সৃষ্টি হয় এবং অপর দিকে এ যৌন গ্রন্থিই প্রজনন শক্তি সৃষ্টি করে নর ও নারীকে পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হতে বাধ্য করে। যেই সময় মানুষ বংশ বৃদ্ধির কাজে নিযুক্ত থাকার যোগ্য থাকে জীবনের সেই অংশেই তার যৌবন, সৌন্দর্য ও কর্মশক্তি বিদ্যমান থাকে। আর

যেই সময় সে সন্তান জন্মানোর অযোগ্য হয়ে পড়ে, জীবনের সে অংশটাই দৌর্বল্য ও বার্দ্ধক্যের জমানা। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যস্থিত গোপন সম্পর্ক রক্ষার দুর্বলতা আগমনের মানেই হলো মরণের অগ্রিম নোটিশ লাভ। যদি মানুষের দেহ থেকে তার যৌন গ্রন্থিকে বাদ দেয়া যায় তাহলে সে একদিকে যেমন মানব বংশবৃদ্ধির কাজে নিযুক্ত থাকার ব্যাপারে অসমর্থ হয়ে পড়ে তেমনি অপর দিকে তার মানবীয় যোগ্যতা এবং কর্ম-শক্তিও বহুলাংশে হ্রাস প্রাপ্ত হয়। কেননা যৌনগ্রন্থির অবর্তমানে দেহ ও মস্তিষ্কের শক্তি অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়ে।

নারীদেহ সৃষ্টিতে বংশবৃদ্ধির কাজটিকে পুরুষের দেহের তুলনায় অধিক গুরুত্ব দান করা হয়েছে। মনোযোগ সহকারে লক্ষ্য করলে মনে হয় যে, নারীদেহের যাবতীয় কল-কব্জা শুধু বংশরক্ষার উদ্দেশ্যেই সৃষ্টি করা হয়েছে। সে যখন যৌবনে পদার্পণ করে তখনই তার মাসিক ঋতুস্রাব শুরু হয়। এই ব্যবস্থা দ্বারা নারীদেহ প্রতি মাসেই গর্ভধারণের জন্য প্রস্তুত হতে থাকে। শুক্রকীট গর্ভাধারে স্থান লাভ করা মাত্রই নারীদেহে এক বিরাট বিপ্লব সাধিত হয়। ভাবী সন্তানের কল্যাণকারিতা তার সমগ্র দৈহিক ব্যবস্থার উপর সুস্পষ্টভাবে প্রভাব বিস্তার করে। তার জীবন রক্ষার জন্যে সর্বনিম্ন পরিমাণ দৈহিক শক্তি ছেড়ে দিয়ে অবশিষ্ট সমগ্র শক্তি সন্তান রক্ষণাবেক্ষণের কাজে নিয়োজিত হয়ে পড়ে। এ কারণেই নারীর স্বভাবেই স্নেহ, প্রীতি, ত্যাগ ও কষ্ট সহিষ্ণুতা (Altruism) বদ্ধমূল হয়ে যায়। আর এজন্যেই পিতৃত্বের সম্পর্কের তুলনায় মাতৃত্বের সম্পর্ক অধিকতর গভীর ও শক্তিশালী হয়ে গড়ে ওঠে। সন্তান প্রসবের পর নারী-দেহে দ্বিতীয় একটি বিপ্লব সংঘটিত হয় এবং এর ফলে নারী সন্তানকে দুধ পান করানোর জন্যে তৈরী হয়। এ সময় নারী দেহের দুগ্ধগ্রন্থিগুলো তার খাদ্যের উত্তম অংশকে টেনে নিয়ে সন্তানের জন্যে দুধ সরবরাহ করার কাজে নিয়োজিত থাকে এবং এখানেও নারীকে ভবিষ্যৎ বংশধরের জন্য আর এক দফা ত্যাগ স্বীকার করে নিতে হয়। সন্তানের জন্য দুধ সরবরাহ করার কাজ থেকে অবসর প্রাপ্তির সময় নিকটবর্তী হতে হতে নারী পুনরায় সন্তান ধারণের যোগ্য হয়ে উঠে। এই কার্যকারণ পরম্পরা নারীর বংশবৃদ্ধির যোগ্যতা থাকাকাল পর্যন্ত জারী থাকে। আর যখনই এই ব্যবস্থা বন্ধ হয়ে যায়, তখনই সে মরণের পথে পা বাড়ায়। বার্ধক্যের জমানা শুরু হতেই তার সৌন্দর্য ও সুষমা বিদায় নেয়; তার দৈহিক সজীবতা, কমনীয়তা ও আকর্ষণ খতম হয়ে যায় এবং দৈহিক যন্ত্রণা,

মানসিক নিরাশক্তি ইত্যাদির এমন এক নয়া যুগের সূচনা হয়, যার সমাপ্তি ঘটে মরণের সঙ্গেই। এ আলোচনা থেকে বুঝা গেল যে, নারী ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্য যত দিন জীবন ধারণ করে, ততদিনই তার জীবনের শ্রেষ্ঠ জমানা, আর জীবনের যে সময়টুকু নিজের জন্য বেঁচে থাকে সে সময়টা তার জন্যে অত্যন্ত কষ্টকর সময়।

এ বিষয়ে অ্যান্টন নেমিলোভ (Anton Nemilov) নামক জনৈক রুশীয় লেখক একটি চমৎকার বই লিখেছেন। বইটির নাম Biological Tragedy of Woman (বায়োলজিক্যাল ট্রাজিডী অব ওম্যান)। ১৯৩২ সালে লণ্ডনে এর ইংরেজী তরজমা প্রকাশিত হয়। উক্ত পুস্তক অধ্যয়নে জানা যায় যে, নারী-জন্মের উদ্দেশ্যই হচ্ছে মানব-বংশ রক্ষা। অন্যান্য গবেষক এবং বিশেষজ্ঞগণও এ ধরনের মত প্রকাশ করেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত লেখক ডাক্তার এলেক্সিস্ ক্যারেল (Alexis Carrel) তাঁর Man the Unknown (অজ্ঞাত জীব মানুষ) গ্রন্থে উপরোক্ত দৃষ্টিভঙ্গী পেশ করতে গিয়ে বলেন : "নারীর সন্তান জন্মদানের যে কর্তব্য এটা কি পরিমাণ গুরুত্বপূর্ণ তা আজও সঠিকভাবে উপলব্ধি করা হয়নি। এই দায়িত্ব প্রতিপালন করা নারীত্বের পূর্ণতার জন্য অপরিহার্য। সুতরাং নারীদের সন্তান ধারণ ও প্রতিপালনের দায়িত্ব থেকে বিরত রাখা নির্বুদ্ধিতা ছাড়া কিছুই নয়।"

যৌনবিজ্ঞান বিশেষজ্ঞ Dr. Oswald Schwarz (ডাঃ ওস্‌ওয়াল্ড সোরজ) তাঁর The Psychology of Sex (যৌন বিজ্ঞান সম্পর্কিত মনস্তত্ব) বইয়ে লিখেন :

"যৌন প্রেরণার অন্তর্নিহিত লক্ষ্য কি এবং এটি কোন্ উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্যে সৃষ্ট? এই প্রেরণার সম্পর্ক যে বংশবৃদ্ধির সঙ্গে, এটা সুস্পষ্ট। একথা উপলব্ধি করার ব্যাপারে জীব-বিজ্ঞান আমাদের সহায়তা করে থাকে। এটা একটা প্রমাণিত জৈবিক বিধান যে, দেহের প্রতিটি অংগ স্ব-স্ব দায়িত্ব পালনে তৎপর এবং প্রকৃতি এদের প্রতি যে দায়িত্ব অর্পণ করেছে তা পূরণ করার জন্য সতত উদগ্রীব। এ দায়িত্ব পালনে বাধা সৃষ্টি করলে জটিলতা ও বিপদ অনিবার্য। নারী দেহের বৃহত্তর অংশ গর্ভধারণ ও সন্তান জন্মানোর উদ্দেশ্যে সৃষ্ট। যদি কোন নারীকে তার দেহ ও মস্তিষ্কের এই দাবী পূরণ করা থেকে বিরত রাখা হয়, তাহলে সে দৈহিক ক্ষয় ও পরাজয়ের শিকারে পরিণত হয়। পক্ষান্তরে সে মা হতে পারার মধ্যে এক নয়া সৌন্দর্য ও মানসিক স্বাস্থ্য লাভ করে, যা তার দৈহিক ক্ষয়ক্ষতির উপর প্রাধান্য বিস্তার করে।" (১৭-পৃষ্ঠা)

এই লেখক আরো লিখেছেন :

"আমাদের দেহের প্রতিটি অংগ কাজ করতে চায় এবং কোনো অংগকে তার দায়িত্ব পালন থেকে নিরস্ত করলে এর পরিণতি স্বরূপ সমগ্র দৈহিক ব্যবস্থাপনায় বিশৃংখলা দেখা দেয়। একটি নারীর শুধু এজন্যে সন্তানের প্রয়োজন হয় না যে, তার মাতৃত্ব এটা দাবী করে অথবা সে মাতৃত্বের দায়িত্ব পালনকে তৎপ্রতি আরোপিত একটি নৈতিক দায়িত্ব বলে বিবেচনা করে, বরং এজন্যে তার সন্তানের প্রয়োজন যে, তার দৈহিক ব্যবস্থাপনা শুধু এই উদ্দেশ্যেই বিন্যস্ত হয়েছে। যদি তার দেহের এই সৃষ্টি-কার্যকে বন্ধ করে দেয়া হয়, তাহলে সমগ্র দৈহিক ব্যবস্থাপনায় এক শূন্যতা, বঞ্চনা ও পরাজয়ের অবস্থা সৃষ্টি হয়।"

এই আলোচনা থেকে এবং কোরআন মজিদে বর্ণিত তথ্য থেকে পরিষ্কার বুঝা যায় যে, নারী ও পুরুষের মধ্যে দাম্পত্য সম্পর্ক স্থাপনের মূল উদ্দেশ্য বংশবৃদ্ধি এবং এই সঙ্গে দ্বিতীয় উদ্দেশ্য হচ্ছে পারিবারিক জীবন যাপন করে মানবীয় তমদ্দুনের ভিত্তি স্থাপন। আল্লাহ তায়ালা নর ও নারীর মধ্যে যে আকর্ষণ ও উভয়ের দাম্পত্য জীবনে যে আনন্দ দান করেছেন তা শুধু এজন্যে, যেন মানুষ তার মজ্জাগত প্রেরণার চাপে আসল উদ্দেশ্য সিদ্ধির পথে অগ্রসর হতে পারে। এখন যে ব্যক্তি দাম্পত্য জীবনের সুখ ও আনন্দ উপভোগ করতে চায় অথচ এর পরিণতিকে মেনে নিতে প্রস্তুত হয় না, সে খোদার সৃষ্টিতে (খালকুল্লাহ) পরিবর্তন সাধন করার ইচ্ছা পোষণ করে। আল্লাহ তায়ালা তাকে যেসব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ মানব বংশ বৃদ্ধির জন্যে দান করেছেন সেগুলোকে সে আসল উদ্দেশ্য থেকে ফিরিয়ে নিয়ে নিছক নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্যে নিয়োগ করে। এমন ব্যক্তির সঙ্গে এর তুলনা করা যেতে পারে যে শুধু রসনা তৃপ্তির জন্যে ভাল ভাল খাদ্য চিবিয়ে গিলে ফেলার পরিবর্তে বাইরে নিক্ষেপ করে। আত্মহত্যাকারী ব্যক্তির মত এক ব্যক্তি দাম্পত্য জীবনের সুখ উপভোগ করে যদি মানব বংশবৃদ্ধির পথ বন্ধ করে, তাহলে সে নিজেরই ভবিষ্যৎ বংশকে হত্যা করে। এটাকে আত্মবংশ-হত্যা বলা খুবই সংগত। শুধু তাই নয়– বরং আমি বলবো যে, ঐ ব্যক্তি প্রকৃতির নিয়মের সঙ্গে ধোঁকাবাজি করে। প্রকৃতি যৌন মিলনে যে সুখানুভূতি রেখেছে তা শুধু বংশ-বৃদ্ধির প্রাকৃতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধ করার পুরস্কার। কিন্তু যে ব্যক্তি পুরামাত্রায় পুরস্কার চায় অথচ কর্তব্য পালনে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করে, সে কি ধোঁকাবাজ নয়?"

দ্রষ্টব্য : ইসলামের দৃষ্টিতে জন্মনিয়ন্ত্রণ, সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী, পৃষ্ঠা ৫৮-৬২

১২। ইসলামী শিক্ষা

সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (রহ) শিক্ষা ব্যবস্থার গুরুত্ব সম্পর্কেও ছিলেন অত্যন্ত সচেতন। আলকুরআনে উপস্থাপিত জীবন দর্শন ভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থাই যে মুসলিমদের জন্য একমাত্র উপযোগী শিক্ষা ব্যবস্থা, এই বিষয়ে তিনি ছিলেন সজাগ। ইসলাম বিবর্জিত শিক্ষা ব্যবস্থার তিনি ছিলেন ঘোর বিরোধী। ইসলাম বিবর্জিত শিক্ষা ব্যবস্থার পরিণতি বুঝাতে গিয়ে তিনি বলেন,

"যেই শিক্ষা ব্যবস্থা জ্ঞান-বিজ্ঞানকে আল্লাহর অবাধ্য নেতৃত্বের রচিত ধারাক্রমে সাজায়, সেই নেতৃত্বের দৃষ্টিভংগি গ্রহণ করে এবং মানুষকে আল্লাহদ্রোহিতার পথ-প্রদর্শকদের বানানো যন্ত্রের নাটবলটু হিসেবে তৈরি করে, সেই শিক্ষা ব্যবস্থা আসলে মানুষকে দীন-বিচ্যুত করারই পরীক্ষিত ব্যবস্থা।"

দ্রষ্টব্য : শিক্ষা ব্যবস্থা ঃ ইসলামী দৃষ্টিকোণ, সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী, পৃষ্ঠা-৫৮

এই ধরনের শিক্ষা ব্যবস্থা যে মুসলিম উম্মাহর জন্য কল্যাণকর হতে পারে না তা তিনি পূর্ণভাবে উপলব্ধি করেছিলেন। তিনি একটি নতুন শিক্ষা ব্যবস্থার স্বপ্ন দেখেন। নতুন শিক্ষা ব্যবস্থার সারবত্তা নির্দেশ করে তিনি যেই সব বক্তব্য রেখেছেন সেইগুলোর গুরুত্বও অপরিসীম।

তিনি বলেন– "এই নতুন শিক্ষা ব্যবস্থার প্রথম বৈশিষ্ট হবে এই যে এতে দীনী ও দুনিয়াবী শিক্ষা ব্যবস্থার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব মুছে ফেলে উভয় ধরনের শিক্ষাকে এক শিক্ষা ব্যবস্থায় পরিণত করতে হবে।"

"জ্ঞান-বিজ্ঞানকে দীনী ও দুনিয়াবী শিক্ষার নামে দুইটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে দীন ও দুনিয়া সম্পর্কে আলাদা ধ্যান-ধারণা পোষণ করা হয় বলেই। অথচ এই ধ্যান-ধারণা মূলত অ-ইসলামী। ইসলামের পরিভাষায় যেটি দীন সেটি দুনিয়ার জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন কোন জিনিস নয়। দুনিয়াকে এই দৃষ্টিতে দেখা যে এটি আল্লাহর রাজ্য এবং নিজকে আল্লাহর প্রজা মনে করে দুনিয়ার জীবনে আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী প্রতিটি কাজ করার নামই দীন। দীন সম্পর্কে এই ধারণার স্বাভাবিক দাবি হচ্ছে দুনিয়ার সকল জ্ঞান-বিজ্ঞানকে ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানে রূপান্তরিত করা।

জ্ঞান-বিজ্ঞানের কিছু শাখা যদি নিছক দুনিয়াবী হয় ও আল্লাহর আনুগত্যের ধারণার বাইরে থাকে, আর কিছু শাখা যদি দীনী হয় ও তা পার্থিব জ্ঞান-বিজ্ঞান থেকে আলাদাভাবে শিক্ষা দেয়া হয় তাহলে একজন শিক্ষার্থী শিশুকাল থেকে

এমন একটি ধারণা নিয়ে গড়ে উঠবে যে দীন ও দুনিয়া দুইটি পৃথক জিনিস। ফলে এই দুইটির সমন্বয় ঘটিয়ে একটি ভারসাম্যপূর্ণ জীবন গড়ে তোলা তার পক্ষে হবে কঠিন– যেই জীবনে 'তোমরা পরিপূর্ণরূপে ইসলামে প্রবেশ কর–' আল্লাহর এই নির্দেশের প্রতিফলন ঘটানো সম্ভব হবে না।

যেমন, যদি কোন শিক্ষার্থীকে ইতিহাস, ভূগোল, পদার্থবিদ্যা, রসায়ন বিদ্যা, প্রাণীবিদ্যা, ভূ-বিদ্যা, মহাশূন্য বিদ্যা, অর্থনীতি, রাষ্ট্রবিজ্ঞান ইত্যাদি এমনভাবে পড়ানো হয় যে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত কোথাও আল্লাহর নাম উচ্চারিত হয় না, বিশ্বজাহানের সর্বত্র ও মানুষের আপন সত্তায় যা কিছু রয়েছে সেইগুলোকে আল্লাহর নিদর্শন হিসেবে দেখা হয় না, প্রাকৃতিক আইনগুলোকে মহাবিজ্ঞানী আল্লাহর আইন বলে উল্লেখ করা হয় না, ইতিহাসের ঘটনাবলীর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করার সময় এর পেছনে যে মহা পরাক্রমশালী সর্বশক্তিমান আল্লাহর ইচ্ছা কার্যকর তা বলা হয় না, ফলিত বিদ্যাগুলোর কোথাও আল্লাহর সন্তোষ অনুযায়ী কৌশল প্রয়োগের ইচ্ছা পোষণ করা হয় না, এবং বাস্তব জীবনের আচরণ ও কায়কারবারের আলোচনায় জীবন পরিচালনার জন্য আল্লাহ যেই সব নিয়ম বেঁধে দিয়েছেন সেইগুলোর উল্লেখ থাকে না, জীবনের উৎপত্তি-ইতিবৃত্তে আল্লাহর দেয়া সূচনা ও সমাপ্তির বিবরণ সন্নিবেশিত হয় না, তাহলে এতো সব বিদ্যা শেখার পরও শিক্ষার্থীর মনে জীবন ও জগত সম্পর্কে যেই ধারণা জন্ম নেবে তাতে আল্লাহর কোন স্থান থাকবে না। প্রতিটি জিনিসের সাথে তার পরিচয় ঘটবে স্রষ্টাকে বাদ দিয়েই। প্রতিটি ক্ষেত্রেই সে তার পথ রচনা করে নেবে আল্লাহকে পরোয়া না করেই।

সকল বিদ্যা থেকে এই দৃষ্টিভংগি অর্জন করার পর শিক্ষার্থী যখন একটি বিভাগে হঠাৎ আল্লাহর কথা শুনবে, ইসলামের নৈতিক শিক্ষা ও শারয়ী বিধান সম্পর্কে জানবে তখন সে ভেবেই পাবে না যে জীবন ও জগত সম্পর্কে তার অর্জিত জ্ঞান-কাঠামোতে আল্লাহকে কোথায় স্থান দেয়া যাবে। প্রথমে তো সে আল্লাহর অস্তিত্বের প্রমাণই চাইবে। এর পর সে জানতে চাইবে যে যেইগুলোকে আল্লাহর পথ-নির্দেশ বলা হচ্ছে সেই গুলো সত্যি তাঁর কাছ থেকে এসেছে কিনা এবং এইগুলো আসলে প্রয়োজন কিনা। যুক্তি-প্রমাণ দিয়ে তাকে বুঝানো গেলেও তার পক্ষে দুনিয়াবী জ্ঞানের সাথে এই নতুন জ্ঞানকে সমন্বিত করা হবে খুবই কঠিন।"

"এই হচ্ছে জ্ঞান-বিজ্ঞানকে দীনী ও দুনিয়াবী এই দুইভাগে ভাগ করার ফল।"

দ্রষ্টব্য : শিক্ষা ব্যবস্থা ঃ ইসলামী দৃষ্টিকোণ, সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী, পৃষ্ঠা-৬১

"গোটা শিক্ষাকেই ইসলামী শিক্ষায় পরিণত করা প্রয়োজন। প্রথম থেকেই একজন শিক্ষার্থীকে জীবন ও জগত সম্পর্কে শিক্ষা দিতে হবে যে সে আল্লাহর রাজ্যের একজন প্রজামাত্র, তার আপন সত্তায় ও বিশ্বজাহানের সর্বত্র আল্লাহর নিদর্শন বিদ্যমান, তার ও বিশ্বজাহানের সকল কিছুর সম্পর্ক আল্লাহর সাথে, তার নিয়ন্ত্রণাধীন শক্তি ও বস্তুগুলো আল্লাহই তাকে দিয়েছেন, একমাত্র আল্লাহর অভিপ্রায় ও নির্দেশ অনুযায়ী এইগুলো ভোগ-ব্যবহার করতে হবে এবং এই ভোগ-ব্যবহার সম্পর্কে তাকে একদিন অবশ্যই আল্লাহর নিকট জওয়াবদিহি করতে হবে।"

দ্রষ্টব্য : শিক্ষা ব্যবস্থা ঃ ইসলামী দৃষ্টিকোণ, সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী, পৃষ্ঠা-৬২

সাইয়েদ মওদূদী বলেন,

"নতুন শিক্ষা ব্যবস্থার দ্বিতীয় বৈশিষ্ট হবে শিক্ষার্থীদেরকে বিশেষজ্ঞরূপে গড়ে তোলার ব্যবস্থা করা। মানুষের জ্ঞান এখন এতো বেশি উন্নতি ও উৎকর্ষ লাভ করেছে এবং এর এতো শাখা-প্রশাখা বেরিয়েছে যে এর সব কয়টি একই ব্যক্তির পক্ষে শেখা সম্ভব নয়। আর সব বিদ্যাতেই যদি তাকে মামুলি ধরনের চলনসই জ্ঞান দিয়ে ছেড়ে দেয়া হয় তাহলে সে কোনটাতেই পারদর্শিতা ও পরিপক্বতা লাভ করতে পারবে না। এর চেয়ে বরং আট-দশ বছরের পাঠক্রম এমন হওয়া উচিত যে প্রত্যেক শিক্ষার্থী তার জীবন, জগত ও মানুষ সম্পর্কে অপরিহার্য জ্ঞান ইসলামের নিরিখে লাভ করতে পারে। বিশ্বজাহান সম্পর্কে একজন মুসলিমের যেই চিন্তা-চেতনা থাকা দরকার তা যেন তার মাঝে সৃষ্টি হয়। একজন মুসলিমের জীবন ধারা কেমন হওয়া উচিত তার নকশা যেন তার মনে বদ্ধমূল হয়ে যায়। জীবন যাপনের জন্য যতোটুকু তত্ত্ব ও তথ্য একজন মুসলিমের প্রয়োজন তা যেন সে একজন খাঁটি মুসলিমের মতো প্রয়োগ করার প্রেরণা লাভ করে। মাতৃভাষায় তার যথেষ্ট দখল থাকা চাই। সেই সাথে আরবী ভাষাও শেখা চাই। একটি ইউরোপীয় ভাষাও তার জানা দরকার যাতে সেখানে যেই বিপুল জ্ঞান-ভাণ্ডার রয়েছে তার কিছুটা সে আহরণ করতে পারে। এর পর বিশেষজ্ঞ গড়ার আলাদা পাঠক্রম থাকবে যার ভিত্তিতে ছয় সাত বছর গভীর তথ্যানুসন্ধানের প্রশিক্ষণ নিয়ে সে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ডক্টরেট ডিগ্রী নিতে পারে।"

দ্রষ্টব্য : শিক্ষা ব্যবস্থা ঃ ইসলামী দৃষ্টিকোণ, সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী, পৃষ্ঠা-৬৩

"উদাহরণ স্বরূপ কয়েকটি বিষয়ের শিক্ষাদান সম্পর্কে আলোচনা করছি। ..."

"দর্শন ও যুক্তিবিদ্যার একটি বিভাগ থাকবে। এই বিভাগে শিক্ষার্থীকে প্রথমে

আলকুরআনের দর্শন পড়ানো হবে। এতে সে জানতে পারবে মানুষের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জিনিসগুলোর ভেতরে সত্য অনুসন্ধানের কি কি পথ আছে, মানুষের বুদ্ধিমত্তার দৌড় কতোটুকু, শুধু যুক্তির ভিত্তিতে অনুমান করতে গিয়ে মানুষ কিভাবে সত্য ও বাস্তবতার জগত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আন্দাজ-অনুমানের অন্ধকারে হারিয়ে যায়। সে আরো জানতে পারবে যে অতীন্দ্রিয় বিষয়গুলো সম্পর্কে প্রকৃতপক্ষে মানুষের কতোটুকু জ্ঞান প্রয়োজন, এই জ্ঞান লাভ করার জন্য মানুষ তার পর্যবেক্ষণ (Observation) ও যুক্তি-প্রণালীকে কিভাবে ব্যবহার করতে পারে, কি কি অতীন্দ্রিয় বিষয় সে নির্ণয় করতে সক্ষম, কি কি বিষয়ে সে সংক্ষিপ্ত ও সাধারণ সিদ্ধান্তের উর্ধে অগ্রসর হতে সক্ষম নয়, কোন্ স্তরে গিয়ে ঐ সংক্ষিপ্ত সিদ্ধান্তকে বিস্তারিত সিদ্ধান্তে পরিণত করা ও সাধারণ সিদ্ধান্তকে শর্তযুক্ত সিদ্ধান্তে রূপান্তরিত করার চেষ্টা ভিত্তিহীন হয়ে যায় এবং তা মানুষকে আন্দাজ অনুমানের অসীম দিগন্তে উদ্‌ভ্রান্ত করে ছেড়ে দেয়। এই মৌলিক বিষয়গুলোর সুরাহা হয়ে গেলেই দর্শনের ভিত্তি সুদৃঢ় হবে। এর পর শিক্ষার্থীকে দর্শনের ইতিহাস পড়াতে হবে। এই পর্যায়ে আলকুরআনের দর্শনের সাহায্যে তাকে সকল দার্শনিক মতবাদ পড়িয়ে দিতে হবে যাতে সে নিজেই দেখতে পায় সত্য-সন্ধানের আল্লাহ্ প্রদত্ত উপায়-উপকরণ কাজে না লাগিয়ে অথবা ভুল পন্থায় কাজে লাগিয়ে মানুষ কিভাবে বিভ্রান্ত হয়েছে।"

দ্রষ্টব্য : শিক্ষা ব্যবস্থা ঃ ইসলামী দৃষ্টিকোণ, সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী, পৃষ্ঠা-৬৩, ৬৪

"একটি বিভাগ হবে ইতিহাসের। এতে আলকুরআনের ইতিহাস দর্শন ও ইতিহাস অধ্যয়নের পদ্ধতি বিশ্লেষণ করে শিক্ষার্থীকে ভালোভাবে বুঝিয়ে দিতে হবে যাতে করে তার মন যাবতীয় সংকীর্ণতা, একদেশদর্শিতা ও বিদ্বেষমুক্ত হয়ে যায়। যাতে সে যাবতীয় তত্ত্ব ও তথ্য নিরপেক্ষ ও বস্তুনিষ্ঠ দৃষ্টিতে দেখতে অভ্যস্ত হয় এবং তা থেকে স্বাধীনভাবে ও নিরপেক্ষভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য প্রস্তুত হতে পারে। সে যেন মানব জাতির ইতিবৃত্ত, মানব সভ্যতার বিকাশ ও অগ্রগতির কাহিনী পড়ে মানুষের সফলতা ও ব্যর্থতা, সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্য, উত্থান ও পতন কিভাবে আসে সেই সম্পর্কে স্থায়ী নিয়ম-নীতি উদ্ভাবন করতে সক্ষম হয়। মানব সমাজে ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি কি পদ্ধতিতে ও কোন নিয়মে ঘটে থাকে তা তাকে বুঝতে হবে। তাকে আরো জানতে হবে কি কি গুণ মানুষকে উন্নতির পথে এগিয়ে নিয়ে যায় ও কি কি দোষ তার অধঃপতন ডেকে আনে।...

এইভাবে অধ্যয়ন করার পর ইতিহাসের একজন ছাত্র যখন জানতে পারবে

আল্লাহর আইন কতো পক্ষপাতহীন, কতো নিরপেক্ষতার সাথে তিনি অতীতের জাতিগুলোর সাথে আচরণ করেছেন, তখন কোন জাতিকেই সে শত্রু বা মিত্র ভাববে না। প্রত্যেক জাতির কীর্তিকলাপ সে নিরপেক্ষ মন ও আবেগমুক্ত দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করে সফলতা ও ব্যর্থতার চিরন্তন কষ্টি পাথরে যাচাই করে খাঁটি ও ভেজালকে আলাদা করে দেখিয়ে দেবে। এইরূপ মানসিক প্রশিক্ষণের পর তাকে ঐতিহাসিক দলীল দস্তাবেজ, পুরাকীর্তি ও মূল উৎসগুলো থেকে সিদ্ধান্ত গ্রহণের সবক দিতে হবে। তাকে এতোটা দক্ষ ও পরিপক্ব করে তুলতে হবে যাতে সে ইসলাম-বিদ্বেষী ঐতিহাসিকদের পক্ষপাতদুষ্ট আবর্জনার স্তূপ থেকে সত্যকে খুঁজে বের করে নিজেই স্বাধীন ও নিরপেক্ষ মত দিতে পারে।"

দ্রষ্টব্য : শিক্ষা ব্যবস্থা ঃ ইসলামী দৃষ্টিকোণ, সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী, পৃষ্ঠা-৬৫

"একটি বিভাগ থাকবে সমাজ-বিজ্ঞানের। এই বিভাগের প্রথম কাজ হবে আলকুরআন ও আলহাদীসের আলোকে মানব সভ্যতার মৌলিক নীতিগুলো তুলে ধরা। এরপর মৌলিক নীতিগুলো থেকে যুক্তি-তর্কের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় উপ-বিধি রচনা করে নবীদের নেতৃত্বে যেই সামাজিক ও তামাদ্দুনিক ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিলো তার উদাহরণ পেশ করে বুঝিয়ে দিতে হবে ঐ মৌলিক নীতিগুলোর (Fundamental Principles) ভিত্তিতে কিভাবে একটি সুষ্ঠু ন্যায়ভিত্তিক সমাজ-ব্যবস্থা, অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, রাজনৈতিক ব্যবস্থা, রাষ্ট্রীয় প্রশাসন ব্যবস্থা ও আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ভিত্ রচিত হয়ে থাকে। শুধু তাই নয়, ঐ মৌলিক নীতিগুলোর ভিত্তিতে কেমন করে তামাদ্দুনিক ইমারত আরো সম্প্রসারণ করা যায় এবং চিন্তা -গবেষণা দ্বারা তা সম্প্রসারণের কি পরিকল্পনা নেয়া সম্ভব তাও তাকে দেখিয়ে দিতে হবে। সমাজ বিজ্ঞানের প্রত্যেক ছাত্রের এটাও জানা থাকা দরকার যে মানব সমাজে জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নতি হওয়ার কারণে যেই সব নতুন শক্তির আবিষ্কার ও উদ্ভাবন ঘটে ও যেই ব্যবহারিক কর্মপদ্ধতির উদ্ভব ঘটে সেই গুলোকে আল্লাহর নির্ধারিত সীমা তথা বিধি-নিষেধের আওতায় ন্যায়ভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থায় কিভাবে আত্মস্থ করে নেয়া যায় এবং কিভাবে এইগুলোকে বিকৃতির হাত থেকে রক্ষা করে যথাস্থানে স্থাপন করা যায়। তাকে অতীত জাতিগুলোর ও মুসলিম উম্মাহর সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস পড়াতে হবে যাতে সে বুঝতে পারে ইসলামের তামাদ্দুনিক মৌলিক নীতিগুলোর ও আল্লাহ প্রদত্ত বিধানের অনুসরণ অথবা লংঘন কি পরিণাম ডেকে আনে। অপর দিকে তাকে বর্তমান কালের রাজনৈতিক,

অর্থনৈতিক ও সামাজিক মতাদর্শ ও কর্মধারার সমালোচনামূলক অধ্যয়ন করতে হবে। আল্লাহ বিমুখ মানুষের মনগড়া মত ও পথ তার জন্য কতোখানি কল্যাণকর বা অ-কল্যাণকর তাও তাকে বুঝে নিতে হবে।"

দ্রষ্টব্য : শিক্ষা ব্যবস্থা ঃ ইসলামী দৃষ্টিকোণ, সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী, পৃষ্ঠা-৬৫, ৬৬

"বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার জন্য স্বতন্ত্র বিভাগ থাকবে। এই বিভাগগুলোতে এই যাবতকাল আহরিত বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব ও তথ্য আলকুরআনের আলোকে পর্যালোচনা করতে হবে। তদুপরি আলকুরআনের নির্দেশনা অনুযায়ী প্রাকৃতিক নিদর্শনাবলী ও বিধি-বিধানের আরো পর্যালোচনা ও উদ্ভাবনের কাজও করতে হবে। যদিও আলকুরআন বিজ্ঞান গ্রন্থ নয় এবং বিজ্ঞানের সাথে তার বিষয়বস্তুর প্রত্যক্ষ সম্পর্ক নেই, তবুও এই কথা সত্য যে এই গ্রন্থের রচয়িতা যিনি, বিশ্ব-প্রকৃতির স্রষ্টাও তিনি। তাই তিনি তাঁর একটি গ্রন্থের বিভিন্ন জায়গায় নিজের আরেকটি গ্রন্থ থেকে বিভিন্ন দৃষ্টান্ত ও সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করেছেন। এই জন্য এই কিতাব গভীরভাবে অধ্যয়ন করলে বিজ্ঞানের একজন ছাত্র বিশ্ব-প্রকৃতির বহু নিয়ম-কানুন জানতে পারে শুধু তাই নয়, বরং বিজ্ঞানের প্রায় প্রত্যেকটি শাখাতেই সে একটি নির্ভুল সূচনা বিন্দু (Starting Point) এবং তথ্যানুসন্ধানের একটি সঠিক দিক-নির্দেশনা (Direction) লাভ করে। এটি এমন এক চাবি যার সাহায্যে বৈজ্ঞানিক গবেষণার এক সরল ও স্বচ্ছ রাজপথ খুলে যায়। এই চাবির সহায়তা গ্রহণ করলে বিজ্ঞান গবেষণায় বহু জটিল সমস্যার সহজ সমাধান পাওয়া যায়। বিজ্ঞানের পথভ্রষ্টতার একটি বড়ো কারণ এই যে বাস্তব ঘটনা পর্যবেক্ষণ করে তা সঠিক তথ্য উদ্ধার করে বটে, কিন্তু সংগৃহীত তথ্যাবলীর সমন্বয় ঘটিয়ে যখন তা সাধারণ নিয়ম বা মতবাদ রচনা করে তখন বিশ্ব-প্রকৃতির উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সম্পর্কে অজ্ঞতার কারণে হোঁচট খায়। এই কারণে মানবীয় শক্তির অনেক অপচয় ঘটে। পরিণামে এই ভ্রান্ত মতবাদগুলোকে মানব সভ্যতার সাথে সম্পৃক্ত করে বাস্তব জীবন সংগঠন করতে গেলে তা গোটা সভ্যতাকে বিপর্যস্ত করার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। একজন মুসলিম বিজ্ঞানী যখন আলকুরআনের দিক-নির্দেশনার আলোকে প্রমাণিত তথ্যগুলোকে বিদ্যমান মতবাদগুলো থেকে বিচ্ছিন্ন করে নতুনভাবে বিন্যস্ত করবে এবং আরো তথ্য আহরণ করে শ্রেষ্ঠতর মতবাদ রচনা করবে, তখন দুনিয়াবাসী বর্তমানে যেইসব বৈজ্ঞানিক বিভ্রান্তিতে লিপ্ত সেইগুলো বর্জন না করে পারবে না।"

দ্রষ্টব্য : শিক্ষা ব্যবস্থা ঃ ইসলামী দৃষ্টিকোণ, সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী, পৃষ্ঠা-৬৬, ৬৭

"একটি বিভাগ থাকবে আলকুরআনের গবেষণামূলক অধ্যয়নের জন্য। এই বিভাগে অতীতের তাফসীরকারদের তাফসীর পর্যালোচনা করা ও কাজ আরো এগিয়ে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা থাকবে। আলকুরআনের জ্ঞান-বিজ্ঞানের গভীরে প্রবেশ করার চেষ্টা করতে হবে মানুষের উদ্ভাবিত জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাহায্য নিয়ে।"

"অনুরূপভাবে আলহাদীসের একটি বিভাগ থাকবে। হাদীসবিশারদরা যেই কাজ করে গেছেন তা পড়তে হবে এবং গবেষণা, পর্যালোচনা ও সংগৃহীত জ্ঞানের সমন্বয় সাধন এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের কাজ আরো এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। ইসলামের সোনালী যুগের আরো খুঁটিনাটি তথ্য ও ঘটনা খুঁজে বের করতে হবে এবং সেইগুলো থেকে এমন সব সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে যা এই সময় পর্যন্ত আমাদের জানার বাইরে রয়ে গেছে। আলকুরআনের আহকাম (আদেশ-নিষেধ), রাসূলুল্লাহর (সা) হাদীসের তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক ব্যাখ্যা, সাহাবায়ে কিরাম ও তাবেয়ীদের ইজতিহাদ, মুজতাহিদ ইমামদের যুক্তি-প্রমাণ পুংখানুপুংখরূপে পড়তে হবে। তদুপরি দুনিয়ার অতীত ও বর্তমান জাতিগুলোর আইনশাস্ত্রও ভালোভাবে পড়তে হবে। এইভাবে জীবনের নিত্য-পরিবর্তনশীল অবস্থা ও সমস্যাবলীর ক্ষেত্রে ইসলামী আইনের মূলনীতিগুলো প্রয়োগ করে ইলমুল ফিকহে নতুন প্রাণ সঞ্চার করতে হবে।"

দ্রষ্টব্য : শিক্ষা ব্যবস্থা ঃ ইসলামী দৃষ্টিকোণ, সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী, পৃষ্ঠা-৬৭

আরো এগিয়ে সাইয়েদ মওদূদী বলেন,

"এই নতুন শিক্ষা ব্যবস্থার তৃতীয় বৈশিষ্ট হবে এই যে এই শিক্ষা ব্যবস্থা "আল্লাহর আনুগত্যের আদর্শকে দুনিয়ায় বিজয়ী ও নেতৃত্বদানকারী রূপে প্রতিষ্ঠিত করার সংগ্রামকে জীবনোদ্দেশ্য হিসেবে গ্রহণ করবে।"

"শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিগত জীবন, পারস্পরিক সম্পর্ক, খেলাধূলা ও বিনোদন, শ্রেণীকক্ষের লেখাপড়া, গবেষণা তথা সকল তৎপরতায় জীবনের এই উদ্দেশ্যই সক্রিয় থাকবে। এই লক্ষ্যের আলোকেই তাদের জীবন ও জীবনের কর্মনীতি বিরচিত হবে। এই ধাঁচেই তাদের চরিত্র গড়ে তোলা হবে। মোটকথা, শিক্ষা-পরিবেশ এমনভাবে গড়ে তুলতে হবে যা প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে ইসলামের এক একজন নিবেদিতপ্রাণ সৈনিকে পরিণত করবে।"

দ্রষ্টব্য : শিক্ষা ব্যবস্থা ঃ ইসলামী দৃষ্টিকোণ, সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী, পৃষ্ঠা-৬৮

উপরোক্ত বক্তব্যগুলো বিশ্লেষণ করলে বুঝা যায় সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদীর শিক্ষা-চিন্তা গভীর ও স্বচ্ছ উপলব্ধির ফসল। নতুন শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে উপস্থাপিত তাঁর দিক-নির্দেশনা মৌলিক ও বাস্তবসম্মত।

১৩। ইসলামী সংস্কৃতি

ইসলামী সংস্কৃতির স্বরূপ নিরূপণ করতে গিয়ে অনেকেই গোলকধাঁধায় পড়েছেন। কিন্তু সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী অত্যন্ত সহজ ও নির্ভেজালভাবে সংস্কৃতির আসল তত্ত্বটি আমাদের সামনে পেশ করেছেন। নিম্নে তাঁর কয়েকটি উক্তি পেশ করছি। এই উক্তিগুলো তাঁর সংস্কৃতি চিন্তার প্রতিনিধিত্ব করে।

তিনি বলেন, "লোকেরা মনে করে যে সংস্কৃতি বলতে বুঝায় কোন জাতির জ্ঞান-বিজ্ঞান, সাহিত্য-দর্শন, শিল্প-কারিগরী, ললিত কলা, সামাজিক রীতি, জীবন পদ্ধতি, রাষ্ট্রনীতি ইত্যাদি। কিন্তু এইগুলো সংস্কৃতির আসল প্রাণ-সত্তা নয়, তার ফলাফল ও বহিঃপ্রকাশ মাত্র।"

দ্রষ্টব্য : ইসলামী সংস্কৃতির মর্মকথা, সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী, পৃষ্ঠা-২

"সংস্কৃতির ভেতর প্রথমে যেই জিনিসটি তালাশ করতে হবে তা হচ্ছে এই যে দুনিয়াবী জীবন সম্পর্কে তার ধারণা কি? এই দুনিয়ায় সে মানুষকে কি মর্যাদা প্রদান করে? এর দৃষ্টিতে দুনিয়াটা কি? এই দুনিয়ার সাথে মানুষের সম্পর্ক কি? মানুষ এই দুনিয়াকে ভোগ-ব্যবহার করবে কিভাবে? বস্তুত জীবন-দর্শন সম্পর্কিত এই প্রশ্নগুলো এমনি গুরুত্বপূর্ণ যে মানব জীবনের তামাম ক্রিয়াকাণ্ডের ওপর এইগুলো গভীরভাবে ক্রিয়াশীল হয়ে থাকে। এই দর্শন বদলে গেলে সংস্কৃতির গোটা স্বরূপই বদলে যায়।"

দ্রষ্টব্য : ইসলামী সংস্কৃতির মর্মকথা, সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী, পৃষ্ঠা-৩

"এই সাথে দ্বিতীয় যেই প্রশ্নটি গভীরভাবে সম্পৃক্ত তা হচ্ছে জীবনের চূড়ান্ত লক্ষ্য। দুনিয়ায় মানব জীবনের উদ্দেশ্য কি? মানুষের এতো ব্যস্ততা, এতো চেষ্টা-প্রয়াস, এতো মেহনত, এতো সংগ্রাম কিসের জন্য? কোন্ অভীষ্ট লক্ষ্যের দিকে মানুষের ছুটে চলা উচিত? কোন্ লক্ষ্যস্থলে পৌঁছবার জন্য আদম সন্তানের চেষ্টা-সাধনা করা কর্তব্য? কোন্ পরিণতির কথা মানুষের প্রতিটি কাজে স্মরণ রাখা উচিত? প্রকৃতপক্ষে এই লক্ষ্যই মানুষের বাস্তব জীবনের গতিধারাকে নির্ধারিত ও নিয়ন্ত্রিত করে থাকে।"

দ্রষ্টব্য : ইসলামী সংস্কৃতির মর্মকথা, সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী, পৃষ্ঠা-৩

"ইসলামী সংস্কৃতির ভিত্তি হচ্ছে পার্থিব জীবন সম্পর্কে একটি বিশেষ ধারণা।

তাহলো এই যে, এই দুনিয়ায় মানুষের মর্যাদা সাধারণ সৃষ্ট বস্তুর মতো নয়, বরং তাকে এখানে বিশ্ব প্রভুর তরফ থেকে প্রতিনিধি বানিয়ে পাঠানো হয়েছে। এই ধারণার পরিপ্রেক্ষিতে একটি যুক্তিসঙ্গত সিদ্ধান্ত হিসেবে আপন স্রষ্টা ও মনিবের সন্তুষ্টি অর্জন করা মানব জীবনের স্বাভাবিক লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায়, আর এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য প্রয়োজন হয়ে পড়ে–

প্রথমত, আল্লাহ্ সম্পর্কে নির্ভুল জ্ঞান লাভ।

দ্বিতীয়ত, শুধু আল্লাহকেই আদেশ ও নিষেধকারী, আইন ও বিধানদাতা, বন্দেগী ও আনুগত্য লাভের যোগ্য মনে করা এবং নিজের যাবতীয় ক্ষমতা-ইখতিয়ার সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর বিধানের অধীন করে দেয়া।

তৃতীয়ত, আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের পদ্ধতিগুলো জানা।

চতুর্থত, আল্লাহর সন্তুষ্টি বিধানের সুফল ও অসন্তুষ্টি বিধানের কুফল অবহিত হওয়া।"

দ্রষ্টব্য : ইসলামী সংস্কৃতির মর্মকথা, সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী, পৃষ্ঠা-২৬০

সাইয়েদ মওদূদী আরো বলেন,

"এই সংস্কৃতির (ইসলামী সংস্কৃতির) মূল লক্ষ্য হচ্ছে মানুষকে চূড়ান্ত সাফল্যের (আখিরাতের সাফল্যের) জন্য প্রস্তুত করা। এই সংস্কৃতির দৃষ্টিতে এই সাফল্য অর্জন বর্তমান জীবনে মানুষের নির্ভুল আচরণের ওপর নির্ভরশীল। চূড়ান্ত ফলাফলের দৃষ্টিতে কোন্ কোন্ কাজ উপকারী, আর কোন্ কোন্ কাজ অপকারী তা নির্ণয় করা মানুষের সাধ্যাতীত, বরং আখিরাতে ফায়সালাকারী আল্লাহই তা উত্তমরূপে অবহিত। এই কারণেই এই সংস্কৃতি জীবনের সকল বিষয়ে আল্লাহর নির্দেশিত পন্থা অনুসরণ করার ও নিজের কর্ম-স্বাধীনতাকে আল্লাহর শারীয়া দ্বারা সীমিত ও নিয়ন্ত্রিত করার জন্য মানুষের কাছে দাবি জানায়। অনুরূপভাবে এই সংস্কৃতি হচ্ছে দীন ও দুনিয়ার মহত্তম সমন্বয়। একে প্রচলিত সংকীর্ণ অর্থে ধর্ম নামে আখ্যায়িত করা চলে না। এ হচ্ছে একটি ব্যাপক জীবন ব্যবস্থা যা মানুষের চিন্তা-চেতনা, স্বভাব-চরিত্র, আচার-ব্যবহার, পারিবারিক কাজকর্ম, সামাজিক ক্রিয়াকাণ্ড, রাজনৈতিক কর্মধারা, সভ্যতা-সামাজিকতা– সব কিছুর ওপর পরিব্যাপ্ত। আর এই সব বিষয়ে যেই পদ্ধতি ও আইন-বিধান আল্লাহ্ নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন তারই নাম দীন ইসলাম বা ইসলামী সংস্কৃতি।"

দ্রষ্টব্য : ইসলামী সংস্কৃতির মর্মকথা, সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী, পৃষ্ঠা-২৬৩

"অন্যান্য সংস্কৃতি জীবনের যেই লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে ইসলামের লক্ষ্য তার থেকে ভিন্ন ধরনের। অতএব ইসলাম তার ধারণা অনুযায়ী দুনিয়া ও তার ভেতরকার বস্তু নিচয়ের সাথে যেই আচরণ ও কর্মনীতি অবলম্বন করে এবং আপন লক্ষ্য অর্জনের জন্য পার্থিব জীবনে যেই কর্মপন্থা গ্রহণ করে তাও মূলত অন্যান্য সংস্কৃতির গৃহীত আচরণ ও কর্মপন্থা থেকে ভিন্ন ধরনের। মনের অনেক চিন্তা-কল্পনা ও ধ্যান-ধারণা, প্রবৃত্তির অনেক কামনা-বাসনা ও ঝোঁক-প্রবণতা এবং জীবন যাপনের জন্য এমন বহু পন্থা রয়েছে অন্যান্য সংস্কৃতির দৃষ্টিতে যার অনুসরণ শুধু সংগতই নয়, বরং কখনো কখনো সংস্কৃতির পক্ষে একান্ত অপরিহার্য, কিন্তু ইসলাম সেইগুলোকে নাজায়েয, মাকরূহ ও কোন কোন ক্ষেত্রে হারাম ঘোষণা করেছে। কারণ সেইগুলো ঐ সংস্কৃতিগুলোর জীবন-দর্শনের সাথে একেবারেই সাদৃশ্যপূর্ণ ও তাদের জীবন লক্ষ্য অর্জনের পক্ষেও সহায়ক, কিন্তু ইসলামের জীবন-দর্শনের সাথে ঐগুলোর কোনই সম্পর্ক নেই অথবা তার জীবন লক্ষ্য অর্জনের পথে অন্তরায় স্বরূপ। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায়, দুনিয়ার বহু সংস্কৃতির পক্ষে ললিত কলা হচ্ছে প্রাণ-স্বরূপ এবং চারুকলায় নিপুণ ও পারদর্শী ব্যক্তিরা জাতীয় বীরের মর্যাদা লাভ করে। কিন্তু ইসলাম এর কোন কোনটিকে হারাম, কোনটিকে মাকরূহ ও কোনটিকে কিছু পরিমাণ জায়েয বলে ঘোষণা করে। তার আইন-কানুনে সৌন্দর্য-প্রীতির পরিচর্যা ও কৃত্রিম সৌন্দর্য উপভোগের অনুমতি এতোটুকু রয়েছে যে মানুষ যেন তার সাথে সাথে আল্লাহকে স্মরণ রাখতে, তাঁর সন্তুষ্টির জন্য কাজ করতে ও খিলাফাতের দায়িত্ব পালন করতে পারে। কিন্তু যেখানে গিয়ে এই সৌন্দর্য-প্রীতি দায়িত্বানুভূতির চাইতে প্রবলতর হয়, যেখানে আনন্দ উপভোগের আতিশয্য মানুষকে আল্লাহর পূজারী হওয়ার বদলে সৌন্দর্য-পূজারী করে তোলে, যেখানে ললিতকলার স্বাদ থেকে মানুষকে বিলাস-প্রিয়তার নেশায় ধরে যায়, যেখানে ঐসব শিল্পকলার প্রভাবে ভাব-প্রবণতা ও প্রবৃত্তির তাড়না শক্তিশালী ও তীব্রতর হওয়ায় বুদ্ধির বাঁধন শিথিল হয়ে যায় এবং বিবেকের আওয়াজের জন্য হৃদয়ের কান বধির হয়ে যায় ও কর্তব্যের ডাক শুনার মতো আনুগত্য ও দায়িত্ব জ্ঞান বজায় থাকে না, ঠিক সেখানে পৌঁছেই ইসলাম অবজ্ঞা, অবৈধতা ও নিষেধাজ্ঞার প্রাচীর দাঁড় করিয়ে দেয়।"

দ্রষ্টব্য : ইসলামী সংস্কৃতির মর্মকথা, সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী, পৃষ্ঠা-৭৮

সংস্কৃতি চর্চায় বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার প্রসংগে আলোচনা করতে গিয়ে সাইয়েদ

আবুল আ'লা মওদূদী বলেন,

"রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, "আমি বাদ্যযন্ত্র ভাংগার জন্য প্রেরিত হয়েছি।" এখন বলুন, যেই নবী বাদ্যযন্ত্র ভাংগার জন্য প্রেরিত হয়েছেন তাঁর অনুসারীরা বাদ্যযন্ত্র তৈরি, বাদ্যযন্ত্রের ব্যবসা ও ব্যবহারে নিজেদের শক্তি-সামর্থ্য নিয়োজিত করবে এটি কেমন করে সঠিক হতে পারে? বিয়ে-শাদী কিংবা অন্য কোন অবস্থায়ই বাদ্য বাজানো বৈধ নয়। হাদীসে যতোটুকু অনুমতি দেয়া হয়েছে তা শুধু এই যে বিয়ে ও ঈদ উপলক্ষে দফ বাজিয়ে কিছু গাওয়া যাবে।"

দ্রষ্টব্য : রাসায়েল ও মাসায়েল, প্রথম খণ্ড, সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী, পৃষ্ঠা-১২৬, ১২৭

চলচ্চিত্র ও নাটক সম্পর্কে সাইয়েদ মওদূদী বলেন,

"চলচ্চিত্র আসলে কোন নাজায়েয বস্তু নয়। তবে তার নাজায়েয ব্যবহার তাকে না-জায়েয করে দেয়। সিনামার পর্দায় যেই ছবি দেখা যায় তা আসলে ছবি নয় বরং পরছায়া, যেমন আয়নার মধ্যে পরছায়া দেখা যায়। কাজেই তা হারাম নয়।"

"চলচ্চিত্রকে ইসলামী ও কল্যাণমূলক কাজে ব্যবহার করার ব্যাপারে বলা যেতে পারে যে অশ্লীলতা, নগ্নতা, অপরাধ-প্রবণতা ও যৌন আবেদনমুক্ত চিত্র এবং সততা, সৎবৃত্তি ও কল্যাণকামিতার শিক্ষা দেয়াই যেই সব চিত্রের আসল উদ্দেশ্য তেমন ধরনের কোন সামাজিক সংস্কারমূলক ও ঐতিহাসিক চিত্র নির্মাণের ব্যাপারে বাহ্যত কোন দোষ দেখা যায় না। কিন্তু গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করলে এর মধ্যে বড়ো বড়ো দুইটি দোষ দেখা যায়। এই দোষ দুইটির সংশোধন কোনক্রমেই সম্ভব নয়।

এক. নারী চরিত্র বিবর্জিত কোন সামাজিক চিত্র নির্মাণ অত্যন্ত কঠিন কাজ। আর চিত্রের মধ্যে নারী চরিত্র রাখতে হলে দুইটি অবস্থায় তা সম্ভবপর। একটি হচ্ছে, এই চিত্রে নারীই অভিনয় করবে আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে, নারীর ভূমিকায় কোন পুরুষ অভিনয় করবে। শারীয়ার দৃষ্টিতে এর কোনটিই জায়েয নয়।

দুই. কোন সামাজিক নাটক অভিনয় ছাড়া মঞ্চায়িত হতে পারে না। আর অভিনয়ের মধ্যে একটি বিরাট নৈতিক ত্রুটি ও ক্ষতি রয়েছে। অভিনেতা দিনের পর দিন অভিনয় করতে করতে অবশেষে নিজের ব্যক্তিগত চরিত্র সম্পূর্ণ না হলেও বেশির ভাগ হারিয়ে বসে। চলচ্চিত্রায়িত নাটকগুলোকে আমরা সমাজ সংস্কার ও ইসলামী শিক্ষার প্রচার-প্রসারে ব্যয় করতে চাইলেও সেখানে অবশ্যি একদল লোককে এই উদ্দেশ্যে বিশেষভাবে তৈরি করতে হবে। অভিনেতার পেশা গ্রহণ করে নিজেদের ব্যক্তিগত চরিত্র বিসর্জন দিতে প্রস্তুত হতে হবে।

অর্থাৎ তারা নিজেদের ব্যক্তিত্বকে কুরবানী করে দেবেন। আমি জানিনা, সমাজের কল্যাণের স্বার্থে অথবা অন্য কোন পবিত্রতর ও উন্নততর স্বার্থে কোন মানুষের কাছ থেকে তার ব্যক্তিত্বকে কুরবানী করার দাবি কেমন করে করা যেতে পারে। জান-মাল, আরাম-আয়েশ, সুখ-স্বাচ্ছন্দ প্রভৃতি কুরবানী করা যেতে পারে এবং পবিত্রতর ও উন্নততর উদ্দেশ্যে এইগুলো কুরবানী করা উচিতও। কিন্তু প্রথমোক্ত কুরবানীর জন্য অন্য কারো দাবি করা তো দূরে থাক আল্লাহ নিজেও নিজের জন্য এই দাবি করেননি। এই সব কারণে আমার মতে সিনেমার শক্তিকে চলচ্চিত্রায়িত নাটকের জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে না। এরপর প্রশ্ন দেখা দেয়, এই শক্তিটিকে আর কোন্ কাজে ব্যবহার করা যেতে পারে? আমার জবাব হচ্ছে, নাটক ছাড়া আরো বহু বিষয় রয়েছে যেইগুলো ফিল্‌মে দেখানো যেতে পারে। নাটকের তুলনায় এইগুলো অনেক বেশি উপকারী ও কল্যাণমুখী। যেমন, ভৌগোলিক চলচ্চিত্রের মাধ্যমে আমরা দেশের জনগণকে ব্যাপক ও বিস্তারিত জ্ঞান দান করতে পারি– যার ফলে মনে হবে যে তারা পৃথিবী সফর করে এসেছে। অনুরূপভাবে আমরা বিভিন্ন জাতির জীবনের অসংখ্য দিক তাদের সামনে তুলে ধরতে পারি যা থেকে তারা অনেক শিক্ষা গ্রহণ করতে পারবে ও তাদের দৃষ্টিভংগিও হয়ে উঠবে প্রশস্ততর। সৌর বিজ্ঞানের বিস্ময়কর আবিষ্কার ও পর্যবেক্ষণগুলো আমরা এমন আকর্ষণীয় পদ্ধতিতে তুলে ধরতে পারি– যা দেখার পর লোকেরা যৌন আবেদনমূলক ফিল্‌মের কথা ভুলে যাবে। আবার এই ফিল্‌মগুলোকে এতোখানি শিক্ষণীয়ও করা যেতে পারে যার ফলে মানুষের মনে তাওহীদ ও আল্লাহর ভয় চিরকালের জন্য দাগ কেটে বসে যাবে। বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগকে পর্দায় এমনভাবে পেশ করতে পারি যার ফলে জনগণ বিপুল আকর্ষণ অনুভব করবে ও তাদের বিজ্ঞানের জ্ঞান বিজ্ঞানের গ্র্যাজুয়েটদের জ্ঞানের মতো হবে। আমরা পরিচ্ছন্নতা, স্বাস্থ্য সংরক্ষণ ও নাগরিক দায়িত্ব বিষয়ে শিক্ষা দিতে পারি খুবই আকর্ষণীয় পদ্ধতিতে।... আমরা বিভিন্ন শিল্প, কারখানার কাজ, বিভিন্ন জিনিস তৈরির কৌশল ও উন্নত কৃষি-পদ্ধতি পর্দায় দেখাতে পারি।... এর মাধ্যমে আমরা বয়স্ক শিক্ষার কাজও হাতে নিতে পারি।... এর মাধ্যমে আমরা জনগণকে যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা দিতে পারি। সিভিল ডিফেন্স, গেরিলা যুদ্ধ, বিমান আক্রমণ থেকে প্রতিরক্ষামূলক শিক্ষা দিতে পারি যার ফলে প্রতিরক্ষার ব্যাপারে তারা স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়ে যেতে পারে। তাছাড়া স্থল, বিমান ও নৌ-যুদ্ধের চিত্রও তাদের সামনে তুলে ধরা যেতে পারে।... এ ধরনের আরো অনেক ক্ষেত্রে চলচ্চিত্রকে ব্যবহার করা যেতে পারে।"

দ্রষ্টব্য : রাসায়েল ও মাসায়েল ৩য় খণ্ড, সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী, পৃষ্ঠা-১৮৭

অতঃপর সাইয়েদ মওদূদী মুসলিমদের ইসলামী সংস্কৃতির অনুশীলন ও পরবর্তীকালে তা থেকে বিচ্যুতি সম্পর্কে বলেন,

"ইসলামী সংস্কৃতির ইতিহাস পর্যালোচনা করলে যেই কোন ব্যক্তি এই সত্যটি স্পষ্টত উপলব্ধি করতে পারবে যে এর মাঝে যতোদিন পূর্ণাঙ্গ অর্থে সত্যিকার ইসলাম ছিলো ততোদিন এ একটি নির্ভেজাল বাস্তব সংস্কৃতি ছিলো। এর অনুবর্তীদের কাছে দুনিয়া ছিলো আখিরাতের কৃষিক্ষেত্র স্বরূপ। তাঁরা দুনিয়ার জীবনের প্রতিটি মুহূর্তকে এই ক্ষেত্রটির চাষাবাদ, বীজবপন ইত্যাদি কাজে ব্যয় করবারই চেষ্টা করতেন যাতে আখিরাতের জীবনে বেশি পরিমাণে ফসল পাওয়া যায়। তাঁরা বৈরাগ্যবাদ ও ভোগবাদের মধ্যবর্তী এমন এক সুষম ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থায় দুনিয়াকে ভোগ-ব্যবহার করতেন অন্য কোন সংস্কৃতিতে যার নাম-নিশানা পর্যন্ত আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় না। আল্লাহর খিলাফাতের ধারণা তাঁদেরকে দুনিয়ার জীবনে পুরোপুরি লিপ্ত হতে এবং তার কায়-কারবার পূর্ণ তৎপরতার সাথে আঞ্জাম দিতে উদ্বুদ্ধ করতো এবং সেই সংগে দায়িত্ববোধ ও জওয়াবদিহির অনুভূতি তাঁদেরকে কখনো সীমা লংঘন করতে দিতো না। তাঁরা আল্লাহর প্রতিনিধি (খালীফা) হিসেবে অত্যন্ত আত্ম-মর্যাদা বোধসম্পন্ন ছিলেন। আবার এই ধারণাই তাঁদেরকে দাম্ভিক ও অহংকারী হওয়া থেকে বিরত রাখতো। তাঁরা সুষ্ঠুভাবে খিলাফাতের (প্রতিনিধিত্বের) দায়িত্ব সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় প্রতিটি পার্থিব জিনিসের প্রতিই অনুরক্ত ছিলেন। কিন্তু সেই সংগে যেই সকল জিনিস দুনিয়ার ভোগাড়ম্বরে আচ্ছন্ন করে মানুষকে তার দায়িত্ব ও কর্তব্য থেকে ভুলিয়ে রাখে তার প্রতি তাঁদের কোনই আসক্তি ছিলো না। মোটকথা, দুনিয়ার কায়-কারবার তাঁরা এই ভাবে সম্পাদন করতেন যে তাঁরা এখানে চিরদিন থাকবেন না। এই ভোগাড়ম্বরে মশগুল হওয়া থেকে এই ভেবে বিরত থাকতেন যে সাময়িক কিছুদিনের জন্য তাঁরা এখানে বসতি স্থাপন করেছেন মাত্র।"

"পরবর্তীকালে ইসলামের প্রভাব হ্রাস ও অন্য সংস্কৃতি দ্বারা প্রভাবিত হওয়ায় মুসলিমদের চরিত্রে পূর্ণাঙ্গ ইসলামী বৈশিষ্ট আর বাকি রইলো না। এর ফলে তারা পার্থিব জীবন সম্পর্কে ইসলামী ধারণার যা কিছু বিপরীত তার সব কিছুই করলো। তারা বিলাস-ব্যসনে লিপ্ত হলো। বিশাল বিশাল ইমারত তৈরি করলো। গানবাদ্য, চিত্রকলা, ভাস্কর্য ও চারুকলার প্রতি আকৃষ্ট হলো। সামাজিকতা ও আচার পদ্ধতিতে ইসলামী মূল্যবোধের বিপরীত ব্যয়বাহুল্য ও আড়ম্বরে অভ্যস্ত

হলো। রাষ্ট্র-শাসন, রাজনীতি ও অন্যান্য বৈষয়িক ব্যাপারে তারা সম্পূর্ণ অ-ইসলামী পন্থা অনুসরণ করলো।"

দ্রষ্টব্য : ইসলামী সংস্কৃতির মর্মকথা, সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী, পৃষ্ঠা-৪৫, ৪৬

১৪. পর্দার বিধান

পর্দার বিধান সমাজ জীবনের পবিত্রতা নিশ্চিত করার জন্য বিজ্ঞান সম্মত বিধান। এই বিধানের তাৎপর্য সঠিকভাবে উপলব্ধি করতে হলে আবেগ-মুক্ত মন নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করা প্রয়োজন।

পর্দার বিধানের স্বরূপ নির্ণয়ে সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদীর (রহ) প্রয়াস প্রশংসনীয়। তাঁর ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ যাঁদেরকে উপলক্ষ করে আল হিজাবের বিধান নাযিল হয়েছিল সেই উম্মুল মুমিনীনদের আমলের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। পর্দার বিধান ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করতে গিয়ে তিনি বলেন,

ক) সৌন্দর্য প্রকাশের সীমারেখা

"দৃষ্টি সংযমের নির্দেশাবলী নারী ও পুরুষের জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য। আবার কতক নির্দেশ নারীদের জন্য নির্দিষ্ট। তার মধ্যে প্রথম নির্দেশ এই যে, একটি নির্দিষ্ট সীমারেখার বাইরে আপন সৌন্দর্য প্রদর্শন করা চলবে না।

এই নির্দেশের উদ্দেশ্য ও কারণ সম্পর্কে চিন্তা করবার পূর্বে ঐ সকল নির্দেশ স্মরণ করা দরকার। মুখমণ্ডল ছাড়া নারীর সারা শরীর 'সতর' যা পিতা, চাচা, ভাই এবং পুত্রের নিকটও উন্মুক্ত রাখা জায়েয নয়। এমনকি কোন নারীর 'সতর' অপর নারীর সম্মুখে উন্মুক্ত করাও মাকরূহ। এটা সামনে রেখে সৌন্দর্য প্রকাশের সীমারেখা আলোচনা করা যাক।

১. নারীকে তার সৌন্দর্য স্বামী, পিতা, শ্বশুর, সৎপুত্র, ভাই, ভাইপো এবং বোনের ছেলের সম্মুখে প্রকাশ করবার অনমুতি দেয়া হয়েছে।

২. তাকে আপন গোলামের সম্মুখে (অন্য কারো গোলামের সম্মুখে নয়) সৌন্দর্য প্রদর্শনের অনুমতি দেয়া হয়েছে।

৩. নারী এমন লোকের সামনেও সৌন্দর্য-শোভা সহকারে আসতে পারে যে তার অনুগত ও অধীন এবং নারীদের প্রতি তার কোন আগ্রহ-আকাঙ্ক্ষা নেই।

৪. যে সকল বালকের মধ্যে এখনো যৌন অনুভূতির সঞ্চার হয়নি তাদের সম্মুখেও নারী সৌন্দয প্রদর্শন করতে পারে। আল কুরআনে

উল্লেখ রয়েছে, "(অর্থাৎ) এমন বালক যারা গোপন কথা সম্পর্কে পরিজ্ঞাত হয়নি।"

৫. সকল সময় মেলামেশা করে এমন মেয়েদের সামনে নারীর সৌন্দর্য-শোভা প্রদর্শন জায়েয আছে। আলকুরআনে 'সাধারণ নারীগণ' শব্দের পরিবর্তে 'আপন নারীগণ' ব্যবহার করা হয়েছে। এর দ্বারা 'সম্ভ্রান্ত মহিলাগণ' অথবা 'আপন মহিলা আত্মীয়-স্বজন' অথবা 'আপন শ্রেণীর মহিলাগণ'কেই বুঝানো হয়েছে। অজ্ঞ-মূর্খ নারী, এমন নারী যাদের চালচলন সন্দেহযুক্ত অথবা যাদের চরিত্রে কলংক ও লাম্পট্যের ছাপ আছে এই সকল নারীর সম্মুখে আল্যেচ্য নারীর সৌন্দর্য প্রদর্শনের অনুমতি নেই। কারণ এরাও অনাচার অমংগলের কারণ হতে পারে। মুসলিমগণ সিরিয়া যাওয়ার পর মুসলিম মহিলাগণ ইয়াহুদি-খৃস্টান মহিলাদের সাথে মেলামেশা আরম্ভ করলে হযরত উমার (রা) সিরিয়ার গভর্নর আবু উবায়দাহ ইবনুল জাররাহকে (রা) লিখে জানালেন যাতে মুসলিম মহিলাগণকে আহলে কিতাব নারীদের সাথে হাম্মামে প্রবেশ করতে নিষেধ করা হয়। (তাফসীরে ইবনে জারীর)

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) ব্যাখ্যা করে বলেন যে, মুসলিম মহিলাগণ কাফির এবং জিম্মী নারীদের সামনে ততটুকু প্রকাশ করতে পারে যতটুকু অপরিচিত পুরুষের সামনে করতে পারে। (তাফসীরে কবীর)

কোন ধর্মীয় স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখা এসবের উদ্দেশ্য ছিলো না। বরং যে সকল নারীর স্বভাব-চরিত্র ও তাহযীব-তামাদ্দুন জানা ছিলো না অথবা ইসলামের দৃষ্টিতে আপত্তিকর বলে জানা ছিলো– এই ধরনের নারীর প্রভাব থেকে মুসলিম নীরদেরকে রক্ষা করা ছিলো এসবের উদ্দেশ্য। আবার অমুসলিম নারীদের মধ্যে যারা সম্ভ্রান্ত ও লজ্জাশীল তারা আল-কুরআনে নির্দেশিত 'আপন মহিলাগণের' মধ্যেই শামিল।

এ সকল সীমারেখা সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করলে দুটো বিষয় স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

১. যে সৌন্দর্য প্রকাশের অনুমতি এই সীমাবদ্ধ গন্ডীর মধ্যে দেয়া হয়েছে তা 'সতর-আওরতের' আওতা বহির্ভূত অংগাদির। অর্থাৎ অলংকারাদি পরিধান করা, সুন্দর বেশভূষায় সজ্জিত হওয়া, সুরমা ও সুগন্ধি ব্যবহার করা এবং অন্যান্য বেশভূষা যা নারীগণ নারীসুলভ চাহিদা অনুযায়ী আপন গৃহে পরতে অভ্যস্ত হয়।

২. এ ধরনের বেশভূষা প্রদর্শনের অনুমতি ঐ সকল পুরুষের সম্মুখে দেয়া হয়েছে যাদেরকে নারীর জন্য চিরদিনের জন্য হারাম করা হয়েছে অথবা ঐ সকল লোকের সম্মুখে যাদের মধ্যে যৌন বাসনা নেই অথবা ঐ লোকের সম্মুখে যারা কোন অনাচার-অমংগলের কারণ হবে না।

নারীদের বেলায় 'আপন মহিলাগণ' শর্ত আরোপ করা হয়েছে। অধীনদের জন্য 'যৌন বাসনাহীন' শর্ত আরোপ করা হয়েছে। বালকদের জন্য 'নারীদের গোপন বিষয় সম্পর্কে অপরিজ্ঞাত' শর্ত আরোপ করা হয়েছে। এ থেকে জানতে পারা গেল যে, শরীয়াত প্রণেতার উদ্দেশ্য হচ্ছে নারীর সৌন্দর্য প্রদর্শন এমন গন্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা যাতে তার সৌন্দর্য ও বেশভূষা দ্বারা কোন প্রকার অবৈধ উত্তেজনা সৃষ্টি এবং যৌন উচ্ছৃংখলতার আশংকা হতে না পারে।

এই গন্ডির বাইরে যত পুরুষ আছে তাদের সম্পর্কে এই আদেশ করা হয়েছে যে, তাদের সম্মুখে সৌন্দর্য ও বেশভূষা প্রদর্শন করা চলবে না। উপরন্তু পথ চলার সময় এমনভাবে পদক্ষেপ করা চলবে না যাতে গোপন সৌন্দর্য ও বেশভূষা পদধ্বনি দ্বারা প্রকাশিত হয়ে পড়ে এবং পুরুষের দৃষ্টি উক্ত নারীর প্রতি আকৃষ্ট হয়। এই আদেশ দ্বারা যে সৌন্দর্য পর পুরুষ থেকে গোপন করতে বলা হয়েছে তা ঠিক তাই যা উপরে উল্লেখিত সীমাবদ্ধ গন্ডির মধ্যে প্রকাশ করবার অনুমতি দেয়া হয়েছে। উদ্দেশ্য অতি স্পষ্ট। মহিলারা যদি বেশভূষা করে এমন লোকের সম্মুখে আসে যারা যৌন লালসা রাখে এবং মুহরেম না হওয়ার কারণে যাদের মনের যৌন লালসা পবিত্র নিষ্পাপ ভাবধারায় পরিবর্তিত হয়নি তাহলে অবশ্যম্ভাবীরূপে এর প্রতিক্রিয়া মানবসুলভ চাহিদা অনুসারেই হবে। এটা কেউ বলে না যে, এরূপ সৌন্দর্য প্রকাশের ফলে প্রতিটি নারী চরিত্রহীন হবে এবং প্রত্যেকটি পুরুষ কার্যতঃ পাপাচারী হয়ে পড়বে। কিন্তু এটাও কেউ অস্বীকার করতে পারেনা যে, সুন্দর বেশভূষা সহকারে নারীদের প্রকাশ্য চলাফেরা এবং জনসমাবেশে অংশগ্রহণ করার ফলে অসংখ্য প্রকাশ্য ও গোপন, মানসিক ও বৈষয়িক ক্ষতি সাধিত হচ্ছে। আজকের ইউরোপ ও আমেরিকার নারীসমাজ নিজেদের এবং স্বামীর উপার্জিত অর্থের অধিকাংশ বেশভূষায় ব্যয় করছে। তাদের এই ব্যয়ভার প্রতিদিন এতো বেড়ে যাচ্ছে যে, তা বহন করার আর্থিক সংগতিও তাদের নেই। যে সকল যৌন লালসাপূর্ণ দৃষ্টি বাজারে, অফিসে এবং জনসমাবেশে যোগদানকারী নারীদেরকে খোশ আমদেদ জানায় তা-ই কি এই উন্মাদনা সৃষ্টি করেনি? আবার চিন্তা করে দেখুন, নারীদের মাঝে সাজসজ্জার এই

প্রবল আকাঙ্ক্ষা সৃষ্টি হওয়ার ও তা বৃদ্ধি পেতে থাকার কারণ কি? এর কারণ কি এটাই নয় যে, তারা পুরুষের প্রশংসা লাভ করতে ও তাদের চোখে পছন্দনীয় হতে চায়? এটা কেন? তা কি একেবারে নিষ্পাপ আকাঙ্ক্ষা? এর মাঝে কি যৌন বাসনা লুক্কায়িত নেই যা নিজের স্বাভাবিক গণ্ডির বাইরে বিস্তার লাভ করতে চায় এবং যার দাবী পূরণের জন্য অপর প্রান্তেও অনুরূপ বাসনা রয়েছে? আপনি যদি এ সত্যকে অস্বীকার করেন তাহলে আগামীকাল হয়তো আপনি এটা দাবী করতে দ্বিধা করবেন না যে, যে আগ্নেয়গিরিতে ধোঁয়া দেখা যাচ্ছে তার ভেতরের লাভা বাইরে ছুটে আসতে উন্মুখ নয়।

কাজ করার স্বাধীনতা আপনার আছে। যা আপনার ইচ্ছা তা করুন। কিন্তু সত্যকে অস্বীকার করবেন না। এ সত্য এখন আর গোপনও নেই। দিনের আলোর মতোই এর ফল প্রকাশ হয়ে পড়েছে। এই ফল আপনি জ্ঞাতসারে অথবা অজ্ঞাতসারে গ্রহণ করছেন। কিন্তু যেখান থেকে এর প্রকাশ সূচিত হয় ইসলাম ওখানেই একে বন্ধ করে দিতে চায়। কারণ ইসলামের দৃষ্টি সৌন্দর্য প্রকাশের বাহ্যতঃ নিষ্পাপ সূচনার ওপর নিবদ্ধ নয় বরং যে ভয়ানক পরিণাম কিয়ামতের অন্ধকারের মতো সমগ্র সমাজে ছড়িয়ে পড়েছে তার ওপরই নিবদ্ধ।

"পর-পুরুষের সম্মুখে সাজসজ্জা সহকারে বিচরণকারী নারী আলোবিহীন কিয়ামতের অন্ধকারের মতো।" (জামিউত তিরমিযী)

আলকুরআনে যে পর-পুরুষের সম্মুখে সৌন্দর্য প্রকাশ নিষিদ্ধ করা হয়েছে সেখানে একটি ব্যতিক্রমও আছে। যথা, 'ইল্লা মা জাহারা মিনহা'। এর অর্থ এই যে, যে সৌন্দর্য বা বেশভূষা আপনাআপনি প্রকাশ হয়ে পড়ে, তাতে কোন দোষ নেই।

লোকেরা এই ব্যতিক্রম থেকে কিছু সুবিধা লাভ করবার চেষ্টা করেছে। কিন্তু আসলে এই শব্দগুলো থেকে বেশী সুবিধা লাভের কোন অবকাশ নেই। শরীয়াত প্রণেতা এই কথা বলেন যে, স্বেচ্ছায় অপরের সম্মুখে সৌন্দর্য প্রকাশ করো না। কিন্তু যে বেশভূষা আপনাআপনি প্রকাশ হয়ে পড়ে, অথবা প্রকাশ হতে বাধ্য তার জন্য কেউ দায়ী হবে না। এর অর্থ অত্যন্ত পরিষ্কার। তোমার নিয়াত যেন সৌন্দর্য ও বেশভূষা প্রকাশের না হয়। তোমার মনে এই ইচ্ছা ও প্রেরণা কিছুতেই হওয়া উচিত নয় যে, নিজের সাজসজ্জা অপরকে দেখাবে কিংবা কিছু না হলেও অন্তত অলংকারাদির লুপ্ত ঝংকার শুনিয়ে তোমার প্রতি অপরের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। তোমাকে তো আপন সৌন্দর্য-শোভা গোপন করবার যথাসাধ্য

চেষ্টা করতে হবে। এরপর যদি কোন কিছু অনিচ্ছাসত্ত্বেও প্রকাশ হয়ে পড়ে এর জন্য আল্লাহ তোমাকে দায়ী করবেন না। তুমি যে বস্ত্র দ্বারা তোমার সৌন্দর্য ঢেকে রাখবে তা তো প্রকাশ পাবেই। তোমার দেহের গঠন ও উচ্চতা, শারীরিক সৌষ্ঠব ও আকার-আকৃতি তো এতে ধরা যাবে। কাজ-কর্মের জন্য আবশ্যক মতো তোমার হাত দুটো ও মুখমণ্ডলের কিয়দংশ তো উন্মুক্ত করতেই হবে। এরূপ হলে কোন দোষ নেই। তোমার ইচ্ছা তা প্রকাশ করা নয়, বাধ্য হয়েই তুমি তা করছো। এতে যদি কোন অসৎ ব্যক্তি আনন্দ-স্বাদ উপভোগ করে তো করুক। সে তার অসৎ অভিলাষের শাস্তি ভোগ করবে। তামাদ্দুন ও নৈতিকতা যতোখানি দায়িত্ব তোমার উপর অর্পণ করেছিলো তুমি তা সাধ্যানুযায়ী পালন করেছো। উপরোক্ত আয়াতের মর্ম এটাই।

তাফসীরকারগণের মধ্যে এই আয়াতের মর্ম নিয়ে যত প্রকার মতভেদ আছে তা নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করলে জানতে পারা যাবে যে, যাবতীয় মত-পার্থক্য সত্ত্বেও আয়াতের মর্ম তা-ই দাঁড়াবে যা উপরে বলা হলো। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ, ইবরাহীম নাখয়ী এবং হাসান বসরীর মতে, প্রকাশ্য সৌন্দর্যের অর্থ সকল বস্ত্রাদি যার মধ্যে আভ্যন্তরীণ সৌন্দর্য ঢেকে রাখা যায়; যেমন, বোরকা, চাদর ইত্যাদি।

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস, মুজাহিদ, আ'তা ইবনে উমার, আনাস, জাহহাক, সাঈদ, ইবনে যুবাইর, আওযায়ী এবং হানাফী মতাবলম্বী ইমামদের মতে এর অর্থ মুখমণ্ডল ও হস্তদ্বয় এবং এতে ব্যবহৃত সৌন্দর্য উপাদানসমূহ, যেমন, হাতের মেহেদি, আংটি, চোখের সুরমা প্রভৃতি।

সাঈদ ইবনুল মুসাইয়েবের মতে ব্যতিক্রম শুধু মুখমণ্ডল এবং অন্য এক বর্ণনাতে হাসান বসরীও এই মত সমর্থন করেন।

আয়িশার (রা) মতে প্রকাশ্য সৌন্দর্যের অর্থ হস্তদ্বয়, হাতের চুড়ি, আংটি, কংকন ইত্যাদি। তিনি মুখমণ্ডল ঢেকে রাখার পক্ষে।

মিসওয়ার ইবনে মাখরামা এবং কাতাদাহ অলংকারাদিসহ হাত খুলবার অনুমতি দেন এবং তাঁর উক্তিতে মনে হয় যে, তিনি সমগ্র মুখমণ্ডলের পরিবর্তে শুধু দু' চোখ খুলে রাখা জায়েয রাখেন। ইবনে জারীর ও আহকামুল কুরআন।

এই সকল মতভেদের উদ্দেশ্য সম্পর্কে চিন্তা করে দেখুন। এই সকল মুফাসসির "ইল্লা মা জাহারা মিনহা" সম্পর্কে এটাই বলেছেন যে, আল্লহ তা'আলা এমন সৌন্দর্য প্রকাশের অনুমতি দেন যা আবশ্যিকভাবে প্রকাশ হয়ে পড়ে অথবা যা

প্রকাশ করা আবশ্যক হয়ে পড়ে। হাতের প্রদর্শনী অথবা একে কারো দৃষ্টির বিষয়বস্তু বানানো এদের কারো উদ্দেশ্য নয়। প্রত্যেকে আপন আপন বোধশক্তি অনুযায়ী নারীদের প্রয়োজনকে সামনে রেখে এটা বুঝবার চেষ্টা করেছেন যে, প্রয়োজন হলে কোন্ বিষয়ে কতখানি পর্দার বাইরে যাওয়া যায় অথবা কোন্ অংগ আবশ্যিকভাবে উন্মুক্ত করা যায় কিংবা স্বভাবতই উন্মুক্ত হয়। আমরা বলি যে, 'ইল্লা মা জাহারা মিনহা'-কে এর কোন একটিতেও সীমাবদ্ধ রাখবেন না। যে মুমিন নারী আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের (সা) নির্দেশাবলীর অনুগত থাকতে চায় এবং অনাচার-অমংগলে লিপ্ত হওয়া যার ইচ্ছা নয় সে নিজেই নিজের অবস্থা ও প্রয়োজন অনুসারে সিদ্ধান্ত নিতে পারে যে, সে মুখমণ্ডল ও হস্তদ্বয় উন্মুক্ত করবে কি করবে না, করতে চাইলে কোন্ সময়ে করবে, কতটুকু উন্মুক্ত এবং কতটুকু আবৃত রাখবে। এই ব্যাপারে শরীয়াত প্রণেতা কোন সুস্পষ্ট নির্দেশ দেননি। অবস্থার বিভিন্নতা ও প্রয়োজন দেখে নির্দেশ নির্ধারণ করতে হবে। যে নারী আপন প্রয়োজনে বাইরে যেতে ও কাজকর্ম করতে বাধ্য তার হাত এবং কখনো মুখমণ্ডল খোলার প্রয়োজন হবে। এইরূপ নারীর জন্যে প্রয়োজন অনুসারে অনুমতি রয়েছে। কিন্তু যে নারীর অবস্থা এইরূপ নয় তার বিনা কারণে স্বেচ্ছায় মুখমণ্ডল ও হস্তদ্বয় অনাবৃত করা দুরস্ত নয়।

অতএব শরীয়াত প্রণেতার উদ্দেশ্য এই যে, যদি নিজের সৌন্দর্য প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে কোন অংগ-অংশ অনাবৃত করা হয় তাতে পাপ হবে। অনিচ্ছায় আপনাআপনিই কিছু প্রকাশিত হয়ে পড়লে তাতে কোন পাপ হবে না। প্রকৃত প্রয়োজন যদি অনাবৃত করতে বাধ্য করে তাহলে তা জায়েয হবে।

এখন প্রশ্ন এই যে, অবস্থার বিভিন্নতা হতে দৃষ্টি ফিরিয়ে শুধু মুখমণ্ডল সম্পর্কে কি নির্দেশ রয়েছে? শরীয়াত প্রণেতা একে পছন্দ করেন, না অপছন্দ করেন? শুধুমাত্র প্রয়োজনের সময় একে অনাবৃত করা যায়, না অপরের দৃষ্টি থেকে এটি লুকিয়ে রাখার বস্তুই নয়?

সূরা আহযাবের আয়াতগুলোতে এসব প্রশ্নের ওপর আলোকপাত করা হয়েছে।

খ) মুখমণ্ডল সম্পর্কে নির্দেশ

"হে নবী, তোমার স্ত্রীগণ, কন্যাগণ এবং মুসলিম মহিলাগণকে বলে দাও তারা যেন চাদর দ্বারা নিজেদের ঘোমটা টেনে দেয়। এই ব্যবস্থার দ্বারা আশা করা যায় যে, তাদেরকে চিনতে পারা যাবে এবং তাদেরকে উত্যক্ত করা হবে না।" আল-আহযাব ॥ ৫৯

বিশেষ করে মুখমণ্ডল আবৃত করার নির্দেশ নিয়েই এই আয়াত নাযিল হয়েছে। "জিলবাব" শব্দের বহুবচন "জালাবীব"। এর অর্থ চাদর। 'এদনা' শব্দের অর্থ লটকান। "ইউদনীনা আলাইহিন্না মিন জালাবীবে হিন্না" অর্থ নিজেদের ওপরে চাদরের খানিক অংশ যেন লটকিয়ে দেয়। ঘোমটা দেয়ার অর্থও এটাই। কিন্তু এই আয়াতের প্রকৃত উদ্দেশ্য সাধারণভাবে পরিচিত 'ঘোমটা' নয়। এর উদ্দেশ্য মুখমণ্ডল আবৃতকরণ। তা ঘোমটার দ্বারা হোক, চাদর অথবা অন্য যে কোন উপায়ে হোক। এর উপকারিতা এই বর্ণনা করা হয়েছে যে, যখন মুসলিম নারী এভাবে আবৃত অবস্থায় ঘরের বাইরে যাবে তখন লোকেরা বুঝতে পারবে যে, এ এক সম্ভ্রান্ত মহিলা– নির্লজ্জ ও শ্লীলতা বর্জিত মহিলা নয়। এ কারণে কেউ তার শ্লীলতার প্রতিবন্ধক হবে না।

আলকুরআনের সকল মুফাসসির এই আয়াতের এই মর্মই ব্যক্ত করেছেন।

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) এই আয়াতের তাফসীরে বলেন, "আল্লাহ তা'আলা মুসলিম নারীদেরকে আদেশ করেছেন যে, তারা যখন কোন প্রয়োজনে ঘরের বাইরে যাবে তখন যেন তারা মাথার ওপর থেকে চাদরের অংশ ঝুলিয়ে মুখমণ্ডল ঢেকে নেয়।" (তাফসীরে ইবনে জারীর)

ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে শিরীন হযরত উবাইদা ইবনে সুফিয়ান ইবনে আলহারেস আলহাযরামীর নিকট জানতে চাইলেন, এই নির্দেশের ওপর কিভাবে আমল করতে হবে। এর উত্তরে তিনি নিজের ওপর চাদর ঝুলিয়ে দেখিয়ে দিলেন। কপাল, নাক ও একটি চোখ ঢেকে ফেললেন। শুধু একটি চোখ অনাবৃত রাখলেন। (তাফসীরে ইবনে জারীর)

আল্লামা ইবনে জারীর তাবারী এই আয়াতের তাফসীরে লিখেন, "হে নবী, আপনার স্ত্রীগণ, কন্যাগণ ও মুসলিম মহিলাগণকে বলে দিন, যখন কোন প্রয়োজনে আপন ঘর থেকে বাইরে যায় তখন যেন ক্রীতদাসীদের পোষাক না পরে– যে পোষাকে মাথা ও মুখমণ্ডল অনাবৃত থাকে এবং তারা যেন নিজেদের ওপরে চাদরের ঘোমটা টানিয়ে দেয় যাতে ফাসিক লোকেরা তাদের শ্লীলতার অন্তরায় না হয় এবং জানতে পারে এরা সম্ভ্রান্ত মহিলা।" (তাফসীরে ইবনে জারীর)

আল্লামা আবু বকর জাসসাস বলেন, "এই আয়াতের দ্বারা এই কথা প্রমাণিত হয় যে, যুবতী নারীকে পরপুরুষ হতে তার মুখমণ্ডল আবৃত রাখার আদেশ করা

হয়েছে এবং ঘর থেকে বাইরে যাবার সময় পর্দা পালন ও সম্ভ্রমশীলতা প্রদর্শন করা উচিত যাতে অসৎ অভিপ্রায় পোষণকারী তার প্রতি প্রলুব্ধ হতে না পারে।" (আহকামুল কুরআন)

আল্লামা নিশাপুরী তাঁর 'তাফসীরে গারায়েবুল কুরআনে' লিখেন, "ইসলামের প্রাথমিক যুগে মেয়েরা জাহিলিয়াত যুগের মতো কামিস ও দোপাট্টা পরে বাইরে যেতো। সম্ভ্রান্ত মহিলাদের পোষাকও নিম্নশ্রেণীর মেয়েদের পোষাক থেকে পৃথক ছিলো না। অতঃপর আদেশ হলো যে, তারা যেন চাদর টেনে তাদের মুখমণ্ডল ঢেকে ফেলে যাতে লোকেরা মনে করতে পারে যে, এরা সম্ভ্রান্ত মহিলা, শ্লীলতাবর্জিত মহিলা নয়।"

ইমাম রাজী লিখেন, "জাহিলিয়াত যুগে সম্ভ্রান্ত মহিলাগণ এবং ক্রীতদাসীগণ বেপর্দা চলাফেরা করতো এবং অসৎ লোক তাদের পিছু নিতো। আল্লাহ তা'আলা সম্ভ্রান্ত নারীদের প্রতি আদেশ করলেন তারা যেন চাদর দ্বারা নিজেদেরকে আবৃত করে। 'যালিকা আদনা আঁইউরাফনা ফালা ইউযাইনা'– আয়াতাংশের দু'প্রকার মর্ম হতে পারে। এক. এই পোষাক থেকে বুঝা যাবে যে, এরা সম্ভ্রান্ত মহিলা এবং এদের পিছু নেয়া হবে না। দুই. এর দ্বারা বুঝা যাবে যে, এরা চরিত্রহীনা নয়। কারণ যে নারী তার মুখমণ্ডল ঢেকে রাখে তার কাছ থেকে কেউ এ আশা পোষণ করতে পারে না যে, সে আওরত (শরীরের যে অংশ স্বামী-স্ত্রী ছাড়া সকলের নিকট আবৃত রাখতে হয়) অনাবৃত করতে রাজী হবে। এই পোষাক এটাই প্রমাণ করবে যে, সে একজন পর্দানশীন নারী এবং তার দ্বারা কোন অসৎ কাজের আশা করা বৃথা।" (তাফসীরে কবীর)

কাযী বায়জাবী লিখেন, "ইউদনীনা আলাইহিন্না মিন জালাবীবে হিন্না'-র অর্থ এই যে, যখন তারা আপন প্রয়োজনে বাইরে যাবে তখন চাদর দ্বারা শরীর ও মুখমণ্ডল ঢেকে নেবে। এখানে 'মিন' শব্দটি 'তাব'য়ীদ'-এর জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ চাদরের একাংশ দিয়ে মুখমণ্ডল আবৃত করতে হবে এবং একাংশ শরীরের ওপর জড়িয়ে দিতে হবে। 'যালিকা আদনা আঁইউরাফনা' দ্বারা সম্ভ্রান্ত নারী এবং ক্রীতদাসী ও গায়িকাদের মধ্যে পার্থক্য করা হয়েছে। 'ফালা ইউযাইনা' দ্বারা বুঝানো হয়েছে, সন্দেহভাজন লোক তাদের শ্লীলতাহানির দুঃসাহস করবে না।" (তাফসীরে বায়জাবী)

এ সকল উক্তি থেকে প্রমাণিত হয় যে, সাহাবায়ে কিরামের (রা) পবিত্র যুগ থেকে শুরু করে অষ্টম শতাব্দী পর্যন্ত প্রত্যেক যুগে উক্ত আয়াতের একই মর্ম করা হয়েছে।

হাদীসগুলোর প্রতি লক্ষ্য করলে তা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর নবী করীমের (সা) যুগে সাধারণভাবে মুসলিম নারীগণ মুখমণ্ডলের ওপর আবরণ দেয়া শুরু করেন এবং অনাবৃত মুখমণ্ডল নিয়ে চলাফেরার প্রচলন বন্ধ হয়ে যায়।

সুনানু আবী দাউদ, জামিউত তিরমিযী, মুয়াত্তা ইমাম মালিক ও অন্যান্য হাদীস গ্রন্থগুলিতে আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) ইহরাম অবস্থায় মহিলাদের মুখে আবরণ এবং হাতে দস্তানা পরিধান করা নিষেধ করে দিয়েছিলেন। এতে প্রমাণিত হয় যে, সেই পবিত্র যুগেই মুখমণ্ডল আবৃত করার জন্য আবরণ এবং হস্তদ্বয় ঢাকবার জন্য দস্তানা ব্যবহারের প্রচলন ছিলো। শুধু ইহরামের অবস্থায় তা ব্যবহার করতে নিষেধ করা হয়েছিলো। কিন্তু হজ্জের সময় নারীর মুখমণ্ডল জনসাধারণের দৃষ্টিগোচর করা এর উদ্দেশ্য ছিলো না। এর উদ্দেশ্য ছিলো, ইহরামের দীনবেশে মুখের আবরণ যেন নারীদের পোষাকের কোন অংশবিশেষ না হতে পারে যা অন্য সময়ে সাধারণভাবে হয়ে থাকে।

অন্যান্য হাদীসে রয়েছে যে, ইহরাম অবস্থায়ও নবীর (সা) স্ত্রীগণ ও অন্যান্য মুসলিম মহিলাগণ আবরণহীন মুখমণ্ডল পর-পুরুষের দৃষ্টি থেকে লুকিয়ে রাখতেন। হযরত আয়িশা (রা) বলেন, "যানবাহন আমাদের নিকট দিয়ে যাচ্ছিলো এবং আমরা রাসূলুল্লাহর (সা) সংগে ইহরাম অবস্থায় ছিলাম। যখন লোক আমাদের সম্মুখে আসতো, আমরা আমাদের চাদর মাথার ওপর থেকে মুখমণ্ডলের ওপর টেনে দিতাম। তারা চলে গেলে আবার মুখমণ্ডল খুলে দিতাম।" (সুনানু আবী দাউদ)

ফাতিমা বিনতে মানযার বলেন, "আমরা ইহরাম অবস্থায় কাপড় দিয়ে মুখমণ্ডল ঢেকে রাখতাম। আমাদের সাথে আসমা বিনতে আবু বকরও ছিলেন।"

কিতাবুল হজ্জে হযরত আয়িশার (রা) এই উক্তি উদ্ধৃত রয়েছে ঃ "নারীগণ যেন ইহরাম অবস্থায় নিজেদের চাদর মাথা থেকে মুখমণ্ডলের ওপর ঝুলিয়ে দেয়।"

আলকুরআনের সংশ্লিষ্ট শব্দাবলী ও জনসাধারণ্যে তার স্বীকৃতি, সর্বসম্মত তাফসীর এবং রাসূলুল্লাহর (সা) যুগে তার বাস্তবায়নের দিকে যে ব্যক্তি লক্ষ্য করবে তার পক্ষে এ সত্যকে অস্বীকার করা সম্ভব হবে না যে, ইসলামী শরীয়াতে পর-পুরুষের সামনে নারীদের মুখমণ্ডল ঢেকে রাখার নির্দেশ রয়েছে এবং স্বয়ং রাসূলুল্লাহর (সা) যুগেই এ নির্দেশ প্রতিপালিত হয়েছে। যে পবিত্র ব্যক্তিত্বের প্রতি আলকুরআন নাযিল হয়েছিলো তাঁর চোখের সামনেই মুসলিম মহিলাগণ

একে বহির্বাটিস্থ পোষাকের অংশ হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন এবং সেকালেও এর নাম ছিলো 'নিকাব' বা আবরণ।"

দ্রষ্টব্য ঃ পর্দার বিধান, সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী, পৃষ্ঠা-৮-১৬

"ইল্লামা যাহারা মিনহা" আয়াতাংশের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণে মত-পার্থক্য রয়েছে ইসলামী চিন্তাবিদদের মধ্যে। কেউ কেউ এই আয়াতাংশের চেহারা খোলা রাখার অনুমতি রয়েছে বলে মনে করেন। কিন্তু সূক্ষ্মদর্শী ইসলামী চিন্তাবিদ সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (রহ) এই আয়াতাংশের যেই জ্ঞানগর্ভ বিশ্লেষণ পেশ করেছেন তা অসাধারণ। তিনি বলেন, "প্রকাশ হওয়া" এবং "প্রকাশ করার" মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য রয়েছে। আমরা দেখি আল কুরআন "প্রকাশ করা" থেকে বিরত রেখে "প্রকাশ হওয়া"-র ব্যাপারে অবকাশ দিচ্ছে। এই অবকাশকে "প্রকাশ করা" পর্যন্ত বিস্তৃত করা আল কুরআনের বিরোধী এবং এমন সব হাদীসেরও বিরোধী যেইগুলো থেকে প্রমাণিত হয় যে নবীর (সা) যুগে আলহিজাবের নির্দেশ আসার পর মহিলারা (চক্ষু ছাড়া) চেহারা খুলে চলতেন না, আল হিজাবের হুকুমের মধ্যে চেহারার পর্দাও শামিল ছিলো এবং ইহরাম ছাড়া অন্যান্য অবস্থায় নিকাবকে মহিলাদেরকে পোষাকের একটি অংশে পরিণত করা হয়েছিলো।"

দ্রষ্টব্য ঃ তাফহীমুল কুরআন, সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী, সূরা আন্ নূরের ৩৫ নাম্বার টীকা।

১৫। অস্ত্র ব্যবহার

মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহর (সা) সমসাময়িককালে নিজস্ব নিরাপত্তার জন্য অস্ত্র বহন করা ছিলো বৈধ এবং সকল আরবই অস্ত্র বহন করতো। একদিকে যেমন আবু জাহাল ও তার অনুসারীদের হাতে তলোয়ার, বল্লম ও তীর ছিলো, তেমনিভাবে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহর (সা) ও তাঁর প্রতি ঈমান পোষণকারীদের হাতেও তলোয়ার, বল্লম ও তীর ছিলো। উভয় পক্ষের অস্ত্রের মান ছিলো সমান।

ইসলামী আন্দোলন করতে গিয়ে মাক্কায় মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা) ও তাঁর সাথীরা নানাভাবে নির্যাতিত হয়েছেন। তাঁদের কেউ কেউ শাহাদাতও বরণ করেছেন। কিন্তু বৈধ অস্ত্র থাকা সত্ত্বেও তাঁরা অস্ত্র ব্যবহার করেননি। আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁদের প্রতি নির্দেশ ছিলো "কুফ্‌ফু আইদিয়াকুম"– তোমাদের হাত গুটিয়ে রাখ। অর্থাৎ অস্ত্র ব্যবহার করোনা। তখন আল জিহাদ ফি সাবীলিল্লাহ বা ইসলামী আন্দোলনের কাজ দাওয়াত ইলাল্লাহর মধ্যে সীমিত ছিলো। কিন্তু তের

বছর পর যখন মাদীনায় গণভিত্তি রচিত হলো ও ইসলামী সরকার গঠিত হলো তখন আল্লাহর নির্দেশে দাওয়াত ইলাল্লাহর সাথে সাথে আগ্রাসী শক্তির মুকাবিলার জন্য মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা) ও তাঁর সাথীরা অস্ত্র ব্যবহার শুরু করেন। এ থেকে ইসলামী আন্দোলনের কর্মপন্থা ও ইসলামী সরকারের কর্মপন্থার মধ্যে যে পার্থক্য রয়েছে তা সুস্পষ্ট হয়ে উঠে।

সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (রহ) ইসলামী আন্দোলনে অস্ত্র ব্যবহারের ঘোর বিরোধী ছিলেন। তাঁর প্রিয় সংগঠন জামায়াতে ইসলামীর "স্থায়ী কর্মনীতিতে" এই কথা সুস্পষ্টভাবে সন্নিবেশিত রয়েছে যে "জামায়াতে ইসলামী উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হাছিলের জন্য এমন কোন কর্মপন্থা অবলম্বন করবে না যা সততা ও ন্যায়পরায়ণতার পরিপন্থী কিংবা যার ফলে ফিতনা-ফাসাদ সৃষ্টি হয়।"

"লক্ষ্য হাছিলের জন্য নিয়মতান্ত্রিক পন্থা অবলম্বন করা হবে। অর্থাৎ দাওয়াত, তানযীম ও তারবীয়াতের মাধ্যমে লোকদের চিন্তার সংশোধন করে ইসলামী বিপ্লবের পক্ষে জনমত গঠন করা হবে।"

দ্রষ্টব্য : গঠনতন্ত্র, জামায়াতে ইসলামী, পৃষ্ঠা-১২

সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী বলেন :

"একটি নিয়মতান্ত্রিক ও গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় বসবাস করে নেতৃত্বের পরিবর্তনের জন্য কোন অনিয়মতান্ত্রিক পন্থা অবলম্বন করা শারীয়ার দৃষ্টিতে না-জায়েয।"

দ্রষ্টব্য : ইসলামী আন্দোলনের ভবিষ্যত কর্মসূচী, সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী, পৃষ্ঠা ১২০

একবার হাজ উপলক্ষে মাক্কাতে বিভিন্ন আরব দেশ থেকে আগত যুবকদের এক সমাবেশে ভাষণ দিতে গিয়ে সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী বলেন :

"আমার শেষ উপদেশ হলো এই যে, গোপন তৎপরতা চালিয়ে এবং অস্ত্র ব্যবহার করে বিপ্লব সাধনের চেষ্টা চালানো উচিৎ নয়। ...একটি নির্ভুল ও সত্যিকার বিপ্লব গণআন্দোলনের মাধ্যমেই সাধিত হয়। প্রকাশ্যে ব্যাপকভাবে দাওয়াতের কাজ করুন, বিরাটভাবে মন-মগজ ও চিন্তার বিশুদ্ধি সাধনের কাজ করুন। মানুষের চিন্তা-ধারার পরিবর্তন করুন। নৈতিকতার অস্ত্র ব্যবহার করে মানুষের মনের ওপর বিজয় লাভ করুন। চলার পথে যেইসব বাধা ও প্রতিবন্ধকতা আসবে সৎ সাহসের সাথে সেইগুলোর মুকাবিলা করুন। এইভাবে ক্রমান্বয়ে যেই বিপ্লব সাধিত হবে তা এমন স্থায়ী ও শক্তিশালী হবে যে, বিরোধী শক্তিগুলোর সৃষ্ট তুফান তাকে বিলুপ্ত করতে পারবেনা। তাড়াহুড়া করে কৃত্রিম

পদ্ধতিতে কোন বিপ্লব সাধিত হলে যেই পথে তা আসবে, সেই পথেই তাকে বিলুপ্ত করে দেয়াও যাবে।"

দ্রষ্টব্য : মাসিক তারজুমানুল কুরআন, জুন ১৯৬৩

১৬। ইসলামী বিপ্লব

সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী গভীরভাবে অধ্যয়ন করেছেন মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহর (সা) ইসলামী আন্দোলন ও ইসলামী রাষ্ট্র গঠনের ইতিহাস। মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা) ইসলামী রাষ্ট্র গঠনের আগে ইসলামী ব্যক্তি গঠনের কাজ করেছিলেন। আর এই গঠিত লোকদেরকে নিয়েই পরিচালনা করেছিলেন ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলন। জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রের মতো এই ক্ষেত্রেও তাঁর উপস্থাপিত মডেল অনুসরণ করা মুমিনদের কর্তব্য। ইসলামী রাষ্ট্র গঠন পদ্ধতি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী বলেন,

"এই রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য প্রয়োজন এমনসব লোকের যাদের অন্তরে রয়েছে আল্লাহর ভয়। যারা নিজেদের দায়িত্ব পালন সম্পর্কে আল্লাহর নিকট জওয়াবদিহি করতে হবে বলে অনুভূতি রাখে। যারা দুনিয়ার ওপর আখিরাতকে অগ্রাধিকার দেয়। যাদের দৃষ্টিতে নৈতিক লাভ-ক্ষতি পার্থিব লাভ-ক্ষতির চাইতে অধিক গুরুত্বপূর্ণ। যারা সর্বাবস্থায় সেইসব আইন-কানুন, বিধি-বিধান ও কর্ম-পদ্ধতি অনুসরণ করবে যা তাদের জন্য বিশেষভাবে তৈরি হয়েছে। যাদের চেষ্টা-সাধনার একমাত্র লক্ষ্য হবে আল্লাহর সন্তোষ অর্জন। ব্যক্তিগত ও জাতিগত স্বার্থের দাসত্ব ও কামনা-বাসনার গোলামীর জিঞ্জির থেকে যাদের গর্দান সম্পূর্ণ মুক্ত। হিংসা-বিদ্বেষ ও দৃষ্টির সংকীর্ণতা থেকে যাদের মন-মানসিকতা সম্পূর্ণ পবিত্র। ধন-সম্পদ ও ক্ষমতার নেশায় যারা উন্মাদ হবার নয়। ধন-সম্পদের লালসা আর ক্ষমতার লিপ্সায় যারা কাতর নয়। এই রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য এমন নৈতিক বলিষ্ঠতার অধিকারী লোক প্রয়োজন পৃথিবীর ধন-ভাণ্ডার হাতে এলেও যারা নিখাদ আমানতদার প্রমাণিত হবে। ক্ষমতা হস্তগত হলে জনগণের কল্যাণ চিন্তায় যারা না ঘুমিয়ে রাত কাটাবে। আর জনগণ যাদের সুতীব্র দায়িত্বানুভূতিপূর্ণ তত্ত্বাবধানে নিজেদের জান-মাল-ইযযতসহ যাবতীয় বিষয়ে থাকবে নিরাপদ ও নিরুদ্বিগ্ন। ইসলামী রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য প্রয়োজন এমন একদল লোকের যারা কোন দেশে বিজয়ী বেশে প্রবেশ করলে সেখানকার লোকেরা গণহত্যা, জনপদ ধ্বংস সাধন, যুলুম-নির্যাতন, গুণ্ডামী-বদমায়েশী ও ব্যভিচারের ভয়ে ভীত হবেনা। বরং বিজিত দেশের মানুষেরা এদের

প্রতিটি সিপাহীকে পাবে তাদের জান-মাল-ইযযতের ও নারীদের সতীত্বের হিফাযতকারীরূপে। আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে তারা এতোটা সুখ্যাতি ও মর্যাদার অধিকারী হবে যে তাদের সততা, সত্যবাদিতা, ন্যায়পরায়ণতা, নৈতিক-চারিত্রিক উৎকর্ষ ও ওয়াদা-প্রতিশ্রুতি পালনে গোটা দুনিয়া তাদের প্রতি হবে আস্থাশীল। এই ধরনের এবং কেবলমাত্র এই ধরনের লোকদের দ্বারাই প্রতিষ্ঠিত হতে পারে, ইসলামী রাষ্ট্র।"

দ্রষ্টব্য : ইসলামী বিপ্লবের পথ, সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী, পৃষ্ঠা-১৮

তিনি আরো বলেন :

"এ ছাড়া আল্লাহর দীনকে বিজয়ী করার আন্দোলনের জন্য প্রয়োজন এমন নেতৃত্ব যারা সেইসব নীতি থেকে এক ইঞ্চিও বিচ্যুত হবে না যেইগুলোর প্রতিষ্ঠার জন্য ইসলামের আবির্ভাব। এই আদর্শিক দৃঢ়তার ফলে মুসলিমদেরকে যদি না খেয়েও মরতে হয় এমন কি তাদেরকে যদি হত্যাও করা হয়, তবুও তাদের নেতৃবৃন্দ বিন্দুমাত্র বিচ্যুতি বরদাশত করতে প্রস্তুত হবেনা। যেই নেতৃত্ব কেবল জাতির স্বার্থ দেখে আদর্শ জলাঞ্জলি দিয়ে জাতির স্বার্থে যেই কোন কর্ম-পদ্ধতি অবলম্বন করে এবং যাদের অন্তর আল্লাহর ভয়শূন্য, তারা যে আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠার মহান কাজের একেবারেই অযোগ্য, তা বলার অপেক্ষা রাখে না।"

দ্রষ্টব্য : ইসলামী বিপ্লবের পথ, সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী, পৃষ্ঠা-২৪

আরো এগিয়ে গিয়ে তিনি বলেন :

"গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে ক্ষমতা তো সেইসব লোকের হাতেই আসবে যাদেরকে ভোটাররা সমর্থন করবে। ভোটারদের মধ্যে যদি ইসলামী চিন্তা ও মানসিকতা সৃষ্টি না হয়, খাঁটি ইসলামী নৈতিক চরিত্র গঠনের আগ্রহই যদি তাদের না থাকে এবং ইসলামের সেই নিরপেক্ষ ইনসাফ ও অলংঘনীয় নীতিগুলো যদি তারা মেনে চলতে প্রস্তুত না হয় যেইগুলোর ভিত্তিতে ইসলামী রাষ্ট্র পরিচালিত হবে, তবে তাদের ভোট দ্বারা কখনো খাঁটি মুসলিম নির্বাচিত হয়ে পার্লামেন্টে আসতে পারবে না। এই অবস্থায় কেবল ঐ সব লোকই নেতৃত্ব হাছিল করবে যারা আদমশুমারী অনুযায়ী তো মুসলিম, কিন্তু দৃষ্টিভঙ্গি, কর্মনীতি ও কর্মপদ্ধতির দিক থেকে তাদের গায়ে ইসলামের বাতাসও লাগেনি।"

দ্রষ্টব্য : ইসলামী বিপ্লবের পথ, সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী, পৃষ্ঠা ২৬, ২৭।

সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী আরো বলেন :

"অলৌকিকভাবে ইসলামী রাষ্ট্রের আবির্ভাব ঘটে না। ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য এমন একটি আন্দোলন উত্থিত হওয়া অপরিহার্য যার বুনিয়াদ নির্মিত হবে সেই জীবন দর্শন, সেই জীবনোদ্দেশ্য, সেই নৈতিক মানদণ্ড ও সেই চারিত্রিক আদর্শের ওপর যা হবে ইসলামের প্রাণ-শক্তির সাথে সম্পূর্ণভাবে সামঞ্জস্যশীল। কেবল সেইসব লোকই এই আন্দোলনের নেতা ও কর্মী হবার যোগ্য যারা এই বিশেষ ছাঁচে ঢেলে নিজেদেরকে গড়ে তুলতে প্রস্তুত হবেন এবং সেইসাথে সমাজে অনুরূপ মন-মানসিকতা ও নৈতিক প্রাণশক্তির প্রসারের জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবেন।"

দ্রষ্টব্য : ইসলামী বিপ্লবের পথ, সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী, পৃষ্ঠা-১৯

সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদীর এই বিশ্লেষণ ইসলাম প্রতিষ্ঠাকামীদের চোখ খুলে দেয়। তাঁরা ইসলামী রাষ্ট্র গঠনের পূর্বে খাঁটি ইসলামী ব্যক্তিত্ব গঠনের গুরুত্ব উপলব্ধি করতে সক্ষম হন।

১৭. মুতাজাদ্দিদ ও মুজাদ্দিদ

মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা) ও খুলাফায়ে রাশিদীনের শাসনকালে আশশূরা ছিলো রাষ্ট্রের অন্যতম প্রধান প্রতিষ্ঠান।

দীনী, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক-সাংস্কৃতিক কোন সমস্যা দেখা দিলে সমাধানের জন্য রাষ্ট্র-প্রধান আশ-শূরার মুখাপেক্ষী হতেন। আলকুরআনের নিরিখে পরামর্শ আদান-প্রদানের পর যেই সিদ্ধান্ত গৃহীত হতো তা রাষ্ট্রের সর্বত্র প্রচারিত হতো। সত্যনিষ্ঠ লোকদের হাতে নেতৃত্ব ছিলো বিধায় জনসাধারণ যাবতীয় সমাধান রাষ্ট্র-পরিচালকদের কাছ থেকেই পেতে চাইতো।

রাজতান্ত্রিক শাসন কায়েম হয়ে যাবার পর আশ-শূরার এই মর্যাদা রইলো না। ক্রমশ দীনী নেতৃত্ব ও রাজনৈতিক নেতৃত্ব পৃথক হয়ে গেলো।

দ্রুত প্রবাহিত হতে থাকে কালের স্রোত। আলকুরআন ও আসসুন্নাহ থেকে দূরে সরে যেতে থাকেন শাসকেরা। একই পথ ধরে শাসিতরাও। ভিন্ন জাতির জীবন দর্শন ও জীবনাচার প্রভাব ফেলতে শুরু করে মুসলিম উম্মাহর ওপর।

চিন্তাশীল ব্যক্তিদের বিভিন্ন গোষ্ঠী গড়ে ওঠে। তারা মানুষের সামনে উপস্থাপন করতে থাকে নানা মত ও পথ। উল্লেখযোগ্য সংখ্যক চিন্তাশীল ব্যক্তি মুসলিম

নামধারী অথচ ভিন্ন জীবনধারার অনুসারী ব্যক্তিদের কাছে ইসলামকে গ্রহণযোগ্য করার অভিপ্রায়ে খোদ ইসলামকেই কাটছাট করে অথবা অন্য কোন চিন্তাধারার সাথে মিশ্রিত করে এমনভাবে পেশ করেছেন যে এতে ইসলামের আসল রূপ অবশিষ্ট থাকেনি। প্রকৃতপক্ষে তাঁদের দ্বারা মানুষের সামনে উপস্থাপিত হয়েছে ইসলামের বিকৃত রূপ। ইসলামী চিন্তাবিদ অভিধায় আখ্যায়িত হলেও আসলে তাঁরা চিন্তার জগতে জমা করেছেন আবর্জনার বিশাল স্তূপ।

এরি পাশাপাশি সকল যুগেই এমন কতিপয় চিন্তাবিদের আবির্ভাব ঘটেছে যাঁরা ইসলামী জীবন দর্শন ও জীবন বিধানের শ্রেষ্ঠত্ব, সৌন্দর্য, পূর্ণত্ব, চির নতুনত্ব ও কল্যাণময়তা সম্পর্কে ছিলেন নিঃসংশয়।

তাঁরা আলকুরআন ও আলহাদীসের অনাবিল শিক্ষাকে সুন্দর যুক্তি সহকারে মানুষের সামনে তুলে ধরেছেন। আলকুরআন ও আলহাদীসের শিক্ষাকেই সমাজ অংগনের মূলধারায় পরিণত করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে গেছেন। তাঁরা নিখাদ সোনার সাথে একটুখানি খাদ মেশাতে রাজি হননি। ব্যক্তি জীবনে ও সামষ্টিক জীবনে ইসলামের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হোক, এটা ছিলো তাঁদের কামনা। এই লক্ষ্য হাছিলের জন্য প্রতিকূলতার প্রচণ্ড আঘাত খেয়েও তাঁরা থেকেছেন অবিচল।

তাঁরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন যে আলকুরআন ও আস্‌সুন্নাহতে পরিবর্তন আনার কোন সুযোগ নেই, প্রয়োজনও নেই। প্রয়োজন ভ্রান্ত চিন্তাধারার অনুসারীদের চিন্তাধারার পরিবর্তন।

এই দুই শ্রেণীর লোকদের পরিচয় খুবই সংক্ষেপে অথচ খুবই স্পষ্ট করে তুলে ধরেছেন সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী। তিনি বলেন, "মানুষের ধারণা, যেই ব্যক্তি কোন একটি নতুন পদ্ধতি আবিষ্কার করে জোরে-সোরে তার প্রচলন শুরু করেন, তিনিই মুজাদ্দিদ। বিশেষ করে যেইসব লোক মুসলিম জাতির অবনতি প্রত্যক্ষ করে তাদেরকে জাগতিক দিক দিয়ে রক্ষা করার জন্য প্রচেষ্টা চালান এবং সমকালীন আধিপত্যশীল জাহিলিয়াতের সঙ্গে আপোষ করে ইসলাম ও জাহিলিয়াতের একটি অভিনব 'মিশ্রণ' তৈরি করেন অথবা নিছক মুসলিম নামটি বাকি রেখে গোটা জাতিকে পূর্ণরূপে জাহিলিয়াতের রঙে রঞ্জিত করে দেন তাঁদেরকে মুজাদ্দিদ আখ্যা দেয়া হয়ে থাকে। অথচ তাঁরা মুজাদ্দিদ নন, তাঁরা হচ্ছে অভিনব কার্য সম্পাদনকারী–মুতাজাদ্দিদ। তাঁরা কোন সংস্কারমূলক কাজ করেন না। নতুন কোন কাজ তাঁদের দ্বারা সাধিত হয় মাত্র। আর মুজাদ্দিদের

কাজ এ থেকে সম্পূর্ণ পৃথক প্রকৃতির। জাহিলিয়াতের সাথে আপোষ করার পদ্ধতি আবিষ্কারের নাম সংস্কার নয়। ইসলাম ও জাহিলিয়াতের অভিনব মিশ্রণ তৈরি করাও সংস্কারমূলক কাজ নয়। বরং ইসলামকে জাহিলিয়াত দূষিত পানি থেকে ছেঁকে পৃথক করে নিয়ে কোন না কোন পর্যায়ে তাকে তার সত্যিকার নির্ভেজালরূপে পুনর্বার অগ্রসর করার প্রচেষ্টা চালানোই মুজাদ্দিদের কাজ। মুজাদ্দিদ হন জাহিলিয়াতের ব্যাপারে কঠোর আপোষহীন মনোভাবের অধিকারী। জীবনের নগণ্যতম অংশেও তিনি জাহিলিয়াতের অস্তিত্বের সমর্থক নন।"

দ্রষ্টব্য ঃ ইসলামী রেনেসাঁ আন্দোলন, সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী, পৃষ্ঠা-১৭

সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদীর এই মূল্যবান বিশ্লেষণ সচেতন মুসলিমদেরকে এমন এক মাপকাঠি সরবরাহ করেছে যাং'র ভিত্তিতে ইসলামী চিন্তাবিদ বলে পরিচিত ব্যক্তিদের চিন্তাধারা ও কর্মধারা মূল্যায়নের কাজ সহজ হয়ে গেছে।

– সমাপ্ত –

লেখক পরিচিতি

এ.কে.এম. নাজির আহমদ ১৯৩৯ সনের জানুয়ারী মাসে কুমিল্লা জিলার বরুড়া উপজিলার বোয়ালিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর আব্বার নাম উমার আলী ভূঁইয়া (মরহুম), আম্মার নাম গোলাপ জাহান। বর্তমানে তিনি ৩১৮/১ সেনপাড়া পর্বতা, মীরপুরে স্থায়ীভাবে বসবাস করছেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৬৩ সালে ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্যে অনার্সসহ এম. এ. ডিগ্রী লাভ করেন। ছাত্র জীবনে ইসলামী ছাত্র সংঘের পূর্ব পাকিস্তানের (বর্তমান বাংলাদেশ) সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। অধ্যাপক হিসেবে তাঁর কর্মজীবন শুরু হয় ১৯৬৫ সনে লক্ষীপুর কলেজে। তারপর কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজ, কুমিল্লা কলেজ, মুড়াপাড়া কলেজ, আলাউদ্দীন সিদ্দিকী কলেজ এবং আবুজর গিফারী কলেজ, ঢাকায় অধ্যাপনা করেন।

বর্তমানে ইসলামী গবেষণা প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টারের নির্বাহী প্রধান হিসাবে দায়িত্ব পালন করছেন। ইসলামী গবেষণা পত্রিকা মাসিক পৃথিবী (বাংলা) এবং মাসিক আল ইসলাম (ইংরেজী)-এর সম্পাদকও তিনি।

বাংলাদেশে ইসলামের আগমন, ইসলামী জাগরণের তিন পথিকৃৎ, যুগে যুগে ইসলামী জাগরণ, ইসলামী সংগঠন, ইসলামের সোনালী যুগ, আদর্শ মানব মুহাম্মদ (সা), উসমানী খিলাফতের ইতিকথা, আল্লাহর দিকে আহ্বান, ইসলামী শিক্ষা ও সংস্কৃতিসহ তাঁর রচিত ও অনূদিত গ্রন্থ সংখ্যা প্রায় ৩৫টি। এছাড়াও দেশে বিদেশে বিভিন্ন গবেষণা পত্রিকা ও জার্নালে তাঁর গবেষণামূলক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। বাংলাদেশে ইসলামী শিক্ষা ও সুস্থ সংস্কৃতির বিকাশের ক্ষেত্রে তাঁর অবদান অনস্বীকার্য। বর্তমানে তিনি জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের অন্যতম নায়েবে আমীর হিসাবেও দায়িত্ব পালন করছেন।

আহসান পাবলিকেশন

ISBN: 984-32-2446-9